NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

STUDY MATERIAL

ESO

PAPER-VI
MODULES 21-24

ELECTIVE SOCIOLOGY
HONOURS

প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শ্রেণির জন্য যে পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমতো কোনও বিষয়ে সাম্মানিক (honours) স্তরে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়ণের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে সাম্মানিক মানের পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে — যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। কেন্দ্র ও রাজ্যের অগ্রগণ্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠক্রম অনুসরণ করে তার আদর্শ উপকরণগুলির সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এই পাঠক্রম। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এই সব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূরসঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন ; যখনই কোনো শিক্ষার্থী এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনও শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। এরপর যেখানে যতটুকু অস্পষ্টতা দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠকেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষা-সহায়কগণের পরামর্শে তার নিরসন অবশ্যই হ'তে পারবে। তার ওপর প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণ-ক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক—অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার
উপাচার্য

দশম পুনর্মুদ্রণ ঃ সেপ্টেম্বর, 2019

বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations of the
Distance Education Bureau of the University Grants Commission.

পরিচিতি

বিষয় ঃ ঐচ্ছিক সমাজতত্ত্ব

সাম্মানিক স্তর

পাঠক্রম ঃ পর্যায় ঃ

ESO—06 : 21, 22, 23, 24

	রচনা	সম্পাদনা
একক 74, 75, 76	অধ্যাপিকা গায়ত্রী ভট্টাচার্য	অধ্যাপক প্রশান্ত কুমার রায়
একক 77, 78, 79	ঐ	অধ্যাপক অমৃতাভ ব্যানার্জী
একক 80, 81, 82, 83	ড. রাখকৃষ্ণ দে	ঐ
একক 84, 85, 86, 87	শ্রী অংশুমান চক্রবর্তী	অধ্যাপক সুদেষ্ণা বসু মুখার্জী

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোন অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

মোহন কুমার চট্টোপাধ্যায়
নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

ESO—06

সমাজতত্ত্বের ঐচ্ছিক পাঠক্রম

পর্যায়

21

একক 74 ☐ প্রতিষ্ঠিত আচারব্যবস্থা সমূহের অর্থ এবং প্রতিষ্ঠিত আচারব্যবস্থাসমূহ ও সমিতির মধ্যে পার্থক্য 7–18

একক 75 ☐ পরিবার ও বিবাহের সংজ্ঞা এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক 19–33

একক 76 ☐ পরিবারের কার্যাবলী এবং বিবাহের উপযোগিতা 34–44

পর্যায়

22

একক 77 ☐ মানবসমাজে অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে সম্পত্তি ও তার বিবর্তন সম্পর্কে একটি সাধারণ আলোচনা 45–55

একক 78 ☐ পুঁজিবাদ—একটি প্রতিষ্ঠান 56–64

একক 79 ☐ সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পারস্পরিক সম্পর্ক সংক্রান্ত কার্ল মার্ক্স এবং ম্যাক্স ভেবারের মতবাদ 65–70

পর্যায়

23

একক 80 ❐ মানবসমাজে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বিবর্তন—রাষ্ট্রের উদ্ভব 71–86

একক 81 ❐ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক 87–105

একক 82 ❐ রাজনৈতিক দলসমূহ—রাজনৈতিক দলসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক তাৎপর্য 106–133

একক 83 ❐ মানবসমাজে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলির ভূমিকা 134–150

পর্যায়

24

একক 84 ❐ ধর্মের সংজ্ঞা এবং যাদুবিদ্যা ও ধর্মের সম্পর্ক 151–166

একক 85 ❐ ধর্মের সামাজিক ভূমিকা 167–178

একক 86 ❐ সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে ধর্ম সম্পর্কে মার্ক্সের ব্যাখ্যা 179–189

একক 87 ❐ শিক্ষা এবং সামাজিকীকরণ ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া 190–204

একক ৭৪ □ প্রতিষ্ঠিত আচারব্যবস্থাসমূহের অর্থ এবং প্রতিষ্ঠিত আচারব্যবস্থাসমূহ ও সমিতির মধ্যে পার্থক্য

গঠন

৭৪.১ উদ্দেশ্য

৭৪.২ প্রস্তাবনা

৭৪.৩ প্রতিষ্ঠিত সামাজিক আচারব্যবস্থাসমূহের অর্থ

৭৪.৪ সামাজিক মূল্যবোধ (Social Values)

৭৪.৫ নীতিমূলক আচার ব্যবহার (Norms)

৭৪.৬ নীতিমূলক আচারব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

৭৪.৭ নীতিমূলক আচারব্যবস্থার প্রকারভেদ

৭৪.৭.১ লোকাচার (Folkways)

৭৪.৭.২ লোকনীতি (Mores)

৭৪.৭.৩ আইন (Law)

৭৪.৭.৪ নৈতিকতা (Morality)

৭৪.৮ সমিতি এবং প্রতিষ্ঠিত আচারব্যবস্থাসমূহের মধ্যে পার্থক্য

৭৪.৯ সারাংশ

৭৪.১০ অনুশীলনী

৭৪.১১ উত্তর সংকেত

৭৪.১২ গ্রন্থপঞ্জী

৭৪.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ সঠিকভাবে অনুধাবন এবং বিচার-বিশ্লেষণে সমর্থ হবেন এবং এই বিষয় সম্পর্কিত সমাজতাত্ত্বিক গবেষণায় আপনার অনুধাবন এবং বিশ্লেষণী ক্ষমতার যথার্থ প্রয়োগ ঘটাতে সক্ষম হবেন ঃ

- প্রতিষ্ঠিত আচারব্যবস্থাসমূহ বলতে কী বোঝানো হয়;
- মূল্যবোধের সঙ্গে প্রতিষ্ঠত আচারব্যবস্থার সম্পর্ক;
- লোকাচার, লোকনীতি, আইন ও নৈতিকতার সঙ্গে প্রতিষ্ঠত আচারব্যবস্থার সম্বন্ধ;
- সমিতি বলতে কী বোঝানো হয়;
- সমিতি এবং প্রতিষ্ঠিত আচারব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য।

৭৪.২ প্রস্তাবনা

সমাজবদ্ধ মানুষ হিসাবে প্রতিনিয়তই আমাদের অসংখ্য কাজ করে যেতে হয় এবং এই কাজগুলি যাতে সুষ্ঠুভাবে নিষ্পন্ন হয়ে আমাদের প্রয়োজন মেটাতে পারে, সেই কারণে প্রায়শই আমরা কিছু কার্যকর উপায় বা পদ্ধতি অনুসন্ধান করে চলি। এই অনুসন্ধান প্রচেষ্টা থেকেই এক-একটি কার্যকর পদ্ধতি উদ্ভূত হয়ে একসময় প্রতিষ্ঠিত আচারব্যবস্থা, মূল্যবোধ, লোকাচার, লোকনীতি, আইন, নৈতিকতা ইত্যাদির আকার নেয়। সমাজে বসবাসকারী মানুষের পারস্পরিক জটিল সামাজিক সম্পর্কগুলি ঐ সমস্ত বিষয়সমূহের দ্বারা বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। বর্তমান এককে ঐ বিষয়গুলি কীভাবে মানুষের সামাজিক জীবনে প্রভাব ফেলে সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৭৪.৩ প্রতিষ্ঠিত সামাজিক আচারব্যবস্থাসমূহের অর্থ

সমাজ বলতে আমরা বিভিন্ন সামাজিক সম্পর্কের সমষ্টিকে বুঝি। এই সামাজিক সম্পর্কগুলি তৈরি হয় মানব-মানবী বা ব্যক্তিরা যখন একে অপরের সাথে মিলিত হয়ে কাজ করে। ব্যক্তি সমাজে অন্যদের সাথে একত্রিতভাবে বাস করে, কারণ এই একত্রিতভাবে থাকার মধ্যে দিয়েই ব্যক্তি তার বিভিন্ন প্রয়োজন, আশা-আকাঙ্ক্ষা মেটাতে পারে। একসঙ্গে থাকার ফলে প্রত্যেক সমাজে আচার, রীতিনীতি এবং আইনের সমাবেশে কিছু সংখ্যক আচার-ব্যবস্থা গড়ে ওঠে ও সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। সমাজবিজ্ঞানীরা এইসব নিয়মাবলীকে প্রতিষ্ঠিত আচার-ব্যবস্থা বা institution বলে থাকেন, সমাজের স্থায়িত্ব এবং ধারাবাহিকতা এই প্রতিষ্ঠিত আচারব্যবস্থাগুলির ওপর নির্ভরশীল। সমাজ পরিবর্তনেও এদের ভূমিকা আছে।

যে কোনও সমাজের দিকে তাকালেই অজস্র সমিতি দেখতে পাওয়া যায়। H.E. Barnes তাঁর 'Social Institution' (New York, 1942) বইটিতে প্রতিষ্ঠিত সামাজিক আচারব্যবস্থাসমূহ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন যে, এইগুলি হ'ল একটি সামাজিক কাঠামোর অংশবিশেষ এবং কোনো কিছু কার্যকর করার পদ্ধতি যেগুলির মাধ্যমে মানবসভ্যতা মানবিক চাহিদাগুলি পরিপূরণের জন্য বহুবিধ কার্যাবলীকে সংগঠিত, পরিচালিত এবং সম্পাদিত করে। বার্নেসের এই সংজ্ঞা অনুযায়ী, সামাজিক সমিতি ও নিয়মকানুন উভয়ই প্রতিষ্ঠিত আচারব্যবস্থা সমূহের মধ্যে পড়ে যায়। অর্থাৎ রাষ্ট্র বা পরিবার এবং সরকার ও বিবাহ উভয়ই প্রতিষ্ঠিত সামাজিক আচারব্যবস্থাসমূহ হিসাবে পরিগণিত হবে এবং আরো অনেক কিছু। কিন্তু প্রতিষ্ঠিত আচারব্যবস্থাকে সমিতি থেকে আলাদা করে দেখা প্রয়োজন। ব্যক্তি সমিতির সভ্য হয়, ব্যক্তি কখনও প্রতিষ্ঠিত আচারব্যবস্থাসমূহের সভ্য হতে পারে না। এই কারণে প্রতিষ্ঠিত আচারব্যবস্থাসমূহ বলতে গোষ্ঠী পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় নিয়কানুনগুলিকে ধরা হয়। যেসব আচার-আচরণ বা কাজকর্ম সমাজে বাঞ্ছনীয় বা অনুকরণীয় বলে গণ্য করা হয়, সেইসব আচার-আচরণ সমাজে নৈতিক সমর্থন লাভ করে পরিপুষ্টি এবং শক্তি অর্জন করে। কেউ প্রতিষ্ঠিত আচারব্যবস্থা লঙ্ঘন করলে সমাজ সর্বশক্তি দিয়ে সমাজের প্রতিষ্ঠান বা নীতিবিরুদ্ধ আচার-আচরণকে সংযত করে এবং প্রয়োজনে আইনতঃ দোষী সাব্যস্ত করে এইরকম আচরণকে দমন করে।

সব বাঞ্ছনীয় আচার-ব্যবহার অবশ্যই মানুষরা অনুসরণ করে না, যেমন প্রত্যেক সমাজেই ত্যাগের আদর্শকে মহৎ বলে তুলে ধরা হয়। কিন্তু আপামর জনসাধারণের পক্ষে এই আদর্শ সর্বঅবস্থায় অনুসরণ করা সম্ভব নয় এবং সমাজও এই আদর্শ অনুসরণ করতে তাদেরকে সবসময় বাধ্য করে না। যে সব আচর-ব্যবহার ব্যক্তি জীবন ও সমাজ জীবন চালু রাখার জন্য অপরিহার্য, তা মেনে চলার জন্য সামাজিক চাপ অবশ্য থাকে।

সমাজের বিভিন্ন কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে অনেক প্রতিষ্ঠান ও সমিতি গড়ে ওঠে। প্রতিষ্ঠারেন অর্থ প্রতিষ্ঠিত আচারব্যবস্থা। যেসব নিয়ম ও প্রথা বহু অনুসরণের ফলে সমাজের সভ্যদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে এবং প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, তাদেরকেই 'প্রতিষ্ঠান' বলা হয়। সাধারণতঃ, যে কোনও প্রতিষ্ঠান কর্তব্য এবং অ-কর্তব্য সংক্রান্ত প্রথা, রীতি, নীতি ও আইন-কানুনের সমষ্টি। সাধারণত একটি প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট কোনোও উদ্দেশ্য বা চাহিদা বা চাহিদাগুচ্ছ পরিপূরণের সঙ্গে জড়িত থাকে। উদাহরণস্বরূপ বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানের কথা বলা যেতে পারে। বিবাহ-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পাত্র-পাত্রীর সামাজিক নির্বাচন সম্পর্কিত রীতি-রেওয়াজ, প্রাক্-বিবাহ কৌমার্য ও বিবাহোত্তর বিশ্বস্ততা পালন সংক্রান্ত মূল্যবোধ ও বিধি, পাত্র-পাত্রীর পরিণয়ের ব্যাপারে সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদি প্রক্রিয়াগুলি সংঘটিত হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ হিন্দু বিবাহে স্ত্রী-আচার, পুরোহিতের উপস্থিতিতে অগ্নিসাক্ষী করে কন্যাদান, সপ্তপদী, খ্রীষ্টানদের বিবাহে গীর্জায় পাদরীর সামনে পাত্র-পাত্রী এবং অন্যদের সম্মতিজ্ঞাপন; পাত্র-পাত্রীর শপথ, পাদরীর ঘোষণা; মুসলিম বিবাহে পাত্র-পাত্রীকে মোল্লাগণের কলমা পড়ানো; এবং রেজিস্ট্রীকৃত বিবাহে আইনানুমোদিত রেজিস্ট্রারের দ্বারা সাক্ষীর উপস্থিতিতে বিবাহ নথিভুক্ত ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান পালন করা হয়। এই সবের উদ্দেশ্য হল নরনারীর মিলনকে সমাজের অনুমোদন প্রদান এবং বৈবাহিক জীবনের দায়িত্ব সম্পর্কে পতি-পত্নীকে সচেতন করে দেওয়া।

একটু খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে এই সমিতি ও প্রতিষ্ঠানগুলি মোটামুটিভাবে ব্যক্তিদের নিম্নলিখিত চাহিদাগুলি মেটাবার জন্য তৈরি হয়েছে। যেমন — ক) ব্যক্তির সামাজিক এবং ব্যক্তিগত চাহিদা, খ) অর্থনৈতিক চাহিদা, গ) বৌদ্ধিক চাহিদা, ঘ) রাজনৈতিক চাহিদা, ঙ) ধর্মীয় চাহিদা এবং চ) সাংস্কৃতিক চাহিদা। এই চাহিদার (interest) ভিত্তিতে সমাজে প্রধানতঃ ছয় ধরনের সমিতি বা প্রতিষ্ঠান দেখা যায়। এই ছয় ধরনের প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত আচারব্যবস্থা সমূহের দ্বারা পরিচালিত। নিম্নে অঙ্কিত তালিকাটি (chart) আমাদের চাহিদা প্রতিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠিত আচারব্যবস্থা সমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক বোঝাতে সাহায্য করবে —

তালিকা (chart) ক্রমিক সংখ্যা - ১

	চাহিদা	সমিতি	প্রতিষ্ঠিত আচারব্যবস্থাসমূহ
১)	সামাজিক ও জৈবিক পিতৃত্ব এবং মাতৃত্ব	পরিবার	বিবাহ, সন্তান প্রজনন ও লালন-পালন, বংশধারা রক্ষা
২)	অর্থনৈতিক	অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ	শিক্ষার মাধ্যমে লব্ধগুণের প্রয়োগ, উপার্জন, ক্রয়যোগ্য ক্ষমতা
৩)	বৌদ্ধিক	শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ	নিয়মিত পঠন-পাঠন ও মূল্যায়ন, বৃত্তিগ্রহণে সহায়তা
৪)	রাজনৈতিক	রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ	ক্ষমতা লাভ, ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন, পিকেটিং স্ট্রাইক
৫)	ধর্মীয়	ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ	দেবতার আরাধনা, উপাসনা
৬)	সাংস্কৃতিক	সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ	সুষ্ঠু পরিচালনা

বস্তুতপক্ষে, প্রতিষ্ঠিত সামাজিক আচারব্যবস্থাসমূহের মাধ্যমে ব্যক্তি তার সামাজিক চাহিদা মেটাতে পারে। যেমন — পরিবারের উদ্দেশ্য সার্থক করার জন্য বিবাহপ্রথা প্রবর্তিত হয়েছে। নরনারীর যৌন আকাঙ্ক্ষা যাতে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে পরিতৃপ্ত হতে পারে সেইজন্য বিবাহের প্রচলন, আচার, বিবাহিত দম্পতির সন্তান-সন্ততি লালনপালন করার দায়িত্বও দম্পতির ওপরই ন্যস্ত হয়। যেকোনও বিবাহ অনুষ্ঠান বিশ্লেষণ করলে তার মধ্যে লোকাচার, লোকনীতি ও আইনের একত্র সমাবেশ দেখা যায়। কেবলমাত্র লোকাচার হিসাবে বিবাহপ্রথা যদি থাকত, তাহলে পারিবারিক সংগঠন দুর্বল হয়ে পড়ত এবং তার সামাজিক ভিত্তিও হীনবল হয়ে যেত। তাই পরিবারের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য প্রতিষ্ঠিত আচারববস্থা হিসাবে বিবাহ-প্রথার প্রচলন হয়েছে।

প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠিত আচারব্যবস্থা সমাজের গঠন প্রণালীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। সমাজে ব্যক্তিরা মোটামুটি প্রত্যাশিতভাবে আচার-আচরণ করে বলে সমাজজীবন স্বচ্ছন্দ গতিতে চলতে পারে। সমাজজীবনে প্রতিষ্ঠিত আচারব্যবস্থা মূলত তিনটি কারণে প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, সমাজে কোন কাজ করা উচিত আর কী করা উচিত নয়, কীভাবে করা উচিত আর কীভাবে নয় সে সম্বন্ধে বিচারের মাপকাঠি প্রতিষ্ঠিত আচারব্যবস্থাসমূহ। স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক ও কর্তব্য, শিক্ষকের ও ছাত্রের পরস্পরের প্রতি কী কর্তব্য ইত্যাদি সব কিছুই প্রতিষ্ঠিত আচার-ব্যবহার হিসেবে গড়ে ওঠে। এইসব বিষয়ে অস্পষ্টতা থাকলে সমাজের স্থায়িত্ব বিঘ্নিত হয়।

দ্বিতীয়ত, সমাজ যাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতে পারে সেই কারণে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব কার কাছে থাকবে তা সুস্পষ্ট হওয়া দরকার। কর্তৃত্ব সুনির্দিষ্ট না থাকলে শৃঙ্খলা থাকে না এবং সমাজ আস্তে আস্তে

কমজোরি হয়ে পড়ে। তাই সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে কর্তৃত্বের স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠিত আচারব্যবস্থা হিসাবে গড়ে ওঠা বিশেষ প্রয়োজন।

তৃতীয়ত, প্রত্যেক সমাজেই সুনির্দিষ্ট সামাজিক মূল্যবোধ (Social Values) থাকে এবং এই মূল্যবোধের দ্বারা সমাজস্থ লোকেদের কাজকর্মের মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। সেই কারণে প্রতিষ্ঠিত আচারব্যবস্থা সামাজিক মূল্যবোধের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত এবং সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত আচারব্যবস্থা হিসাবে গড়ে না উঠলে বিভিন্ন কাজকর্ম ও ব্যক্তির মূল্যায়ন সমাজের স্বীকৃত আদর্শ অনুযায়ী হয় না।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে, সমাজের প্রকৃতিভেদে প্রতিষ্ঠিত সামাজিক আচারব্যবস্থাসমূহ বিভিন্ন রূপ নেয়। আবার কোনও সমাজেই প্রতিষ্ঠিত আচারব্যবস্থাসমূহ চিরকাল একরকম থাকে না। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে প্রতিষ্ঠিত আচারব্যবস্থাসমূহেরও পরিবর্তন হতে পারে বা হয়। এই প্রসঙ্গে সামাজিক মূল্যবোধ (Social Values) এবং নীতিমূলক আচারব্যবহার (Norms)-এর বিষয়টি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

৭৪.৪ সামাজিক মূল্যবোধ

যে ধারণা বা নিয়মকানুন সমাজের সদস্য ভাল বা মন্দ, প্রয়োজনীয় বা অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করেন এবং সেই অনুযায়ী সামাজিক ক্রিয়াকলাপ পরিচালিত হয়, সেই ধারণা বা নিয়মকানুনের সমষ্টিকে সমাজতত্ত্বে 'সামাজিক মূল্যবোধ' বলা হয়। সামাজিক মূল্যবোধকে সামাজিক ক্রিয়াকলাপ ঠিক না বেঠিক সেই বিষয় নির্দ্ধারণের একটি মানদণ্ড হিসাবে দেখা যেতে পারে।

সামাজিক মূল্যবোধ সমাজ ও সামাজিক সম্পর্কের একটি বিশেষ উপাদান। সামাজিক মূল্যবোধের দ্বারা সমাজের কাঠামো বিশেষভাবে প্রভাবিত এবং সামাজিক মূল্যবোধের স্থায়িত্বের ওপর সামাজিক কাঠামোর স্থায়িত্ব ও অবিরাম চলমানতা নির্ভর করে। ব্যক্তির আচারব্যবহারও সামাজিক মূল্যবোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ব্যক্তি কী কাজ করবে এবং কীভাবে করবে তার সবটাই সামাজিক মূল্যবোধ নিয়ন্ত্রণ করে। অর্থাৎ, ব্যক্তির কাজ ঠিক হচ্ছে কি না তা কিন্তু অধিকাংশ সময়েই সামাজিক মূল্যবোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এইভাবে দেখতে গেলে বলা যায় যে, এই সামাজিক মূল্যবোধ সমাজের বিবেকের মতো কাজ করে। আচার এই মূল্যবোধের দ্বারা সমাজের সংহতি রক্ষিত হয়। যখন সমাজের বা গোষ্ঠীর সদস্যবৃন্দ একই ধরনের সামাজিক মূল্যবোধের দ্বারা সম্পৃক্ত থাকে ও চালিত হয় তখন সেই সমাজের সামাজিক বন্ধনও সুদৃঢ় হয়।

এক সমাজের মূল্যবোধ অপর সমাজের মূল্যবোধের থেকে সাধারণতঃ পৃথক হয়। যেমন, ভারতীয় সমাজের অনেক মূল্যবোধের থেকে মার্কিন সমাজের মূল্যবোধ পৃথক হতে পারে। আবার, একই মূল্যবোধ বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন অর্থ বহন করতে পারে। যেমন ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদ বিভিন্ন সমাজ বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে। পুঁজিবাদী সমাজ এটির ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক সমাজ এর তীব্র সমালোচনা করে। আবার সনাতন সমাজের সমষ্টিবদ্ধ জীবনে এটি উপদ্রব বা সমাজের পরিবর্তনকারী মূল্যবোধ বলে গণ্য হতে পারে।

মূল্যবোধ চিরকাল অপরিবর্তনীয় থাকে না, সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের উপাদান, অর্থ এবং তাৎপর্য পরিবর্তিত হয়ে যায়। যেমন — ভারতীয় হিন্দু সমাজের জাতিভেদ প্রথার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলি পূর্বে বা বৈদিক যুগে

ক্রিয়াশীল ছিল, বর্তমানে সেইগুলি সেইভাবে আর কার্যকরী নয়। জাতিভেদ প্রথার অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতপাত গোষ্ঠীর উচ্চ-নীচ ভেদভিত্তিক পৃথগধিকারের জায়গায় তাদের সমানাধিকার বা গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবী ও তার আংশিক পরিপূরণ আধুনিক ভারতে পরিলক্ষিত হয়।

৭৪.৫ নীতিমূলক আচারব্যবহার (Norms)

সামাজিক মূল্যবোধ নীতিমূলক আচারব্যবহারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। নীতিমূলক আচারব্যবহার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সামাজিক মূল্যবোধের প্রতিবিম্ব স্বরূপ। সমাজে থাকতে গেলে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী তার নিজের ইচ্ছামত বা সুবিধামত থাকতে পারে না। ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে কতকগুলি সর্বজনগ্রাহ্য রীতিনীতি মেনে চলতে হয়। এই রীতিনীতিগুলি বিভিন্ন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ করে সামাজিক কাঠামোর স্থায়িত্ব বজায় রাখে। অর্থাৎ রীতিনীতিগুলি সমাজস্থ সকলের পারস্পরিক আচারব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করে। সকলেই এই রীতিনীতিগুলিকে মেনে চলে কারণ এগুলিকে সমাজ মূল্যবান বলে মনে করে।

সামাজিক মূল্যবোধ ও নীতিমূলক আচারব্যবহারের মধ্যে কিছু পার্থক্যও লক্ষ্য করা যায়। মূল্যবোধ যেখানে সাধারণভাবে সমাজের সকলের আচার-ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করে, নীতিমূলক আচারব্যবহার ব্যক্তির প্রায় সব আচার-ব্যবহারকেই নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। ব্যক্তি পরিবারের মধ্যে থেকে এবং সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কের মাধ্যমে নীতিমূলক আচারব্যবহারগুলি শেখে। সমাজের এবং সমাজস্থ ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর সুসংহতভাবে চলতে হলে এই নীতিমূলক আচারব্যবহারগুলি অনুসরণ করা প্রয়োজন।

৭৪.৬ নীতিমূলক আচারব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

নীতিমূলক আচারব্যবস্থার উৎপত্তি সুপ্রাচীন। মানবসমাজের উদ্ভবের সাথে সাথে এর জন্ম। এই আচারব্যবস্থা সুস্থ সমাজজীবনের যেমন একটি অপরিহার্য অঙ্গ, তেমনই সামাজিক ঐতিহ্যের একটি উল্লেখযোগ্য উপাদান। সামাজিক জীব হিসাবে মানুষের সুষ্ঠুভাবে সমাজজীবন যাপনের জন্য সমাজস্বীকৃত নীতিমূলক আচারব্যবস্থা একান্তই অপরিহার্য।

নীতিমূলক আচার-আচরণগুলি মানবগোষ্ঠীর অস্তিত্বকে অব্যাহত রাখে। মূলত, সমাজজীবনের মৌলিক ক্ষেত্রসমূহে এই আচার-আচরণগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। নীতিমূলক আচার-ব্যবস্থাগুলি সামাজিক সত্তার অন্যতম মানসিক উপাদান হিসাবে বিবেচিত হয় এবং বাধ্যতামূলকভাবে বলবৎ করা হয়। তবে সমস্ত নীতিমূলক আচারব্যবস্থাগুলি এই ধরনের মর্যাদা পায় না।

নীতিমূলক আচার-ব্যবস্থাগুলি অপরিবর্তনীয় নয়। পরিবর্তনশীল সমাজব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়োজনে নীতিমূলক আচারব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটে থাকে। আবার, এগুলি সকল ক্ষেত্রে একেবারে অভিন্ন নয়। লিঙ্গ ভেদে, বয়স, বৃত্তি এবং পদমর্যাদাগত পার্থক্যের পরিপ্রেক্ষিতে নীতিমূলক আচারব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয়।

সমাজবদ্ধ মানুষের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণে নীতিমূলক আচারব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। সুসংগঠিত সমাজজীবন সুনিশ্চিত করে তোলার জন্য নির্দিষ্ট নিয়ম-নীতির প্রয়োজনীয়তা বর্তমান। সমাজে একটি নির্দিষ্ট মূল্যমান (values) বজায় রাখার ক্ষেত্রেও নীতিমূলক আচারব্যবস্থা সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। এই আচারব্যবস্থাগুলির দ্বারা সমাজের বিভিন্ন মানুষের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং সংহতি সৃষ্টির মাধ্যমে সমগ্র সামাজিক সংহতি সংরক্ষণ সম্ভবপর হয়। কিন্তু নীতিমূলক আচারব্যবস্থা বলবৎ রাখার ব্যাপারে দুটি বাধ্যতামূলক উপায়ের আশ্রয় নেওয়া হয়; একটি হল পুরস্কার দানের ব্যবস্থা এবং অন্যটি শাস্তিদানের। এই বাধ্যতামূলক উপায় আবার কখনও অ-আনুষ্ঠানিক আবার কখনও আনুষ্ঠানিক ধরনের হয়ে থাকে। কোনো আচরণের ব্যাপারে অনুমোদন অথবা অননুমোদনসূচক আকার-ইঙ্গিত, চোখের ভাবভঙ্গী অ-আনুষ্ঠানিক বাধ্যতামূলক উপায়ের দৃষ্টান্ত। আবার কোনো আচরণ যখন কোনো সরকারী কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোনো প্রাকর পারিতোষিক অথবা অর্থদন্ড আহ্বান করে, তখন সেই বাধ্যতামূলক উপায় হচ্ছে আনুষ্ঠানিক।

নীতিমূলক আচারব্যবস্থাসমূহ ব্যক্তির চিন্তাভাবনা, বিচার-বিবেচনা, অনুভূতি ইত্যাদিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে থাকে। কোনো একটি বিশেষ গোষ্ঠীর সদস্যপদ সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর নীতিমূলক আচার ব্যবস্থাসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে সদস্যদের মানসিকতা এবং মনোভাব গঠন করে। ধীরে ধীরে ঐ সমস্ত আচারব্যবস্থাগুলি সদস্যদের মধ্যে আত্তীকৃত হয়ে যায়।

নীতিমূলক আচারব্যবস্থাসমূহের মাধ্যমে সমাজবদ্ধ মানুষের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতিফলন ঘটে। সামাজিক আদর্শ এবং মান নির্দ্ধারণে নীতিমূলক আচারব্যবস্থাসমূহের অবদান অনস্বীকার্য। এই আদর্শ এবং মান অনুযায়ী ঔচিত্য-অনৌচিত্যের নির্দিষ্ট ধারণা সমাজজীবনে গড়ে ওঠে।

নীতিমূলক আচারব্যবস্থাগুলিকে কেন্দ্র করে সমাজে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে অনেক সময় বিরোধ বা সংঘাত দেখা যায়। আবার, সমাজ তথা যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে সংগতি রেখে এই আচারব্যবস্থাগুলির পরিবর্তনশীলতাও ধরা পড়ে।

৭৪.৭ নীতিমূলক আচারব্যবস্থার প্রকারভেদ

সমাজবিজ্ঞানীরা নীতিমূলক আচারব্যবস্থাকে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছেন।

৭৪.৭.১ লোকাচার (Folkways)

প্রত্যেক সমাজেই কতকগুলি সর্বজনগ্রাহ্য সামাজিক নিয়ম থাকে কথা বলার ক্ষেত্রে, বেশভূষায়, চিন্তা পদ্ধতিতে বা আচার-আচরণে। সমাজস্থ সকলেই এই রীতি অনুসরণ করবে বলে ধরা হয়। কিন্তু এই রীতিগুলি না মানলে সমাজ কোনওরকম জোরজবরদস্তি করে না। এই জাতীয় বিধিব্যবস্থাকে উইলিয়াম গ্রাহাম সুমনার লোকাচার বলেছেন। যেমন মহিলারা বিবাহবাসরে যে ধরনের সাজসজ্জা করে যান শ্রাদ্ধবাসরে সাধারণতঃ সেইভাবে যান না। একেই লোকাচার বলা হয়। কেউ এই রীতি না মানলে তাকে কেউ কিছু বলবে না কিন্তু তার আচরণকে সাধারণ বিধি-বহির্ভূত বলে ধরা হবে। লোকাচার চলিতরীতি (conventions), শিষ্টাচার (forms of etiquette) বা সামাজিক ব্যবহারের বিভিন্ন দিককে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। অধ্যাপক ম্যাকাইভার এবং পেজের

(R.M. Maciver and C.H. Page) মতে 'লোকাচার' বলতে সমাজ-স্বীকৃত এবং অনুমোদিত আচার-আচরণের রীতিকে বোঝায়। অর্থাৎ, লোকাচার হ'ল সমাজে বসবাসকারী মানুষের ব্যবহারবিধি অথবা আচার-আচরণের রীতি। সমাজবদ্ধ মানুষ সমাজে স্বচ্ছন্দে বসবাস করার উদ্দেশ্যে অবিরামভাবে উদ্ভাবন করে আচার-আচরণের বিভিন্ন রীতি এবং শিষ্টাচার ইত্যাদি। আচার-আচরণের এই সমস্ত বিচিত্র রীতি, শিষ্টাচার ইত্যাদি লোকাচারের অন্তর্ভুক্ত। এটা ঠিকই যে সমাজের প্রচলিত লোকাচার লঙ্ঘন করলে তা কঠিন শাস্তিযোগ্য নয়, তবে সমাজে সহজ ও স্বচ্ছন্দ গতিতে জীবনযাপনের জন্য লোকাচার বিশেষভাবে সহায়তা করে।

১৪.৭.২ লোকনীতি (Mores)

প্রত্যেক সমাজে কতকগুলি বিধিনিষেধ আছে যেগুলি সমাজের সদস্যরা মানতে বাধ্য হয়। যে কোনওভাবে সমাজ তার সদস্যদের এই বিধিনিষেধ মানতে বাধ্য করে। সমাজবিজ্ঞানের ভাষায় এই বিধিনিষেধের সমষ্টিকে লোকনীতি বা Mores বলা হয়। সুমনার লোকাচার ও লোকনীতির মধ্যে পার্থক্য দেখিয়েছেন যে যখন লোকাচারের সঙ্গে গোষ্ঠীর welfare অথবা ভাল বা মন্দের মানদণ্ড জড়িত হয়ে যায়, তখন সেই লোকাচার লোকনীতিতে পরিণত হয়। যেমন, কোন অনুষ্ঠানে কি ধরনের পোষাক পরা হবে তা লোকাচারের অন্তর্গত, সেইরকম পোষাক পরাকে সমাজে লোকনীতি হিসাবে ধরা হয়। লোকনীতি দুভাবে সামাজিক ক্রিয়াকলাপকে নিয়ন্ত্রণ করে। লোকনীতি কিছু কাজ সমাজের সদস্যদের করতে বাধ্য করে আবার কিছু কাজের থেকে সদস্যদের নিরস্ত করে। লোকনীতি যখন কোনও কাজ থেকে সদস্যদের নিরস্ত সরে তখন তাকে নিষিদ্ধ (Taboo) বলা হয়।

সমাজজীবনে লোকনীতির বিশেষ গুরুত্ব আছে। সমাজস্থ ব্যক্তিদের আচার-আচরণ এবং কাজকর্ম লোকনীতির দ্বারা প্রভাবিত এবং কোন কোন ক্ষেত্রে নির্ণীত হয়ে থাকে। এছাড়া একই ধরনের লোকনীতি মানার মধ্য দিয়ে সমাজের সঙ্গে সমাজের সদস্যদের একধরনের একাত্মবোধ তৈরী হয়। এর ফলে সমাজের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়।

১৪.৭.৩ আইন (Law)

বর্তমান সমাজ আয়তনে বিশাল। সমাজের সংগঠনের সংখ্যাও ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সমাজ খুব দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। এর ফলে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের জন্য সামাজিক প্রথা, লোকনীতি, লোকাচার প্রভৃতির জায়গায় আইন ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। আইনগুলি সমাজের প্রয়োজন অনুযায়ী তৈরি হয়। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে কীভাবে রক্ষিত হবে তা আইনের মাধ্যমে পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়। সেই কারণে আইন অমান্য করলে তা দণ্ডনীয় অপরাধ বলে পরিগণিত হয়। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আইনের পরিবর্তন করা প্রয়োজন এবং তা সম্ভবও হয় কারণ আইন সামাজিক প্রয়োজন অনুযায়ী তৈরি হয়।

১৪.৭.৪ নৈতিকতা (Morality)

প্রত্যেক সমাজ তার নিজস্ব কতকগুলি নৈতিক ধারণা তৈরি করে। যেমন — ন্যায়-অন্যায়, পবিত্রতা-অপবিত্রতা, ভদ্রতা-অভদ্রতা ইত্যাদি। এই নৈতিক ধারণাগুলি সমাজের নিয়ন্ত্রণ সাধন করে। সচরাচর সমাজস্থ ব্যক্তিরা এই নৈতিক ধারণাগুলি মেনে চলে।.

প্রতিষ্ঠিত আচার-ব্যবহার বিভিন্ন মাধ্যমের সাহায্যে সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করে।

৭৪.৮ সমিতি এবং প্রতিষ্ঠিত আচারব্যবস্থাসমূহের মধ্যে পার্থক্য

পূর্বের আলোচনায় ১ নম্বর তালিকায় (chart) দেখা গেছে যে প্রতিষ্ঠিত আচারব্যবস্থাগুলি বিশেষ বিশেষ সমিতির সঙ্গে সংযুক্ত। প্রতিষ্ঠিত আচারব্যবস্থাগুলি সমিতিকে ছাড়া ভাবা যায়না। সুতরাং আমাদের এবারে জানা উচিত সমিতি বলতে কি বোঝান হয়।

সমাজে ব্যক্তি তার নিজের উদ্দেশ্য মোটামুটি তিনভাবে সাধন করতে পারে। যেমন — ক) অপরের জন্য চিন্তা না করে ব্যক্তি স্বাধীনভাবে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করতে পারে। কিন্তু এইভাবে সংকীর্ণমনা হয়ে স্বার্থসিদ্ধি করা বিশেষভাবে অসামাজিক। খ) সমাজস্থ ব্যক্তিরা পরস্পরের মধ্যে বিবাদের মাধ্যমে নিজস্ব চাহিদা পূরণ করতে পারে। অর্থাৎ এক ব্যক্তি তার উদ্দেশ্য পূরণের জন্য অপর এক ব্যক্তির উদ্দেশ্য যাতে সাধিত না হয়, বা অপর ব্যক্তির কাছ থেকে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রয়োজনীয় দ্রব্য কেড়ে নিয়ে প্রথম ব্যক্তি তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পারে। যদিও বিবাদ সামাজিক জীবনের একটি অপরিহার্য দিক তথাপি উপরোক্ত বিবাদ ঠিকমত নিয়ন্ত্রিত না হলে বা সবসময় ঘটলে সমাজের স্থায়িত্ব ও শান্তি বিঘ্নিত হতে পারে। গ) সমাজের সদস্যবৃন্দ একে অপরের সাথে সম্মিলিতভাবে বা সহযোগিতার মাধ্যমে নিজেদের স্বার্থ বা উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে। এইভাবে স্বার্থসাধনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক সদস্যই অপর সদস্যের স্বার্থসাধনের জন্য কিছুভাবে বা কোনওভাবে সাহায্য করে থাকে।

সমিতি বলতে সেই ধরনের সংগঠনকে বোঝায় যেখান সমমনোভাবাপন্ন ব্যক্তিবর্গ কোনও একটি বা একাধিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একত্রিত হয়ে একটি গোষ্ঠী তৈরি করে। যেমন ক্রিকেট খেলায় আগ্রহী কিছু ব্যক্তি একত্রিত হয়ে যখন ক্রিকেট খেলার জন্য একটি সংগঠন তৈরি করেন তখন তাকে সমিতি বলা হয়। সমিতিকে প্রাতিষ্ঠানিক আচারব্যবস্থা বাদ দিয়ে চিন্তা করা যায় না। সমিতিটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য কতকগুলি নিয়মনীতি সমিতি গঠনের সঙ্গে সঙ্গেই তৈরি করে নিতে হবে। যেমন, ক্লাবের সভ্য কারা হতে পারবেন, তাদের কত করে চাঁদা দিতে হবে। (মাসিক না বার্ষিক), চাঁদার টাকা কার কাছে থাকবে এবং কিভাবে তা খরচ করা হবে, চাঁদা ছাড়া আর কোন্ ধরনের অনুদান ক্লাব নেবে কিনা ইত্যাদি। এই নিয়ম-কানুনগুলি ক্লাবটি তৈরি করার সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তুত না করলে ক্লাবটি চলবে তো না-ই, বরং কিছুদিন পর ক্লাবটির অস্তিত্বই থাকবে না।

সুতরাং সমিতি হচ্ছে এমন একটি কাঠামো যা সমমনোভাবাপন্ন ব্যক্তিরা তৈরি করে তাদের নিজেদের যৌথ স্বার্থসিদ্ধির জন্য। এই যৌথস্বার্থ সমিতির সব সদস্যদের স্বার্থ। যেভাবে অর্থাৎ যে নিয়মকানুনগুলির মাধ্যমে এই যৌথ স্বার্থসিদ্ধ হয় তাকে প্রাতিষ্ঠানিক আচার ব্যবস্থাসমূহ বলা হয়ে থাকে।

আসুন এখন সমিতি অথবা সংগঠনের সাথে প্রতিষ্ঠিত আচার-ব্যবস্থার পার্থক্য নির্দেশ করা যাক। সমিতি বা সংগঠন বলতে সংগঠিত জনসমষ্টিকে বোঝানো হয়ে থাকে। অন্যদিকে, প্রতিষ্ঠিত আচারব্যবস্থা বলতে সংগঠিত পদ্ধতি বোঝায়। একটি শিশুকে যখন তার বাবা, মা এবং অন্যান্য আত্মীয়-পরিজনরা লেখাপড়া শেখান, তখন কোনো সুনির্দিষ্ট সময়সূচী অথবা পাঠ্যসূচী থাকে না। সমস্ত ব্যাপারটি আনুষ্ঠানিক নিয়মবর্জিত। সুতরাং, বাড়ীতে লেখাপড়া শেখানোর বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত আচারব্যবস্থা হিসাবে বিবেচিত হয় না। কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিশুকে যখন লেখাপড়া শেখানো হয়, তখন নির্দিষ্ট সময় ধরে নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচী অনুসরণ করা হয় এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তর পরীক্ষাও নেওয়া হয়। এই ক্ষেত্রে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হলো সংগঠন এবং শিক্ষাদানের পদ্ধতি হ'ল প্রতিষ্ঠিত আচারব্যবস্থা।

কোন্‌টি সমিতি বা সংগঠন এবং কোন্‌টি প্রতিষ্ঠিত আচারব্যবস্থা এই নিয়ে বিভ্রান্তি দেখা দিলে তা দূর করার জন্য দুটি বিষয় বিবেচনাযোগ্য। প্রথমত, সমিতি বা সংগঠনের একটি স্থানগত দিক রয়েছে। কিন্তু প্রতিষ্ঠিত আচারব্যবস্থার কোনো স্থানগত দিক থাকবে না। দ্বিতীয়ত, আমরা যেকোনো সমিতি বা সংগঠনের সভ্য হতে পারি। কিন্তু প্রতিষ্ঠিত আচারব্যবস্থার সভ্য হওয়া যায় না।

আরেকটি বিষয় বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য, সেটি হ'ল যখন আমরা কোনো বিশেষ পরিবারের কথা বলব, তখন কিন্তু সংগঠনকে নির্দেশ করা হয়। যেমন — বসু পরিবার ইত্যাদি। কিন্তু কোনোভাবে বিশেষিত না করে যখন পরিবার শব্দটি ব্যবহৃত হবে তখন পরিবার নামক একটি প্রতিষ্ঠিত আচারব্যবস্থাকে বোঝানো হবে।

প্রতিষ্ঠিত আচারব্যবস্থাকে বলবৎ করবার জন্য সুনির্দিষ্ট কর্তৃত্ব অথবা সংগঠনের প্রয়োজন হয়। যখনই আনুষ্ঠানিক শিক্ষা দেওয়ার প্রশ্ন আসে, তখনই বিদ্যালয়ের কথা ভাবা হয়। অর্থাৎ, একদিকে প্রতিষ্ঠিত আচারব্যবস্থা কার্যকর করার জন্য সুসংগঠিত কর্তৃত্ব বা সমিতি বা সংগঠনের প্রয়োজন হয়, আবার অন্যদিকে, সমিতি বা সংগঠনের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য প্রতিষ্ঠিত আচারব্যবস্থার প্রয়োজন হয়।

৭৪.৯ সারাংশ

প্রতিষ্ঠিত আচারব্যবস্থা অথবা institution-এর মাধ্যমে সমাজবদ্ধ মানুষ বিভিন্ন প্রয়োজন এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে থাকে। মূলত, এটি সামাজিক আচার, রীতিনীতি এবং আইনের সমাবেশে তৈরি হয়। সমাজতাত্ত্বিক বার্নেসের অভিমত অনুযায়ী, প্রতিষ্ঠিত আচারব্যবস্থা বলতে সমিতি এবং নিয়মকানুনকে বোঝানো হয়। কিন্তু এই অভিমত কুব একটা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয় না, কারণ প্রতিষ্ঠিত আচারব্যবস্থা সমিতি থেকে স্বতন্ত্র। সাধারণভাবে, প্রতিষ্ঠিত আচারব্যবস্থা বলতে গোষ্ঠী পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় নিয়মকানুনসমূহকে বলা হয়ে থাকে। প্রতিষ্ঠিত আচার-ব্যবস্থা লঙ্ঘন শাস্তিযোগ্য।

প্রতিষ্ঠান কর্তব্য এবং অ-কর্তব্য সংক্রান্ত প্রথা, রীতিনীতি এবং আইনকানুনের সমষ্টি, এর কাজ হল নির্দিষ্ট কোনো উদ্দেশ্য পূরণ করা। প্রতিষ্ঠান ব্যক্তির সামাজিক এবং ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, বৌদ্ধিক ইত্যাদি চাহিদাগুলি পূরণ করে থাকে। সাধারণত, পরিবার, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান, শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ঐ সমস্ত চাহিদাগুলি পূর্ণ করে।

প্রতিষ্ঠিত আচারব্যবস্থাসমূহ সামাজিক মূল্যবোধ তৈরি, সমাজের সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা এবং সমাজে কী করা উচিত আর কী করা উচিত নয়, ইত্যাদি সংক্রান্ত ব্যাপারে গুরুত্বপর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

সমাজ তথা সামাজিক সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল সামাজিক মূল্যবোধ। সামাজিক কাঠামো এর ওপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। সামাজিক মূল্যবোধ ব্যক্তির আচার-আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং সমাজভেদে পৃথক হয়ে থাকে। অনেক সামাজিক মূল্যবোধ সময়ের পরিবর্তনের সাথে পরিবর্তনশীল। নীতিমূলক আচারব্যবহার সামাজিক মূল্যবোধের সাথে সম্পৃক্ত। এই আচারব্যবহার ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর পারস্পরিক সম্পর্ক নির্দ্ধারণ করে সামাজিক কাঠামোর স্থায়িত্ব বজায় রাখে। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নীতিমূলক আচারব্যবহার আইনতঃ দণ্ডনীয়। আবার, এই ব্যবস্থাগুলি সবসময় সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় এবং পরিপ্রেক্ষিত নির্ভর, সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে

নীতিমূলক আচারব্যবহারও পরিবর্তনশীল। নীতিমূলক আচারব্যবস্থার প্রকারভেদ হিসাবে লোকাচার, লোকনীতি, আইন, নৈতিকতা সামাজবদ্ধ মানুষের সামাজিক জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। এই আচারব্যবস্থাগুলিকে কেন্দ্র করে অনেক সময় বিরোধও দেখা দিতে পারে।

সমিতির মাধ্যমে কোনও একটি বা একাধিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সমমনোভাবাপন্ন ব্যক্তিবর্গ একত্রিত হয়ে একটি গোষ্ঠী তৈরি করে। প্রতিষ্ঠিত আচারব্যবস্থাগুলি বিশেষ বিশেষ সমিতির সাথে সংযুক্ত থাকে। সমিতি ব্যতীত এর অস্তিত্ব উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। আবার, সমিতির সাথে প্রতিষ্ঠিত আচারব্যবস্থাসমূহের পার্থক্যগুলিকেও অস্বীকার করা যায় না।

৭৪.১০ অনুশীলনী

১) নিম্নলিখিত সংগঠনগুলিকে কি বলা হবে — সমিতি, প্রাতিষ্ঠানিক আচারব্যবস্থাসমূহ, না উভয়ই?

ক) জেলখানা

খ) ব্যাপটিজম

গ) রোগ নির্ণয়

ঘ) গীতাপ্রেস

ঙ) নাখোদা মসজিদ

২) নিম্নলিখিত সমিতিগুলির প্রাতিষ্ঠানিক আচারব্যবস্থাগুলি নির্দেশ করুন ঃ

ক) পরিবার

খ) রাষ্ট্র

গ) বিশ্ববিদ্যালয়

ঘ) দেবমন্দির

ঙ) হাসপাতাল

৩) নিম্নলিখিত বিষয়গুলির ওপর সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন ঃ

ক) লোকাচার

খ) লোকনীতি

গ) আইন

৪) নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির বিশদ্ উত্তর দিন ঃ

ক) উদাহরণসহ প্রতিষ্ঠিত আচারব্যবস্থা বলতে কি বোঝানো হয় তা দেখান।

খ) সামাজিক মূল্যবোধ কাকে বলে? প্রতিষ্ঠিত আচারব্যবস্থার সঙ্গে সামাজিক মূল্যবোধের সম্পর্ক কি?

গ) নীতিমূলক আচারব্যবহার কাকে বলে? নীতিমূলক আচারব্যবহারের বৈশিষ্ট্যগুলি নির্ণয় করে প্রতিষ্ঠানিক আচারব্যবহার সমূহের সঙ্গে তার যোগ কোথায় তা দেখান।

৭৪.১১ উত্তর সংকেত

১) (ক) উভয়ই; (খ) প্রাতিষ্ঠানিক আচারব্যবস্থা; (গ) প্রাতিষ্ঠানিক আচারব্যবস্থা; (ঘ) উভয়ই; (ঙ) উভয়ই।

২) ক) পরিবার — বিবাহ, সন্তান প্রজনন, লালনপালন এবং বংশধারা রক্ষা।

খ) রাষ্ট্র — ক্ষমতা লাভ, ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন, পিকেটিং, স্ট্রাইক।

গ) বিশ্ববিদ্যালয় — নিয়মিত পঠন-পাঠন ও মূল্যায়ন, বৃত্তি গ্রহণে সহায়তা।

ঘ) দেবমন্দির — দেবতার আরাধনা, উপাসনা।

ঙ) হাসপাতাল — সুষ্ঠু পরিচালনা, রোগীর দেখাশোনা।

৭৪.১২ গ্রন্থপঞ্জী

১) কর, পরিমলভূষণঃ সমাজতত্ত্ব; ১৯৯৫। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা।

২) MacIver, R.M & C.H. Page : *Sociology : An Introductory Analysis* ; 1962 Macmillan & Co. Ltd., London.

৩) Mitchell, G.D. : Sociology : *An Outline for the Intending Student,* 1970; Routledge & Kegan Paul, London

৪) Ogburn, W.F. & M.F. Nimkoff : *A Handbook of Sociology;* 1972. Eurasia Publishing House Pvt. Ltd., New Delhi.

একক ৭৫ □ পরিবার ও বিবাহের সংজ্ঞা এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক

গঠন

৭৫.১ উদ্দেশ্য

৭৫.২ প্রস্তাবনা

৭৫.৩ পরিবারের সংজ্ঞা

৭৫.৪ পরিবারের সার্বজনীনতা

৭৫.৫ পরিবারের বিভিন্ন প্রকারভেদ

৭৫.৫.১ বিবাহ পদ্ধতির ভিত্তি অনুযায়ী

৭৫.৫.২ প্রভুত্বের মাপকাঠি অনুযায়ী

৭৫.৫.৩ বাসস্থানের অধিকার অনুযায়ী

৭৫.৫.৪ বংশানুক্রমিক প্রকারভেদ

৭৫.৫.৫ একক পরিবার ও যৌথ অথবা বিস্তৃত পরিবার

৭৫.৬ ভারতবর্ষে যৌথ পরিবার

৭৫.৭ বিবাহের সংজ্ঞা

৭৫.৮ বিবাহের প্রকারভেদ.

৭৫.৮.১ পতি বা পত্নীর সংখ্যার ভিত্তিতে

৭৫.৮.২ পাত্র-পাত্রী নির্বাচন করার ভিত্তিতে

৭৫.৮.৩ বিবাহ বন্ধনের ফলে সামাজিক মর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে

৭৫.৮.৪ পাত্র-পাত্রীর মধ্যে নানাবিষয়ে সমতা ও অসমতার ভিত্তিতে

৭৫.৮.৫ পাত্র-পাত্রীর মনোনয়ন পদ্ধতির ভিত্তিতে

৭৫.৮.৬ উপজাতিগোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহ

৭৫.৯ বিবাহ ব্যবস্থায় পরিবর্তন

৭৫.১০ পরিবার ও বিবাহের পারস্পরিক সম্পর্ক

৭৫.১১ সারাংশ

৭৫.১২ অনুশীলনী

৭৫.১৩ উত্তরসংকেত

৭৫.১৪ গ্রন্থপঞ্জী

৭৫.১ উদ্দেশ্য

এই এককের মূল উদ্দেশ্য হল আপনাকে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে একটি সুচিন্তিত দৃষ্টিভঙ্গী এবং বিচার-বিশ্লেষণী ক্ষমতা গড়ে তুলতে সহায়তা করা ঃ

- পরিবারের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য
- পরিবারের সর্বজনীনতা ও প্রয়োজনীয়তা
- পরিবারের বিভিন্ন রূপ
- হিন্দু যৌথ পরিবারব্যবস্থা
- বিবাহের সংজ্ঞা এবং প্রকারভেদ
- বিবাহ প্রথায় পরিবর্তন
- পরিবার ও বিবাহের পারস্পরিক সম্পর্ক

৭৫.২ প্রস্তাবনা

মানবসমাজে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে পরিবারের ভূমিকা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, আয়তনের বিচারে ক্ষুদ্র হলেও ব্যক্তি তথা সমাজজীবনে এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী। ব্যক্তির সাথে পরিবারের সম্পর্ক আজন্ম। মানবজীবনের আদি-অন্ত এই পরিবারের মধ্যেই অতিবাহিত হয়, পরিবারকে বাদ দিয়ে মানবসমাজের অস্তিত্ব অসম্ভব।

পরিবারের সঙ্গে সংযুক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিবাহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিবাহব্যবস্থাই নতুন পরিবারের ভিত্তিপ্রস্তর রচনা করে। আবার পারিবারিক সংগঠনের ফল হিসাবে বিবাহ সংগঠিত হয়ে থাকে। সুতরাং, পরিবার-জীবন এবং বিবাহব্যবস্থা পরস্পরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত। পূর্ববর্তী এককে আমরা প্রতিষ্ঠিত আচারব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করেছি। এরই সূত্র ধরে বর্তমান এককে পরিবার ও বিবাহ এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

৭৫.৩ পরিবারের সংজ্ঞা

সামাজিক জীবনযাপন করবার জন্য ব্যক্তি যে কয়টি সামাজিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে পরিবার ও বিবাহ তার মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন ও গুরুত্বপূর্ণ। পরিবারের মাধ্যমেই মানবজাতির বিকাশলাভ ঘটেছে। পরিবার এমন একটি ব্যবস্থা যার মাধ্যমে ইন্দ্রিয়সর্বস্ব জীব একটি সামাজিক জীবে রূপান্তরিত হয়। তাছাড়া বিবাহের মাধ্যমে পরিবার গঠিত না হলে মনুষ্যসমাজ এত অগ্রগতি হতে পারত না।

পরিবার বলতে আমরা সাধারণতঃ বুঝে থাকি যে বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক যৌথভাবে বসবাস করার একটি সংগঠন। আবার অনেকে মনে করেন যে পরিবার যৌন সম্পর্ক দ্বারা গঠিত এমন

একটি নির্দিষ্ট জুটি যা পর্যাপ্ত সুযোগ প্রদান করে সন্তান প্রসবের এবং প্রতিপালনের। অতএব, স্বামী ও স্ত্রী বন্ধন দ্বারাই পরিবারের সৃষ্টি।

অগবার্ন ও নিমকফ্ পরিবারের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন যে "পরিবার মোটামুটিভাবে স্বামী এবং স্ত্রী দ্বারা সৃষ্ট একটি সংঘ (union) যেখানে সন্তান-সন্ততি থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে।"

পরিবার বলতে এমন একটি সামাজিক সংগঠনকে বোঝানো হয় যার মাধ্যমে পুরুষ ও স্ত্রীলোক একতাবদ্ধ হয়ে সন্তান প্রসবের সুযোগ পায় এবং রক্ত সম্পর্কের মাধ্যমে পরস্পরের বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। পরিবার এমন একটি সংগনট যার স্থায়িত্ব অবিসংবাদিত এবং পরিবারের লোকেরা একে অন্যের সাথে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ, তাদের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক বিদ্যমান। রক্তের সম্পর্কই পরিবারের মূলভিত্তি এবং যোগসূত্র। ম্যাকাইভার ও পেজ পবিারের পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন—১) সুনিয়ন্ত্রিত যৌন সম্পর্ক, ২) বিবাহ বা অনুরূপ ব্যবস্থার মাধ্যমে যৌন সম্পর্ককে স্থায়ী ও চালু রাখা, ৩) বিশেষ নামকরণের ব্যবস্থা (a system of nomenclature) যার মাধ্যমে বংশ-পরম্পরা বিকাশ লাভ করে, ৪) একটি অর্থনৈতিক পদ্ধতির মাধ্যমে গোষ্ঠী পরিচালনা, বিশেষ করে সন্তান-ধারণ ও সন্তান-পালনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক নিরাপত্তা প্রদান ও ৫) একটি সাধারণ বাসস্থান বা একই গৃহে অবস্থান। যদিও পরিবারের এই বৈশিষ্ট্যগুলি সার্বজনীন হিসাবে পরিগণিত হয়, কিন্তু বিভিন্ন সমাজে বিভিন্নভাবে এই বৈশিষ্ট্যগুলি পরিবারের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়।

৭৫.৪ পরিবারের সার্বজনীনতা

পরিবার সামাজিক সংগঠন হিসাবে ক্ষুদ্রতম হলেও তা সমাজের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। সকল দেশে সব সময়ে সভ্যতার সব স্তরে পরিবারের অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রত্যেক ব্যক্তিই একটি পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। সেই কারণে অনেক সমাজতাত্ত্বিক মনে করেন যে পরিবার, বিশেষ করে এক-বিবাহকারী পরিবার একটি বিশ্বজনীন বা সার্বিক প্রতিষ্ঠান। তাঁদের মতে সমাজজীবনের যত রকম রূপ আছে, পরিবার হল সংঘবদ্ধ জীবনের সবচেয়ে বিশ্বজনীন রূপ।

কিন্তু অনেক সমাজতাত্ত্বিক বা সামাজিক নৃ-বিজ্ঞানী পরিবারের বিশ্বজনীনতার ধারণার সঙ্গে একমত নন। যেমন — এল. এইচ. মর্গান, জে.এল. লুব্বক, ফ্রেজার ও ব্রিফল্ট মনে করেন যে পরিবার হল সমাজ বিকাশের ফলশ্রুতি। তাঁদের অভিমত হল, আদিম পর্যায়ে মানুষের জ্ঞানের ভাণ্ডার ছিল প্রায় শূন্য। তাছাড়া, আগুনের ব্যবহার তারা জানতো না, শব্দ তৈরীর কোনও ভাষা তাদের ছিল না, অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য বিনা অস্ত্রেই প্রায় প্রকৃতির সঙ্গে তারা লড়াই করেছে। তকন তাদের বিমূর্ত চিন্তার ক্ষমতা ছিল প্রায় নগণ্য। প্রতিটি জ্ঞানের বিষয়ই তখন পরবর্তী জ্ঞানের ভিত হিসাবে কাজ করত। ফলে, আদিম সমাজে কোনও পারিবারিক রূপ ছিল না, ছিল কেবলমাত্র বিমিশ্রিত যৌন জীবন। মর্গানের মতে, বিবর্তন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পরিবারের আবির্ভাব ঘটেছে এবং নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এক-বিবাহকারী পরিবারের উদ্ভব হয়েছে।

মর্গানের এই অভিমতকে অন্যান্য সমাজতত্ত্ববিদ বা সামাজিক নৃবিজ্ঞানীগণ স্বীকার করেন নি। তাঁদের যুক্তি হল, মর্গানের বিবর্তনের তত্ত্ব যথেষ্ট তথ্যদ্বারা প্রমাণিত নয়। তাছাড়া, বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েও বলা যেতে পারে যে,

যে সমাজে পরিপূর্ণ যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা বিদ্যমান, সে সমাজ দীর্ঘকাল স্থায়ী হতে পারে না। সেইজন্য আধুনিক সমাজতত্ত্ববিদরা মনে করেন যে পরিবারের অস্তিত্ব সমাজের অন্যান্য বৃহত্তর সামাজিক সংগঠনের বহু পূর্বেই ছিল এবং সমাজের সাংস্কৃতিক জীবনের সরলতম স্তরে যেসব উপজাতিরা বাস করে তাদের মধ্যেও পরিবার প্রথা প্রচলিত।

প্রকৃতপক্ষে, পরিবার কোনও কৃত্রিম সংগঠন নয়, পরিবার ব্যবস্থা মানব প্রকৃতির সঙ্গে স্বাভাবিক। মানুষের জটিল বাসনা ও সচেতন প্রয়োজন বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হয়ে কোন না কোন এক ধরনের পারিবারিক ব্যবস্থা সৃষ্টি করেছে।

৭৫.৫ পরিবারের বিভিন্ন প্রকারভেদ

সমাজতত্ত্ববিদেরা ও সামাজিক নৃবিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে পরিবারের রূপভেদকে দেখিয়েছেন।

৭৫.৫.১ বিবাহ পদ্ধতির ভিত্তি অনুযায়ী

বিবাহ পদ্ধতির ভিত্তিতে পরিবারেক চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন —

১) **একপতি-পত্নীক পরিবার** (Monogamous Family) ঃ একপতি-পত্নীক পরিবার বলতে সেই পরিবারকে বোঝানো হয় যেখানে একজন পুরুষ কেবলমাত্র একজন স্ত্রীলোকের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যৌথভাবে বাস করে।

সমস্ত পৃথিবীতে এই ধরনের পরিবারের আধিক্য লক্ষ্য করা যায়।

২) **বহুপত্নীক পরিবার** (Polygynous Family) ঃ এই ধরনের পরিবারে একজন পুরুষের একাধিক স্ত্রী থাকে। একজন পুরুষের একাধিক স্ত্রী ভগ্নী-সম্পর্কিত হন, তাহলে এই ব্যবস্থাকে sororal polygyny বলা হয়। প্রাচীন ভারতে কুলীন প্রথায় আমরা এই ধরনের পরিবারের আধিক্য দেখে থাকি।

৩) **বহুপতি পরিবার** (Polyandrous Family) ঃ এই ধরনের পরিবারে একজন স্ত্রীলোকের একাধিক স্বামী থাকে। বহুপতি পরিবার আবার দুই ধরনের হয়ে থাকে। যখন একজন স্ত্রীলোক একসাথে একাধিক ভাইকে বিবাহ করেন, তখন এই ব্যবস্থাকে fraternal or adelphic polyandry বলা হয়। উদাহরণ — দ্রৌপদীর বিবাহ। আবার যখন একজন নারীর একাধিক স্বামী ভাই হিসাবে সম্পর্কিত নন, তখন এই ব্যবস্থাকে non-fraternal polyandry বলা হয়।

এই ধরনের পরিবারের প্রচলন পৃথিবীতে খুবই বিরল। তিব্বতের কোন কোন অংশে এবং হিমালয়ের উচ্চ পার্বত্যভূমিতে এই ধরনের পরিবারের প্রচলন দেখা যায়। এই ধরনের পরিবার প্রচলিত থাকার পেছনে একটি সাধারণ অর্থনৈতিক প্রয়োজনের প্রতিফলন দেখা যায়। এণ্ডারসন ও পার্কার মনে করেন যে হিমালয়ের উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলগুলিতে কর্ষণযোগ্য ভূমির পরিমাণ কম হওয়ায় খাদ্যের পরিমাণ অত্যন্ত সীমিত ছিল। সুতরাং লোকসংখ্যার সঙ্গে খাদ্যের সাযুজ্য রাখার জন্য প্রত্যেক পুরুষে যাতে কর্ষণযোগ্য ভূমির ভাগাভাগি না হয় তা নিশ্চিত করা। এইজন্য এইসব পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে জ্যেষ্ঠভ্রাতার পত্নীকে তাঁর সহোদরদের বিবাহ করার প্রথা

গড়ে উঠেছে। এর ফলে সন্তানের সংখ্যা স্বভাবতই কম হয় এবং পরিবারে ভূমি সম্পত্তি অবিভক্ত অবস্থায় চিরকালই পরিবারের মধ্যে আবদ্ধ থাকে। এণ্ডারসন ও পার্কার আরও বলেন যে এই ধরনের পরিবারে সাধারণত স্ত্রীলোকর সন্তান ধারণের ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায় এবং স্ত্রী-শিশুর তুলনায় পুরুষ-শিশুর জন্মহার অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। এই পরিবর্তনকে নৃবিজ্ঞানীরা অবশ্য ব্যাখ্যা করতে পারেন নি।

৪) **গোষ্ঠী বিবাহ ভিত্তিক পরিবার** (Family based on group marriage) : যখন একই সময়ে একাধিক পুরুষের সঙ্গে একাধিক নারীর বিবাহ হয় তখন এই ধরনের পরিবার তৈরি হয়। নিউগিনি ও হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের কয়েকটি উপজাতির মধ্যে এই ধরনের ব্যবস্থা দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই প্রথা খুবই বিরল। অধ্যাপক কর দেখাচ্ছেন যে ব্রাজিলের কাইনগেঙ্ (Kaingang) উপজাতির মধ্যে এই ব্যবস্থা প্রচলিত। কিন্তু বিগত একশ বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করে শতকরা মাত্র ৪ ভাগ ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা দেখা গেছে।

৭৫.৫.২ প্রভুত্বের মাপকাঠি অনুযায়ী

প্রভুত্বের মাপকাঠি অনুযায়ী পরিবারকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। যেমন —

১) **পিতৃতান্ত্রিক পরিবার** (Patriarchal Family) : এই ধরনের পরিবারে পুরুষের মাধ্যমে বংশ পরিচয় নির্ধারণ করা হয় এবং পুরুষ মানুষকে পরিবারের কর্তা বলে স্বীকার করা হয়। পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের সকল দায়িত্ব পুরুষের হাতে ন্যস্ত থাকে। ফলে পরিবারের ভরণ-পোষণ ও নিরাপত্তার জন্য পুরুষই দায়ী থাকে।

পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই এই ধরনের পরিবারের স্বীকৃতি অধিক লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীন রোমে সর্বপ্রথম আদর্শ পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের প্রচল দেখা যায়। রোমান প্যাট্রিয়ার্ক কেবলমাত্র পরিবারের প্রধান ছিলেন না, তাঁর অধীনস্থ লোকজনের কাছে তিনি ছিলেন একাধারে ধর্মগুরু, শাসক এবং প্রদান উপদেষ্টা। আইনের চোখে তাঁকেই পরিবারের বৈধ প্রতিনিধি হিসাবে গণ্য করা হত। পরিবারের সদস্যদের ওপর তাঁর নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব ছিল। ফলে প্রাচীন রোমে পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের চূড়ান্ত বিকাশ ঘটেছিল।

২) **মাতৃতান্ত্রিক পরিবার** (Matriarchal Family) : এই ধরনের পরিবারে স্ত্রীর অধিকার পুরুষের চাইতে বেশী থাকে এবং স্ত্রীলোকের মাধ্যমে বংশপরিচয় নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। মিশর, তিব্বত ও দক্ষিণ ভারতে এ ধরনের পরিবার বিদ্যমান ছিল। এখনও দক্ষিণ ভারত, কোচিন, মালাবার প্রভৃতি স্থানে মাতৃতান্ত্রিক পরিবার দেখতে পাওয়া যায়।

৭৫.৫.৩ বাসস্থানের অধিকার অনুযায়ী

স্বামী ও স্ত্রীর বাসস্থানের অধিকার অনুযায়ী পরিবারের প্রকারভেদ করা হয়ে থাকে। যেমন —

১) **পিতৃআবাসিক পরিবার** (Patrilocal Family) : এরূপ পরিবারের নিয়ম হল পাত্রী বিবাহ বন্ধনের পর পাত্রের পরিবারভুক্ত হয়ে যায় এবং সেখানেই তার অধিকার গণ্য করা হয়। পিতার বাসস্থান বা পৈতৃক সম্পত্তির মালিক বা অংশীদার নাও থাকতে পারে। ভারতবর্ষের অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিবার প্রধানতঃ পিতৃআবাসিক পরিবার।

২) **মাতৃআবাসিক পরিবার** (Matriolocal Family) : এরূপ পরিবারের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো পাত্র স্বীয় পৈতৃক বাসস্থান বা পৈতৃক পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পাত্রীর পরিবারভুক্ত হয়ে বাস করে। ভারতবর্ষে উত্তর-

পূর্বাঞ্চলে খাসাদের মধ্যে এই ধরনের পরিবার দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়া কিছু কিছু উপজাতির মধ্যেও এই প্রথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু শিল্পায়ন ও নগরায়নের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বহু উপজাতি গোষ্ঠীর মধ্যে মাতৃআবাসিক প্রথা লুপ্ত হয়ে যায়।

৭৫.৫.৪ বংশানুক্রমিক প্রকারভেদ

সমাজতাত্ত্বিকগণ বংশানুক্রমে পরিবারের প্রকারভেদ নির্দেশ করেছেন। যেমন —

১) পিতৃগোত্রজ পরিবার (Patrilineal Family) ঃ যে পরিবারের সন্তানগণ তাদের পরিবারের পরিচয় পিতার বংশ অনুযায়ী নির্ধারণ করে থাকে তাকে পিতৃগোত্রজ পরিবার বলে। ভারতবর্ষের অধিকাংশ পরিবার পিতৃগোত্রজ পরিবারের উদাহরণ।

২) মাতৃগোত্রজ পরিবার (Matrilineal Family) পরিবারের সদস্যগণ যদি মায়ের বংশ মর্যাদা অনুযায়ী সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয় তখন তাকে মাতৃগোত্রজ পরিবার বলা হয়। উত্তর-পূর্ব খাসাদের মধ্যে এই পরিবার প্রথা দেখা যায়।

৭৫.৫.৫. একক পরিবার ও যৌথ অথবা বিস্তৃত পরিবার (Nuclear and Joint or Extended Family) ঃ

আধুনিক যুগে সমাজতাত্ত্বিকরা পরিবারকে দুটি ভাগে ভাগ করে থাকেন — একক পরিবার ও যৌথ পরিবার।

১) **একক পরিবার ঃ** একক পরিবার বলতে বোঝায় সেই পরিবারকে যেখানে বিবাহিত ব্যক্তি তার স্ত্রী ও অবিবাহিত সন্তানদের নিয়ে বাস করে।

মূলতঃ আমরা দেখে থাকি যে একক পরিবার থেকেই সকল প্রকার পরিবারের উদ্ভব হয়েছে। আধুনিক যুগে একক পরিবারের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনেকের মতে এর কারণ হচ্ছে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ।

এছাড়া আধুনিক শিল্পোন্নত দেশগুলিতে একক পরিবারের প্রয়োজনীয়তা বেড়ে চলেছে। বিশ্বের যে দেশগুলোতে শিল্প এবং যান্ত্রিকতার প্রসার ঘটেছে সেসব দেশে সহজাতভাবেই একক পরিবার গড়ে উঠেছে। কারণ, শিল্প কারখানায় কাজ করার শ্রমিকদের গ্রাম ছেড়ে নগরে আসতে হচ্ছে। এর ফলে যৌথ পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাকে স্বতন্ত্রভাবে স্ত্রী-ছেলেমেয়েকে নিয়ে আলাদা পরিবার গঠন করতে হচ্ছে। তাছাড়া গ্রামীণ অর্থনীতি গ্রামের সদস্যদের অর্থনৈতিক চাহিদা সঙ্কুলান করতে না পারার কারণে গ্রাম ছেড়ে ব্যক্তিকে শহরে আসতে হচ্ছে কর্মসংস্থানের জন্য। শহরে জায়গার স্বল্পতায় ব্যক্তি শুধুমাত্র তার স্ত্রী ও সন্তানকেই শহরে আনতে পারছে ও আলাদা একক পরিবার গঠিত হচ্ছে। একক পরিবারের উৎপত্তির আরও একটি কারণ হচ্ছে পরিবারের দায়িত্ব ক্রমবর্ধমানভাবে রাষ্ট্রের ওপর ন্যস্ত হচ্ছে। পরিবারের অনেক দায়িত্বই রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মারফৎ সমাধা হয়ে থাকে। পূর্ণাঙ্গ স্বাধীন একক পরিবার সার্থকভাবে পাশ্চাত্য দেশে গড়ে উঠেছে। আধুনিক স্বাধীন একক পরিবারের সংহতি মূলতঃ যৌন আকর্ষণ ও স্বামী-স্ত্রীর সাহচর্যের এবং তাদের সন্তান-সন্ততিদের সাহচর্যের ওপর নির্ভরশীল।

২) যৌথ পরিবার (Joint Family) : যে পরিবার পিতা-মাতা, তাদের বিবাহিত পুত্র ও তাদের সন্তানদের নিয়ে তৈরী হয় তাকে যৌথ পরিবার বরে। যৌথ পরিবারে বিধবা বোন, ভাগ্নে, ভাইপো এমনকি দূর-সম্পর্কের আত্মীয়-স্বজনকেও থাকতে দেখা যায়। মোটামুটিভাবে যৌথ পরিবারের তিন প্রজন্মের সদস্যদের একছাদের তলায় বাস করতে এবং এক হাঁড়ি থেকে অন্নগ্রহণ করতে দেখা যায়। তবে যৌথ পরিবারের মূল বৈশিষ্ট্য হল তার যৌথ সম্পর্ক (coparcenary property)। এই সম্পত্তিকে সাধারণত ভাগ করা যায় না।

কৃষিভিত্তিক সমাজে সাধারণত যৌথ পরিবারের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। কৃষিভিত্তিক পরিবারে জনশক্তি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। যৌথ পরিবার কৃষিভিত্তিক সমাজের এই জন চাহিদা মেটাতে অনেকটা সাহায্য করে।

ভারতের শিল্পভিত্তিক পরিবার অনেক ক্ষেত্রে যৌথ পরিবার। আগেই বলা হয়েছে যে যৌথ পরিবারে অন্যতম উপাদান মোটামুটিভাবে অবিভাজ্য যৌথ সম্পত্তি। সম্পত্তি একজায়গায় থাকার ফলে শিল্পে বিনিয়োগ করার সুবিধা হয় এবং ভারতবর্ষের বেশির ভাগ শিল্পপতি পরিবারই যৌথ পরিবার।

তবে শিল্পোন্নত পশ্চিমী সমাজে যৌথ পরিবার প্রায় বিলুপ্ত এবং সেখানে একক পরিবারের প্রাধান্যই দেখতে পাওয়া যায়।

৩) বিস্তৃত পরিবার (Extended Family) : বিস্তৃত পরিবার যৌথ পরিবারেরই একটি প্রকারভেদ। এ পরিবারের অন্তর্গত হয় স্বামী-স্ত্রী, বিবাহিত পুত্রগণ এবং তাদের পরিবার, অবিবাহিত পুত্র ও কন্যা, পৌত্র ও পৌত্রী। অনেকে মনে করেন, প্রকৃতপক্ষে যৌথ পরিবার সংজ্ঞাটি ভারতবর্ষের পরিবার প্রথা সম্পর্কে প্রয়োগ করা হয়। অন্যত্র একে বিস্তৃত পরিবার বলা হয়। তার কারণ, ভারতীয় প্রথায় সম্পত্তির উত্তরাধিকার ও পরিবার বিভাগ সম্পর্কে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ও বিধিনিষেধ আছে, যা অন্যত্র নেই।

৭৫.৬ ভারতবর্ষে যৌথ পরিবার

ভারতীয় যৌথ পরিবারের আলোচনা না করে পরিবার বিষয়ে যে কোনও আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। ভারতবর্ষে বহু প্রাচীন কাল থেকে যৌথ পরিবারের অস্তিত্ব দেখা যায়। প্রাচীন কালে যৌথ পরিবার বৃহত্তর সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে পরিগণিত হত। তাছাড়া যৌথ পরিবারের আরও দুটি বৈশিষ্ট্য ছিল যে সেখানে যৌথ সম্পত্তি থাকবে এবং একজন বিশেষ গৃহদেবতা থাকবেন যিনি পরিবারের সব সদস্যদের আরাধ্য দেবতা। এই পরিবার সাধারণতঃ বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষ সদস্যের দ্বারা পরিচালিত। হিন্দু আইন অনুযায়ী যৌথ সম্পত্তি যে কোনও সময়েই ভাঙ্গা যেত না তা নয়, তবে সাধারণভাবে যৌথ সম্পত্তির বিভাজন খুব কমই দেখা যেত। এই যৌথ পরিবারে মোটামুটিভাবে তিন থেকে চার প্রজন্মের সদস্যরা একসঙ্গে থাকত, একই হাঁড়ি থেকে খাওয়াদাওয়া হত এবং একসঙ্গে কাজ করত। এছাড়া যৌথ পরিবারের একটি ধর্মীয় ভিত্তি ছিল। যৌথ পরিবার শুধুমাত্র জীবিত সদস্যদের কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠেনি। মনে করা হত বর্তমান অবস্থায় যৌথ পরিবার একটি বিন্দুমাত্র যে যোগসূত্র রচনা করছে পিতৃপুরুষ (মৃত সদস্য) এবং অনাগত বা ভবিষ্যৎ পুরুষদের মধ্যে। পি. এন. প্রভুর মতে পরিবার একটি পবিত্র মন্দিরের মত যার দায়-দায়িত্ব এবং রক্ষণাবেক্ষণের কর্তব্য পূর্বপুরুষদের সূত্র ধরে বর্তমান প্রজন্ম এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের ওপর ন্যস্ত হয়। যৌথ পরিবারের সদস্যদের অন্যতম কর্তব্য সবসময় পরিবারের মান বজায় রাখা।

হিন্দু যৌথ পরিবারের একটি সুন্দর ছবি আমরা পাই শ্রীনিবাসের 'রিলিজিয়ন এ্যান্ড সোসাইটি এ্যামঙ্গ দ্য কুর্গস্ অফ সাউথ ইন্ডিয়া' বইটিতে। কুর্গদের মধ্যে পিতৃগোত্রজ এবং পিতৃআবাসিক যৌথ পরিবারের নাম 'ওক্কা'। শ্রীনিবাস দেখাচ্ছেন যে কোনও কুর্গকেই তার ওক্কা ছাড়া ভাবা যায় না। প্রত্যেক কুর্গকেই কোনও না কোনও ওক্কার সদস্য হতে হয়। ওক্কার সদস্য হওয়ার অধিকার কুর্গরা জন্মসূত্রে পায়। প্রত্যেক কুর্গই সমাজে কোনও না কোনও ওক্কার সদস্য হিসাবে পরিচিত। ওক্কার সদস্যপদ কুর্গদের ক্ষেত্রে মৃত্যুর পরও শেষ হয় না। কারণ মৃত ব্যক্তি তখন পিতৃপুরুষে পরিণত হন যাঁকে খাদ্য উৎসর্গ করা ওক্কার বর্তমান সদস্যদের একটি প্রধান কার্য বলে বিবেচিত হয়।

শ্রীনিবাস দেখাচ্ছেন যে আগে ওক্কার সমস্ত ছেলেরা একসঙ্গে ওক্কার গরু ছাগল চরাত, বা পাখী শিকার করত বা খেলাধুলা করত। যখন তারা বড় হত তখন তারা ওক্কার যৌথ সম্পত্তি ওক্কাপ্রধানের অধীনের থেকে দেখাশুনা করত।

একই ওক্কার সদস্যদের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। যেখানে জ্ঞাতিত্বের সম্পর্ক শুধুমাত্র ওক্কার মধ্যে আবদ্ধ থাকে না, সেখানে দুটি ভিন্ন ওক্কা যারা একে অপরের সঙ্গে কোনওভাবে সম্পর্কিত তাদের সদস্যদের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ তাছাড়া একই ওক্কার দুই বোনের ছেলেমেয়েরা (যারা দুটি ভিন্ন ওক্কার সদস্য) পরস্পরকে বিবাহ করতে পারে না।

ওক্কার যৌথ সম্পত্তি সাধারণভাবে ভাগ করা যায় না। এই সম্পত্তি এক প্রজন্ম থেকে আর এক প্রজন্মে জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে থেকে যায়। যদি ওক্কার কোনও সদস্য বিভাজন চান তবেই একমাত্র সম্পত্তি বিভাজন হতে পারে। তবে শ্রীনিবাস বলছেন যে সেই বিভাজন খুব কমই হয়ে থাকে।

মৃত্যুর পর ওক্কার সদস্য ওক্কার পিতৃপুরুষে পরিণত হন যাঁরা ওপরে ওক্কার ভালমন্দ দেকার দায়িত্ব বর্তায়। ওক্কার পারস্পরিক বন্ধন যৌথ সম্পত্তি ও ভ্রাতৃত্বকেন্দ্রিক বিবাহ বন্ধন (leviratic marriage) হেতু অত্যন্ত সক্রিয় ও শক্তিশালী। ওক্কা একটি সমান্তরাল রেখার মত যার কোনও শেষ নেই। এই ওক্কাকে ভারতীয় যৌথ পরিবারের একটি প্রতিরূপ হিসাবে দেখা যেতে পারে। হিন্দু যৌথ পরিবারের যৌথ সম্পত্তি এই ধরনের পরিবারের ভিত্তিপ্রস্তর বিশেষ। ব্রিটিশ শাসনের সময় থেকেই নানারূপ আইনের মাধ্যমে এই যৌথ সম্পত্তি ভাঙ্গার চেষ্টা করা শুরু হয়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য The Gains of Learning Act (1930)। (এই আইনের বলে কোনও ব্যক্তি উচ্চশিক্ষার জন্য যৌথ সম্পত্তির অংশ দাবি করতে পারেন); The Hindu Law of Inheritance (Amendment) Act of 1929 (এই আইনে মেয়েদের যৌথ সম্পত্তিতে অধিকার স্বীকৃতি পায়); The Hindu Succession Act, 1956 (এটিও যৌথ সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত দাবির স্বীকৃতি দেয়)।

৭৫.৭ বিবাহের সংজ্ঞা

বিবাহ হচ্ছে সমাজের একটি কার্যপ্রণালী যার মাধ্যমে পরিবার গড়ে ওঠে। সমাজজীবনের প্রয়োজন এবং ব্যক্তির জৈব প্রয়োজন — উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব নিরসন করতে পরিবার গঠিত হয় বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে। রবীন্দ্রনাথ জীবপ্রকৃতি ও সমাজ প্রকৃতির অভিপ্রায়ের সন্ধি স্থাপনের ব্যবস্থাকে বিবাহ বলেছেন। পরিবার গঠিত হয় মূলতঃ বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে।

বিবাহের সামাজিক ও ব্যক্তিগত তাৎপর্য্য আছে বলেই প্রত্যেক সমাজে নানারূপ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিবাহকার্য সম্পন্ন হয়। এ বিষয়ে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সমাজতাত্ত্বিক এণ্ডারসন ও পার্কার মন্তব্য করেছেন যে বিবাহোৎসবের মাধ্যমে বিবাহের সামাজিক ও ব্যক্তিগত মূল্য সূচিত হয়। বিবাহ যে কেবলমাত্র ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, এই বিষয়ে যে সমাজের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে তা সুস্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আত্মীয়-কুটুম্ব ও বন্ধুবান্ধবদের আমন্ত্রণ করে তাদের উপস্থিতিতে বিবাহকার্য সম্পাদিত হয়। তাছাড়া, বিবাহোৎসবে নবদম্পতিকে পরস্পরের নিকট নানারকম অঙ্গীকার করতে হয় এবং এ অঙ্গীকারের গুরুত্ব তারা যাতে উপলব্ধি করতে পারে তার জন্য বিবাহ অনুষ্ঠানে সাড়ম্বর অথচ গুরুগম্ভীর পরিবেশের সৃষ্টি করা হয়।

সুতরাং বিবাহ সমাজ ও ব্যক্তি উভয়ের কাছেই গুরুত্বপূর্ণ। এই কারণে বিবাহের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক আচারব্যবহারের সবদিক প্রতিফলিত হয়। কিংস্‌লে ডেভিস বলেন যে বিবাহ লোকাচার, লোকগীতি, আইন — সব বিষয়কেই পরিগ্রহণ করে গড়ে উঠেছে। ডেভিসের মতে, বিবাহের মধ্যে কতকগুলি লোকাচারের প্রতিফলন দেখা যায়, যেমন এনগেজমেন্ট ঘোষণা, আংটি বিনিময়, মধুচন্দ্রিমা ইত্যাদি। এরপরেই দেখা যায় যে বিবাহ বন্ধনের মধ্যে কতকগুলি লোকনীতি জড়িয়ে আছে। যেমন — প্রাক্ বৈবাহিক কৌমার্য্য ও বিবাহোত্তর বিশ্বস্ততা, কিছু অঙ্গীকার গ্রহণ, পারস্পরিক দায়িত্ববহনের স্বীকারোক্তি ইত্যাদি। আবার বিবাহ অনুষ্ঠানে কিছু আইনও আছে। যেমন — বিবাহ সংক্রান্ত নথিপত্র, বিশেষ বিশেষ কারণে বিবাহ বিচ্ছেদের অনুমতি, জালিয়াতির বা হঠকারিতার বিরুদ্ধে সুরক্ষা, বিশেষ আত্মীয়বর্গের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধকরণ ইত্যাদি। এগুলি প্রত্যেকটি মিলে বিবাহ অনুষ্ঠানকে এমন একটি আকৃতি দেয় যার ফলে বিবাহ সমাজ ও ব্যক্তিগত জীবনে গুরুত্বপূর্ণ হয়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে বিবাহ হচ্ছে পরিবার গঠনের কার্যপ্রণালী। এই নিয়মটি যেমন সার্ব্বজনীন অর্থাৎ সব সমাজেই বিবাহের মাধ্যমে পরিবার গঠিত হয় ঠিকই কিন্তু বিভিন্ন সমাজে বিভিন্নভাবে বিবাহ প্রণালী অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। আবার একই সমাজে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্নভাবে এই বিবাহ অনুষ্ঠিত হতে পারে। বিবাহের প্রকারভেদ এই বিভিন্নতা সূচিত করে।

৭৫.৮ বিবাহের প্রকারভেদ

৭৫.৮.১ পতি বা পত্নীর সংখ্যার ভিত্তিতে

পতি বা পত্নীর সংখ্যার ভিত্তিতে বিবাহকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—একপতি-পত্নীক বিবাহ (Monogamy) ও বহুবিবাহ (Polygamy)।

ক) যখন একজন পুরুষ একজন নারীকে নিয়ে দাম্পত্য জীবন-যাপন করে তখন তাকে একপতি-পত্নীক বিবাহ বলে।

খ) আবার যখন পুরুষ বা নারী এককালে একাধিক নারী বা পুরুষের সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয় তখন তাকে বহুবিবাহ বলে।

বহুবিবাহ তিনপ্রকার; যথা—

১) একজন নারীর যখন একাধিক পুরুষে বিবাহ হয় তখন তাকে বহুপতি বিবাহ (Polyandry) বলে।

২) একজন পুরুষ যখন বহুপত্নী গ্রহণ করে তখন তাকে বহুপত্নীক বিবাহ (Polygyni) বলে।

৩) যখন একাধিক পুরুষের সঙ্গে একাধিক নারীর একই কালে বিবাহ হয়, তখন তাকে গোষ্ঠী বিবাহ (group marriage) বলে।

বর্তমানে অধিকাংশ সমাজে একগামিতা বা এক পতি-পত্নীক বিবাহ সর্বোৎকৃষ্ট বিবাহ-প্রথা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। কোনো কোনো সমাজে আইনের মাধ্যমে এই প্রথা বলবৎ করা হয়েছে। যেমন—হিন্দুদের মধ্যে আইন করে বহুগামিতা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ধর্ম বহুগামিতাকে প্রশ্রয় দেয়, যেমন—ইসলামে একজন পুরুষ একই সময় একাধিক নারীকে বিবাহ করতে পারেন। আবার, কোনো কোনো ক্ষেত্রে ধর্ম একগামিতা বলবৎ করতে সাহায্য করেছে, যেমন — ক্যাথলিকদের মধ্যে বহুগামিতার বিরুদ্ধে ধর্মীয় অনুশাসন রয়েছে।

একগামিতার স্বপক্ষে নানা যুক্তি দেওয়া হয়। প্রথমত, অধিকাংশ সমাজে পুরুষ এবং নারীর সংখ্যায় মোটামুটি একটি সমতা দেখা যায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে অন্য কোনোরকম বিবাহ-পদ্ধতি প্রবর্তিত হলে সমাজে জনসংখ্যার ভারসাম্য (demographic balance) বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। দ্বিতীয়ত, একগামী বিবাহে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকে, তা বহুগামী বিবাহে আশা করা যায় না। তৃতীয়ত, বহুগামী বিবাহে ঈর্ষা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে মলিন করে। চতুর্থত, একগামী বিবাহে সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ এবং হস্তান্তর অনেক বেশী সহজসাধ্য। বহুগামী বিবাহে এই সমস্ত বৈষয়িক ব্যাপারে নানাধরনের সমস্যা সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

৭৫.৮.২ পাত্র-পাত্রী নির্বাচন করার ভিত্তিতে

পাত্র-পাত্রী নির্বাচন করার ভিত্তি কি হওয়া উচিত সেই পরিপ্রেক্ষিতে বিবাহকে দুভাগে ভাগ করা যায়। যেমন — ক) সগোত্র বা অন্তর্বিবাহ (endogamy) ও খ) বহির্গোত্র (exogamy) বিবাহ।

ক) যখন একই গোষ্ঠীর মধ্য থেকে পাত্র-পাত্রী নির্বাচন বাধ্যতামূলক বিধি বলে পরিগণিত হয় তখন তাকে অন্তর্বিবাহ অথবা গোষ্ঠী-সাপেক্ষ বিবাহ বলে। উদাহরণ হিসাবে, হিন্দুদের মধ্যে সবর্ণ বিবাহের কথা বলা হয়। একই ধর্মাবলম্বী পাত্র এবং পাত্রীর মধ্যে যাতে বিবাহ হয় তার জন্য প্রত্যেক ধর্মেই কঠোর অনুশাসন বর্তমান। সুতরাং, এটিকেও গোষ্ঠী-সাপেক্ষ বিবাহের উদাহরণ হিসাবে গ্রহণ করা যায়। অন্তর্বিবাহ বা গোষ্ঠী-সাপেক্ষ বিবাহের সমর্থনে সাধারণত তিনটি যুক্তি দেওয়া হয়। প্রথমত, একই গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহ হলে গোষ্ঠীর ঐক্য এবং সংহতি বজায় রাখা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। দ্বিতীয়ত, গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহ সীমাবদ্ধ থাকলে গোষ্ঠীর জীবনধারাগত স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। তৃতীয়ত, পাত্র এবং পাত্রী একই গোষ্ঠীর অন্তর্গত হলে তাদের মূল্যবোধ এবং জীবনাদর্শে মোটামুটি মিল থাকবে বলে আশা করা যায়। সুতারং, পাত্র-পাত্রীর মধ্যে বিবাহিত জীবনে পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং খাপ খাওয়ানো সহজসাধ্য হয়।

খ) যখন একই গোষ্ঠী থেকে পাত্র-পাত্রীর বিবাহ নিষিদ্ধ বলে বিবেচিত হয় তখন তাকে বহির্বিবাহ বা গোষ্ঠী-বহির্ভূত বিবাহ বলে। গোষ্ঠী বহির্ভূত বলার অর্থ হল দুটি পৃথক গোষ্ঠী থেকে পাত্র এবং পাত্রীর নির্বাচন আবশ্যিক হয়ে দাঁড়ায়। উদাহরণ হিসাবে হিন্দু সমাজে সপিণ্ডের মধ্যে অথবা সগোত্রের মধ্যে বিবাহ নিষেধের বিধির উল্লেখ করা যায়।

৭৫.৮.৩ বিবাহ বন্ধনের ফলে সামাজিক মর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে

বিবাহ বন্ধনের ফলে সামাজিক মর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে বিবাহকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা—

ক) উচ্চ বংশের পাত্রের সঙ্গে অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর কন্যার বিবাহকে অনুলোম বিবাহ (Hypergamy) বলে।

খ) নিম্নবংশজাত পাত্রের সঙ্গে অপেক্ষাকৃত উচ্চশ্রেণীর কন্যার বিবাহকে প্রতিলোম বিবাহ (Hypogamy) বলে।

৭৫.৮.৪ পাত্র-পাত্রীর মধ্যে নানা বিষয়ে সমতা ও অসমতার ভিত্তিতে

পাত্র-পাত্রীর মধ্যে বয়স, শিক্ষা, রুচি, আর্থিক অবস্থা, সামাজিক মর্যাদা প্রভৃতি নানাবিষয়ে সমতা ও অসমতার ভিত্তিতে বিবাহকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন—

ক) পাত্র-পাত্রীর মধ্যে যখন উল্লিখিত বিষয়গুলিতে সমতা লক্ষিত হয়, সে বিবাহকে সমবিবাহ (Homogamy) বলে।

খ) পাত্র-পাত্রীর মধ্যে যখন উপরোক্ত বিষয়ে অসমতা পরিলক্ষিত হয়, তখন তাকে অসমবিবাহ (Heterogamy) বলে।

৭৫.৮.৫ পাত্র-পাত্রীর মনোনয়ন পদ্ধতির ভিত্তিতে

বিবাহের পাত্র-পাত্রীকে কিভাবে মনোনীত করা হয় সে পরিপ্রেক্ষিতে বিবাহকে দুভাগে ভাগ করা হয়। যেমন —

ক) পাত্র-পাত্রী যখন একে অপরকে ভালোবেসে বিবাহ করে, তাকে প্রেমজ বিবাহ (Romantic Marriage) বলে।

খ) যখন অভিভাবক বা আত্মীয়-স্বজন দ্বারা পাত্র-পাত্রী মনোনয়ন করে বিবাহের ব্যবস্থা হয়, তখন তাকে সংযোজিত বিবাহ (Arranged Marriage) বলে।

৭৫.৮.৬ উপজাতিগোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহ

এছাড়া বিভিন্ন উপজাতি গোষ্ঠীর মধ্যে নানাধরনের বিবাহ প্রথার চল দেখতে পাওয়া যায়। তার মধ্যে প্রধানতঃ উল্লেখযোগ্য — মূলত প্রণয়ীর সাথে গোপনে পলায়ন করে বিবাহ (Marriage by Elopment), পাত্রীর গৃহে শ্রমদান করে বিবাহ (Marriage after Putting labour) ইত্যাদি। বিবাহের সঙ্গে পণপ্রথার একটি যোগ দেখা যায়, এটি উপজাতি গোষ্ঠী প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উপজাতি গোষ্ঠীর মধ্যে প্রধানত কন্যাপণ বা Bride-Price দেবার প্রথা দেখা যায়। কিন্তু সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উপজাতি গোষ্ঠীগুলির নিজস্ব

উৎপাদন ব্যবস্থা ভেঙ্গে যাচ্ছে এবং তারা উচ্চ-জাতি গোষ্ঠীর সংস্পর্শে চলে আসছে। এর ফলে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আগে যেখানে কন্যাপণ দেবার প্রথা প্রচলিত ছিল, এখন সেখানে বরপণ প্রবর্তিত হয়েছে।

৭৫.৯ বিবাহ ব্যবস্থায় পরিবর্তন

শিল্পায়ন ও নগরায়ণের ফলে পৃথিবীর সমস্ত দেশেই বিবাহ ব্যবস্থায় নানারকম পরিবর্তন দেখা যায়।

১) **বিবাহরূপে পরিবর্তন ঃ** সমস্ত দেশেই এখন দম্পতি-কেন্দ্রিক বা এক-পতি-এক-পত্নীক বিবাহের প্রতি প্রবণতা দেখা যায়। এই প্রবণতা মুসলমান প্রধান দেশেও পরিলক্ষিত হয়। পাকিস্তানে কাজীসাহেব বহুবিবাহে (পুরুষের পক্ষে) পৌরোহিত্য করতে পারবেন যদি ব্যক্তির প্রথমা স্ত্রী তাঁর স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহে অনুমতি দেন।

২) **পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঃ** বর্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাত্র-পাত্রী স্বনির্বাচিত বিবাহের দিকে ঝুঁকেছে।

৩) **বিবাহের বয়ঃসীমাগত পরিবর্তন ঃ** ভারতবর্ষে ঐতিহ্যগতভাবে অল্পবয়সে বিবাহ দেওয়া হত। ১৯২৯ সালে Child Marriage Restraint Act বা Sarda Act বলবৎ হবার পরে এই নিয়মে কিছু পরিবর্তন ঘটলেও মোটামুটিভাবে অল্পবয়সেই বিবাহের প্রবণতা দেখা যেত। এই প্রবণতা বিশেষভাবে মেয়েদের ক্ষেত্রে বেশি পরিলক্ষিত হত।

কিন্তু শিক্ষার প্রসারের ফলে, বিশেষতঃ মেয়েদের শিক্ষার প্রসারের ফলে বিবাহের বয়ঃক্রম এখন বেড়ে গেছে। তাছাড়া সরকারী নীতিও অল্পবয়সের বিবাহকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে গণ্য করে।

(৪) **বিবাহের আনুষ্ঠানিক কার্যসূচীতে পরিবর্তন ঃ** শিল্পায়ন, নগরায়ণ ও শিক্ষার প্রসারের ফলে বিবাহের অনুষ্ঠানিক কার্যসূচী সঙ্কুচিত হবার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু ভারতবর্ষের দিকে তাকালে দেখা যায় যে এখানে বিবাহের আনুষ্ঠানিক কার্যসূচী সঙ্কুচিত না হয়ে অত্যন্ত বেশিভাবে বলবৎ হয়েছে।

৭৫.১০ পরিবার ও বিবাহের পারস্পরিক সম্পর্ক

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে পরিবার একটি সমিতি এবং তার প্রাতিষ্ঠানিক আচারব্যবস্থা হচ্ছে বিবাহ। বিবাহ হচ্ছে পরিবার গঠনের কার্যপ্রণালী। পরিবার নামক সমিতিকে বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠান ছাড়া চিন্তা করা যায় না। অর্থাৎ পরিবার বললেই তার মধ্যে বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানের ধারণা নিহিত থাকবে। (Family encompasses marriage). লাউয়ী (Lowie) মন্তব্য করেন, "বিবাহ ও পরিবার দুটি পরিপূরক ধারণা, বিবাহ প্রতিষ্ঠান, আর পরিবার সংঘ, যে সংঘটি ঐ প্রতিষ্ঠানেরই প্রতিরূপ।"

৭৫.১১ সারাংশ

পরিবার হল একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রতিষ্ঠান যেখানে বিবাহের মাধ্যমে পুরুষ এবং স্ত্রী যৌথভাবে বসবাস করে থাকে। এটি একটি অতি প্রাচীন প্রতিষ্ঠান। বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী, যেমন—অগবার্ন ও নিমকফ্,

ম্যাকাইভার ও পেজ্ প্রমুখরা তাঁদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী থেকে পরিবারকে বর্ণনা করেছেন। তাঁদের বিচার-বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, সন্তান প্রসব এবং রক্ত সম্পর্কের বন্ধন হল পরিবারের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

পরিবারের সার্বজনীনতা প্রসঙ্গে সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতানৈক্য লক্ষ্য করা যায়। অনেকেই এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, এক-বিবাহকারী পরিবার হল একটি বিশ্বজনীন বা সার্বিক প্রতিষ্ঠান। কিন্তু এল. এইচ. মর্গান, ফ্রেজার প্রমুখরা মন্তব্য করেছেন যে, পরিবার হল সমাজ বিকাশের ফলশ্রুতি। এ বিষয়ে মর্গান তাঁর বিবর্তন তত্ত্বকে উপস্থাপিত করেছেন যেটিকে আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীরা সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপ্রেক্ষিতে বিচার-বিশ্লেষণ করছেন।

সমাজবিজ্ঞানীরা বিবাহ-পদ্ধতির ভিত্তিতে পরিবারকে একপতি-পত্নীক, বহুপত্নীক, বহুপতি, গোষ্ঠী-বিবাহ ভিত্তিক ; প্রভুত্বের মাপকাঠি অনুযায়ী পিতৃতান্ত্রিক, মাতৃতান্ত্রিক ; বাসস্থানের অধিকার অনুযায়ী পিতৃআবাসিক, মাতৃআবাসিক ; বংশানুক্রম অনুযায়ী পিতৃস্বীকার্য, মাতৃস্বীকার্য ; এবং আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীতে একক, যৌথ এবং বিস্তৃত পরিবার ইত্যাদি বিভিন্নভাবে বিভক্ত করেছেন।

ভারতীয় যৌথ পরিবার একটি প্রাচীন প্রতিষ্ঠান যার প্রধান দুটি বৈশিষ্ট্য হল যৌথ সম্পত্তির অস্তিত্ব এবং একজন গৃহদেবতার উপস্থিতি যিনি পরিবারের সকলের আরাধ্য দেবতা। যৌথ পরিবার বিশেষভাবে পরিচালিত এবং নিয়ন্ত্রিত হতো পরিবারের বয়স্ক ব্যক্তিদের দ্বারা। যৌথ পরিবারের সদস্যরা একসাথে মিলেমিশে কাজ করত, একই সাথে খাওয়াদাওয়া করত এবং তিন থেকে চার প্রজন্মের সদস্যরা একসাথে বসবাস করত। শ্রীনিবাস তাঁর 'রিলিজিয়ন এ্যাণ্ড সোসাইটি এ্যামঙ্গ দ্য কুর্গস অফ সাউথ ইণ্ডিয়া' বইটিতে কুর্গদের মধ্যে হিন্দু যৌথ পরিবার ব্যবস্থার অস্তিত্বকে অতি সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করেছেন।

পরিবার এবং বিবাহ পরস্পরের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই মূলতঃ পরিবার গঠিত হয়ে থাকে। বিবাহের ব্যক্তিগত এবং সামাজিক মূল্য উভয়ই বর্তমান, বিবাহের মাধ্যমেই লোকাচার, লোকনীতি, আইন ইত্যাদির প্রতিফলন ঘটে থাকে।

সমাজবিজ্ঞানীরা পতি বা পত্নীর সংখ্যার ভিত্তিতে বিবাহকে এক পতি-পত্নীক এবং বহুবিবাহ ; পাত্র-পত্নী নির্বাচন করার ভিত্তিতে সগোত্র বা অন্তর্বিবাহ এবং বহির্গোত্র বিবাহ ; বিবাহ বন্ধনের ফলে সামাজিক মর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে অনুলোম এবং প্রতিলোম বিবাহ ; পাত্র-পাত্রীর মধ্যে বয়স, শিক্ষা, রুচি, আর্থিক অবস্থা ইত্যাদি নানাবিষয়ে সমতা ও অসমতার ভিত্তিতে সমবিবাহ এবং অসমবিবাহ ; বিবাহের পাত্র-পাত্রীর মনোনয়নের ভিত্তিতে স্ব-নির্বাচিত এবং সংযোজিত বিবাহ ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ করেছেন। এছাড়া, উপজাতিদের মধ্যে তুলে নিয়ে গিয়ে বিবাহ, পাত্রীর গৃহে শ্রমদান করে বিবাহ ইত্যাদি প্রচলিত ছিল।

আধুনিক সমাজে শিল্পায়ন এবং নগরায়ণ প্রক্রিয়ার প্রভাবে বিবাহ রূপে, পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে, বয়ঃসীমার ক্ষেত্রে, বিবাহের আনুষ্ঠানিক কার্যসূচীর ক্ষেত্রে নানাবিধ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং হচ্ছে।

৭৫.১২ অনুশীলনী

১) নীচের শূন্যস্থানগুলি পূরণ করুন ঃ

ক) —— এবং —— এর মতে, পরিবার স্বামী এবং স্ত্রী-এর দ্বারা সৃষ্ট এমন একটি সংঘ যেখানে সন্তান-সন্ততি থাকতেও পারে, আবার নাও পারে।

খ) বিবর্তন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আবির্ভাব ঘটেছে পরিবারের ——।

গ) পৃথিবী জুড়ে —— পরিবারের সংখ্যাই বেশী।

ঘ) তিব্বত এবং হিমালয়ের পার্বত্যভূমিতে —— পরিবারের প্রচলন রয়েছে।

ঙ) আদর্শ পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের সর্বপ্রথম প্রচলন দেখা যায় ——।

চ) বিবাহের পর পাত্রী পাত্রের পরিবারভূক্ত হয়ে বসবাস করলে সেই পরিবারকে বলা হয় —— পরিবার।

ছ) খাসা উপজাতিদের মধ্যে —— পরিবারের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়।

জ) একক পরিবারের দ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধির কারণ হল —— এর প্রভাব।

ঝ) হিন্দু যৌথ পরিবার সম্বন্ধে —— 'রিলিজিয়ন এ্যাণ্ড সোসাইটি এ্যামঙ্গ দ্য কুর্গস অফ্ সাউথ ইণ্ডিয়া' বইতে আলোচনা করেছেন।

ঞ) একজন পুরুষ বহুপত্নী গ্রহণ করলে সেই বিবাহকে বলা হয় —— বিবাহ।

ট) —— হল সেই ধরনের বিবাহ যখন একই গোষ্ঠী থেকে পাত্র-পাত্রীর বিবাহ নিষিদ্ধ বলে বিবেচিত হয়।

ঠ) নিম্নবংশজাত পাত্রের সাথে অপেক্ষাকৃত উচ্চশ্রেণীর কন্যার বিবাহকে —— বিবাহ বলে।

ড) পাত্র-পাত্রী পরস্পর পরস্পরকে মনোনয়ন করলে যে বিবাহ হয় তাকে —— বিবাহ বলে।

ঢ) —— বিবাহ হলো সেই ধরনের বিবাহ যেখানে পাত্র-পাত্রী মনোনয়ন করেন অভিভাবক বা আত্মীয়-স্বজনবর্গ।

ণ) Child Marriage Restraint Act বলবৎ হয় —— সালে।

২) নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ

ক) একক পরিবার কাকে বলে?

খ) যৌথ পরিবার এবং বিস্তৃত পরিবারের মধ্যে পার্থক্য দেখান।

গ) অনুলোম এবং প্রতিলোম বিবাহ কাকে বলে?

ঘ) পিতৃ-আবাসিক ও মাতৃ-আবাসিক পরিবারের মধ্যে পার্থক্য উদাহরণসহ নির্দেশ করুন।

ঙ) শিল্পায়ন ও নগরায়ণের ফলে বিবাহ প্রথায় কি কি পরিবর্তন দেখা যায়?

৩) নীচের প্রশ্নগুলির বিস্তারিত উত্তর দিন ঃ

ক) পরিবারের সংজ্ঞা নির্দেশ করুন, বিভিন্ন প্রকার পরিবারের ওপর একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

খ) বর্তমান সমাজে পরিবারের প্রয়োজনীয়তা আছে কি না তা বুঝিয়ে বলুন।

গ) হিন্দু যৌথ পরিবারের ওপর একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন।

ঘ) বিবাহ কয় প্রকার ও কি কি? পরিবার ও বিবাহের পারস্পরিক সম্পর্ক দেখান।

১৫.১৩ উত্তর সংকেত

১) ক) অগবার্ন এবং নিমকফ্ ; খ) এল. এইচ. মর্গান ; গ) এক পতি-পত্নীক ; ঘ) বহুপতি ; ঙ) প্রাচীন রোমে ; চ) পিতৃ-আবাসিক ; ছ) মাতৃ-আবাসিক ; জ) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ; ঝ) শ্রীনিবাস ; ঞ) বহুপত্নীক ; ট) বহির্বিবাহ ; ঠ) প্রতিলোম ; ড) স্ব-নির্বাচিত ; ঠ) সংযোজিত ; ণ) ১৯২৯

১৫.১৪ গ্রন্থপঞ্জী

১) Anderson & Parker : *Society—Its Organisation & Operation* ; Affiliated East West Press Pvt. Ltd ; New Delhi ; 1966.

২) Bottomore, T. B. : *Sociology* : *A Guide to Literature* ; Unwin University Books ; London ; 1962.

৩) Davis, Kingsley : *Human Society* ; The MacMillan Co ; New York.

৪) কর, পরিমলভূষণ ঃ *সমাজতত্ত্ব*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা ১৯৯৫।

৫) Mac Iver & Page : *Society* ; Mac Millan & Co. Ltd. London ; 1959.

৬) Prabhu, P. N. : *Hindu Social Organisation* ; 1954.

৭) Srinivas, M. N. : *Religion & Society Among the Coorgs of South India.*

একক ৭৬□ পারবারের কাযাবলা এবং ববাহের উপযোগতা

গঠন

৭৬.১ উদ্দেশ্য

৭৬.২ প্রস্তাবনা

৭৬.৩ পরিবারের কার্যাবলী

৭৬.৩.১ জৈবিক বা জন্মদানমূলক কাজ

৭৬.৩.২ শিক্ষামূলক কার্যাবলী

৭৬.৩.৩ অর্থনৈতিক কার্যাবলী

৭৬.৩.৪ রাজনৈতিক কার্যাবলী

৭৬.৩.৫ মনস্তাত্ত্বিক কার্যাবলী

৭৬.৩.৬ আমোদ-প্রমোদমূলক কার্যাবলী

৭৬.৩.৭ ধর্মীয় কার্যাবলী

৭৬.৩.৮ সামাজিকীকরণের কার্যাবলী

৭৬.৪ কৃষিভিত্তিক গ্রামসমাজে পরিবারের ভূমিকা

৭৬.৫ কৃষিভিত্তিক পরিবারের পরিবর্তন

৭৬.৫.১ কৃষির ওপর ক্রমবর্ধমান চাপ

৭৬.৫.২ শিল্পায়নের প্রসার

৭৬.৫.৩ নগরায়ণের প্রসার

৭৬.৫.৪ গণতান্ত্রিক ধারণার প্রসার

৭৬.৫.৫ বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রভাব

৭৬.৬ আধুনিক পরিবারের রূপ

৭৬.৬.১ কাঠামোগত পরিবর্তন

৭৬.৬.২ কার্যাবলীগত পরিবর্তন

৭৬.৭ পরিবারের ভবিষ্যৎ

৭৬.৮ বিবাহের উপযোগিতা

৭৬.৮.১ হিন্দু সমাজে বিবাহের তাৎপর্য

৭৬.৯ সারাংশ

৭৬.১০ অনুশীলনী

৭৬.১১ উত্তর সংকেত

৭৬.১২ গ্রন্থপঞ্জী

৭৬.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠের মাধ্যমে আপনি নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের ওপর একটি সুচিন্তিত, সুনির্দিষ্ট এবং স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তুলতে সক্ষম হবেন এবং সমাজতত্ত্বে এই বিষয় সম্পর্কিত গবেষণায় আপনার দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যবহারিক প্রয়োগ ঘটাতে সমর্থ হবেন ঃ

- পরিবারের কার্যাবলী সম্পর্কিত আলোচনা ;
- কৃষিভিত্তিক গ্রামসমাজে পরিবারের ভূমিকা ;
- কৃষিভিত্তিক গ্রামসমাজে পরিবারের পরিবর্তনের কারণ ;
- আধুনিক পরিবারের রূপ ;
- পরিবার প্রথার ভবিষ্যৎ ;
- বিবাহের উপযোগিতা।

৭৬.২ প্রস্তাবনা

অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মতই পরিবার হচ্ছে কতকগুলি স্বীকৃত নিয়ম বা পদ্ধতি-সম্বলিত একটি ব্যবস্থা যে ব্যবস্থাটি কিছু গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক কাজ নিষ্পন্ন করার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সমাজতত্ত্বে পরিবার ঘনিষ্ঠতম আত্মীয় গোষ্ঠী হিসাবে স্বীকৃত। কেননা, এই গোষ্ঠীটির সদস্যগণের মধ্যে পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি প্রভৃতির মধ্যে যে পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতা দেখতে পাওয়া যায় তেমন আর অন্য কোন গোষ্ঠীর মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না।

প্রত্যেক সমাজে পরিবার থেকেই মানুষের গোষ্ঠীভুক্ত জীবনের সূত্রপাত ঘটে। পরিবার ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে মধ্যস্থ (mediator) হিসাবে অবস্থিত থেকে ব্যক্তিকে বৃহত্তর সমাজজীবনে তার ভূমিকা প্রতিপালনের জন্য প্রস্তুত করে তোলে এবং এই প্রস্তুতিপর্ব চলার সাথে সাথে ব্যক্তিও অর্জন করে নেয় একটা নিজস্বতা, পেয়ে যায় ব্যক্তিগত নিরাপত্তা এবং ব্যক্তিগত জীবনের একটা একান্ত আশ্রয়। জীবজগতের মতই মানুষের সমাজেও নারী-পুরুষের মিলন এবং প্রজনন একটি অবিনশ্বর প্রক্রিয়া। কিন্তু মানুষ বিচরণশীল সামাজিক জীব। সংস্কৃতি এবং সভ্যতার স্রষ্টা মানুষ সেই প্রজনন সংক্রান্ত জৈবিক প্রক্রিয়াটিকে রুচিনিষ্ঠ এবং মূল্যমানসমৃদ্ধ করে নিয়েছে, সামাজিক রীতিতে পরিণত করেছে। নারী-পুরুষের সম্পর্কে যাতে সম্মানজনক এবং ন্যায়সঙ্গত হয়, তাদের সৃষ্ট সন্তানেরা যাতে উপযুক্ত যত্ন-পরিচর্যায় লালিত-পালিত হয় সেই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক সমাজেই কিছু না কিছু নিয়মবিধির ব্যবস্থা থাকে, বিবাহ এমনই একটি প্রতিষ্ঠানগত অনুষ্ঠান-রীতি অথবা পদ্ধতি।

পূর্ববর্তী এককে পরিবার ও বিবাহ এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। বর্তমান এককে পরিবারের বহুবিধ কার্যাবলী, পরিবার ব্যবস্থায় পরিবর্তন এবং বিবাহের উপযোগিতা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৭৬.৩ পরিবারের কার্যাবলী

পরিবার সমাজজীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। এখানে ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করে এবং মৃত্যু পর্যন্ত এখানেই জীবন অতিবাহিত করে। দেখা যায় যে পরিবার সমাজে অনেকগুলি কাজ সম্পন্ন করে থাকে। সমাজবিজ্ঞানীদের মতে পরিবারের কার্যাবলীকে নিম্নলিখিতভাবে দেখান যায়—

৭৬.৩.১ জৈবিক বা জন্মদানমূলক কাজ (Biological Functions)

পরিবার নর-নারীর যৌন মিলন এবং সন্তান উৎপাদন ও লালন-পালনকে বৈধতা প্রদান করে। এইভাবে পরিবার সমাজে শৃঙ্খলা বজায় রাখে এবং ব্যভিচার ও অন্যান্য অপরাধ দূর করতে সাহায্য করে।

৭৬.৩.২ শিক্ষামূলক কার্যাবলী (Educational Functions)

পরিবার সমাজবদ্ধ মানুষের প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র। পরিবারে সন্তানেরা যে শিক্ষালাভ করে তা তাদের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে ও স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে। পরিবারের বিভিন্ন আচার আচরণ ও অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ব্যক্তির মধ্যে নম্রতা, ভদ্রতা, দয়া, মায়া, প্রীতি, ভালবাসা প্রভৃতি গুণগুলি বিকাশ লাভ করে। তাই বলা হয় যে পরিবারের সুষ্ঠু পরিবেশ রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নাগরিক তৈরী করার জন্য বিশেষ উপযোগী। অবশ্য অনেক সময় পরিবার মন্দ মূল্যবোধও শেখায়।

৭৬.৩.৩ অর্থনৈতিক কার্যাবলী (Economic Functions)

কৃষিভিত্তিক সমাজে এবং ভারতবর্ষের কিছু কিছু শিল্পভিত্তিক পরিবারে পরিবারই অর্থনৈতিক কার্যাবলী পালন করে থাকে। বর্তমানে সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের অর্থনৈতিক কাজ, বিশেষ করে শিল্পোন্নত রাষ্ট্রগুলিতে অন্যান্য সমিতি বা প্রতিষ্ঠান করে থাকলেও, ভারতবর্ষের মত দেশে এখনও দেখা যায় যে পরিবারের সম্পত্তির ওপর নির্ভর করেই আর্থিক সচ্ছলতার কথা চিন্তা করা হয়ে থাকে।

৭৬.৩.৪ রাজনৈতিক কার্যাবলী (Political Functions)

পরিবারের মধ্যেই ব্যক্তি প্রাথমিক নিয়মশৃঙ্খলা, সহযোগিতা, সহনশীলতা, আলোচনা, পরামর্শ প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষালাভ করে। ভবিষ্যৎ নাগরিকের জন্য এই শিক্ষাগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এই কারণে পরিবারকে নাগরিক গুণের প্রাথমিক শিক্ষাগার বলা হয়ে থাকে। প্রাচীন রোমের প্যাট্রিয়ার্কের ভূমিকা লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে পরিবারই ছিল একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র, যাতে পরিবারের কর্তার হাতে নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব বলবৎ ছিল। কিন্তু বর্তমানে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ফলে সেই কর্তৃত্ব অনেকটা শিথিল হয়ে পড়েছে।

৭৬.৩.৫ মনস্তাত্ত্বিক কার্যাবলী (Psychological Functions)

প্রত্যেক পরিবার একটি গুরুত্বপূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক ভূমিকা পালন করে থাকে। পরিবার তার সদস্যদের মানসিক ও শারীরিক যত্ন নিয়ে থাকে। পরিবারের মধ্যে ব্যক্তি প্রেম-প্রীতি, মায়া-মমতা, স্নেহ-ভালবাসা প্রভৃতি হৃদয়বৃত্তিকে অনুভব করতে পারে। বহির্জগতের অনেক ব্যথা-বেদনা, ব্যর্থতা-হতাশার উপশম হয় পরিবারের মধ্যে। তাছাড়া, পরিবার ব্যক্তির সুষ্ঠু মানসিকতা গড়ে তুলতে বিশেষ সহায়তা করে। অবশ্য সব পরিবারের পরিবেশ এ ব্যাপারে অনুকূল হয় না।

৭৬.৩.৬ আমোদ-প্রমোদমূলক কার্যাবলী (Recreational Functions)

আমরা বলে থাকি পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো সাধারণত পরিবারেই সদস্যরা তাদের অবসর সময় কাটান। জীবনের একঘেয়েমির ভাব দূর করতে পরিবারের সদস্যরা গল্প-গুজব করে বা ছেলেমেয়েরা খেলাধূলা করে সময় কাটান।

৭৬.৩.৭ ধর্মীয় কার্যাবলী (Religious Functions)

পরিবারের মধ্যেই ব্যক্তি তার ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করে থাকে। ধর্মীয় গোষ্ঠীর নিয়ম-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান বিষয়ে সম্যক জ্ঞান ব্যক্তি পরিবার থেকেই লাভ করে। অবশ্য সব ক্ষেত্রেই যে পরিবার তার সদস্যদের ধর্ম বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান দান করে তা নয়, কোনও কোনও ক্ষেত্রে প্রাথমিক ধর্মীয় জ্ঞান ব্যক্তি পরিবার থেকে লাভ করে থাকে।

৭৬.৩.৮ সামাজিকীকরণের কার্যাবলী (Functions related to Socialization)

পরিবার সামাজিকতা শিক্ষা দেবার প্রধান কেন্দ্রস্থল। সামাজিক আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, আদব-কায়দা, মূল্যবোধ, ধর্ম, সংস্কৃতি প্রভৃতি সব বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা আমরা পরিবার থেকে পেয়ে থাকি। এই শিক্ষা ব্যক্তিকে সমাজের সঙ্গে মিলে চলতে শেখায়।

সময় ও সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন হলেও পরিবার উপরোক্ত কাজকর্মগুলি করে থাকে।

এতক্ষণ আমরা পরিবারের সদর্থক ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করলাম। পরিবারের অন্ধকারময় দিকের কথাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন। পরিবারের অভ্যন্তরে যে সমস্যা এখন উত্তরোত্তর বৃদ্ধির পথে তা হল নারী, বিশেষতঃ পত্নী বা স্ত্রীর ওপর মানসিক এবং শারীরিক নির্যাতন। পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীরা বিভিন্ন বৈষম্য এবং অব্যবস্থার শিকার। শিশুরাও এই অবস্থা থেকে মুক্ত নয়। পরিবারের মধ্যে তাদেরও নানাধরনের নির্যাতনের শিকার হতে হয়। অনেক পরিবারের সদস্যরা বয়স্ক ব্যক্তিদের, যাঁরা কর্মক্ষমতা হারিয়েছেন, তাঁদের পরিবারের বোঝা বলে মনে করে এবং তাঁদের প্রতি অবজ্ঞাসূচক মনোভাব দেখায়। ফলস্বরূপ, বৃদ্ধাশ্রমের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে যেখানে জীবনের শেষ কয়েকটি দিন শান্তিতে কাটাতে পরিবারে উপেক্ষিত বয়স্ক ব্যক্তিরা আশ্রয় গ্রহণ করছেন।

৭৬.৪ কৃষিভিত্তিক গ্রামসমাজে পরিবারের ভূমিকা

কৃষিভিত্তিক গ্রাম সমাজে সাধারণতঃ দুই বা ততোধিক পুরুষের একান্নবর্তী পরিবার দেখা যায়। কৃষিভিত্তিক গ্রামসমাজে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ও দায়দায়িত্ব এবং সংসারের যাবতীয় কাজকর্মকে কেন্দ্র করে পরিবার জীবন গড়ে ওঠে। পরিবার কৃষি বা বস্ত্র বয়ন ও সীবন, মাটির জিনিসপত্র তৈরি করা, প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র তৈরি করা বা বাসস্থান মেরামতি করা প্রভৃতি কাজকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। এই ধরনের পরিবারে পুরুষেরা সাধারণত বাইরের কাজ করেন ও মহিলারা গৃহস্থলীর কাজকর্ম করেন ও শিশুদের প্রতিপালন করেন। এই প্রকার পরিবারে লোকসংখ্যা বেশি হবার দিকে প্রবণতা দেখা যায়। কৃষিকাজের জন্য অধিক সংখ্যক লোকের প্রয়োজন। এবং পরিবারগুলি একান্নবর্তী যৌথ পরিবার হওয়ায় কৃষিকাজ বা যে কোনও অর্থনৈতিক কাজের প্রয়োজনীয় লোকজন পরিবারের ভিতর থেকেই যোগান দেওয়া হয়। আমরা পূর্বের এককে (পরিবার ও বিবাহের সংজ্ঞা এবং তাদের

পারস্পরিক সম্পর্ক) ওক্কাদের মধ্যে যৌথ পরিবারে দেখেছি যে কৃষিকাজ সাধারণত একটি ওক্কার অন্তর্ভুক্ত লোকেরাই করে থাকে। এই সকল পরিবারের প্রসারণ দু'ভাবে হতে পারে—১) উল্লম্বী সম্প্রসারণ (পরিবারস্থ ভ্রাতাদের সন্তান সংখ্যা বৃদ্ধির দ্বারা) ; ২) পার্শ্বিক সম্প্রসারণ (নিকট বা দূর সম্পর্কিত আত্মীয়স্বজনের পরিবারের মধ্যে এসে বসবাসের দ্বারা)। উভয় প্রকার সম্প্রসারণের ফলে কৃষিকার্যের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

কৃষিভিত্তিক সমাজে পরিবারের সদস্যদের ভৌগোলিক সচলতা কম থাকে। এই কারণে অনেক সময় এই পরিবারের অনেক সদস্যের সত্তার পূর্ণবিকাশ নাও ঘটতে পারে।

এই ধরনের পরিবারে পারিবারিক নেতৃত্ব সাধারণতঃ বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষ সদস্যের ওপর থাকে। এবং গৃহাভ্যন্তরের নেতৃত্বের ভার বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলা সদস্যের হাতে ন্যস্ত থাকে।

এই ধরনের পরিবারে মহিলাদের সামাজিক স্থান সাধারণতঃ পুরুষের সঙ্গে সমান জায়গায় থাকে না।

এই পরিবারের অনেকরকম নিরাপত্তামূলক দায়-দায়িত্ব পালন করতে হয়। বার্ধক্য বা অসুস্থতার জন্য পরিবারস্থ কোনও সদস্য কর্মক্ষম না থাকলে তার ভরণপোষণের দায়িত্ব এই পরিবারের ওপর বর্তায়। তাছাড়া বিধবা বোন যাকে দেখার কেউ নেই তিনি তার অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের নিয়ে এই পরিবারে আশ্রয় পান। অনেকসময় বহু পুরানো ভৃত্য যারা বহুদিন ধরে পরিবারের সঙ্গে যুক্ত তাদেরও এই পরিবারের সদস্য হিসাবে থাকতে দেখা যায়।

এই ধরনের পরিবারের মধ্যে একটি সামূহিক ব্যাপার থাকে। দেখা যায় যে পরিবারের সদস্যরা তাদের প্রায় সবধরনের প্রয়োজনই পরিবারের মধ্যে থেকে মেটাতে পারেন। সেই কারণে কৃষিভিত্তিক পরিবারকে ক্ষুদ্র সম্প্রদায় (community) বলা যেতে পারে।

৭৬.৫ কৃষিভিত্তিক পরিবারের পরিবর্তন

সমাজে বিভিন্ন পরিবর্তনের সাথে সাথে কৃষিভিত্তিক পরিবার প্রথায় প্রভূত পরিবর্তন দেখা যায়। এই ধরনের পরিবারে নিম্নলিখিত কারণে পরিবর্তন দেখা যায়।

১) কৃষির ওপর ক্রমবর্ধমান চাপ ;

২) শিল্পায়নের প্রসার ;

৩) নগরায়ণের প্রসার ;

৪) গণতান্ত্রিক ধারণার প্রসার ;

৫) বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রভাব।

৭৬.৫.১ কৃষির ওপর ক্রমবর্ধমান চাপ

পরিবারের আয়তন ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে কৃষির ওপর অত্যধিক চাপ পড়ে যায়। তাছাড়া কৃষিযোগ্য ভূমির পরিমাণ সমানুপাত বাড়ে না বলে, কৃষি পরিবারস্থ সদস্যদের জীবিকার্জনের উপায় হিসাবে পুরোপুরি কাজ

করতে পারেনা। পরিবারস্থ সদস্যদের অন্যত্র যেতে হয় জীবিকার সন্ধানে। এর ফলে এই একান্নবর্তী পরিবারের রূপ পরিবর্তিত হয়ে যায়।

৭৬.৫.২ শিল্পায়নের প্রসার

শিল্পায়নের প্রসারের ফলে বিভিন্ন কলকারখানা স্থাপিত হয়। জীবিকার সন্ধানে পরিবারস্থ ব্যক্তিরা বিভিন্ন কলকারখানায় যোগ দেয়। এর ফলে পরিবারের পূর্ববর্তী অর্থনৈতিক বন্ধন শিথিল হয়ে পড়ে এবং পারিবারিক ঐক্য ও সংহতি স্বাভাবিকভাবে হীনবল হয়ে যায়। তাছাড়া কলকারখানায় পারিশ্রমিক টাকায় দেওয়া হয় বলে প্রত্যেক উপার্জনকারী ব্যক্তি যার যার আয় সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে এবং ক্রমশ নানা কাজকর্মে ও আচার-আচরণে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ পেতে থাকে। এর ওপরে দেখা যায় যে শিল্পায়নের ফলে কর্ম সংস্থানের সুযোগ সুবিধা বেড়ে যাওয়াতে মেয়েদের উপযোগী কাজকর্ম সৃষ্টি হয় এবং মহিলারা সেই কাজে অধিক সংখ্যায় যোগ দেয়। ফলে মেয়েদের আর্থিক নির্ভরশীলতা হ্রাস পায়। এর ফলেও একান্নবর্তী পরিবারে বিশেষ পরিবর্তন ঘটে থকে।

৭৬.৫.৩ নগরায়ণের প্রসার

নগর সমাজে বাসস্থানের পরিসর হ্রাস পায় বলে অধিকসংখ্যক ব্যক্তি একজায়গায় বাস করতে পারে না। স্বাভাবিকভাবেই একান্নবর্তী পরিবার ভেঙ্গে একক পরিবারের সৃষ্টি হয়। তাছাড়া নগর সমাজে জনস্বাস্থ্য ও বিনোদনের জন্য সর্বজনীন ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় বলে পরিবারের পূর্ববর্তী সামুহিক প্রকৃতি অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। নগরসমাজে পরিবারের কাছে শিশুর শিক্ষা-দীক্ষার দায়িত্ব থাকে না। তাছাড়া নগর সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল নৈর্ব্যক্তিকতা। কৃষিভিত্তিক গ্রামসমাজে প্রত্যেকে প্রত্যেককে ভালভাবে চিনত। ফলে সামাজিক রীতিনীতি অত্যন্ত কঠিনভাবে সমাজের সদস্যদের ওপর বর্তায়। নগর জীবনের ক্রমবর্ধমান নৈর্ব্যক্তিকতার ফলে প্রচলিত রীতিনীতি সদস্যদের পক্ষে পরিবর্তন বা ত্যাগ করা সম্ভব হয়। এর ফলে পারিবারিক আচার-আচরণে এবং পারস্পরিক সম্পর্কে নানারকম পরিবর্তন ঘটে।

৭৬.৫.৪ গণতান্ত্রিক ধারণার প্রসার

গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রসারের ফল পরিবারের ওপরেও পরিলক্ষিত হয়। আগে স্বামী বা পিতা পারিবারিক বিষয়ে যে আধিপত্য বা কর্তৃত্ব ভোগ করতেন, তা সব সমাজেই অনেক হ্রাস পেয়েছে। স্বামী-স্ত্রী বা পিতা-পুত্রের সম্পর্কের পরিবর্তনের ফলে পারিবারিক সম্পর্কেও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

৭৬.৫.৫ বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রভাব

বিজ্ঞানচর্চা ও গবেষণার ফলে ধর্ম সম্পর্কিত চিন্তা-ভাবনা এবং দৃষ্টিভঙ্গীতে পরিবর্তন ঘটেছে। এর প্রতিফলন দেখা যায় যখন জন্মনিয়ন্ত্রণকে পারিবারিক আদর্শ হিসাবে মেনে নেওয়া হয়।

৭৬.৬ আধুনিক পরিবারের রূপ

শিল্পভিত্তিক নগরসমাজ বা গ্রামসমাজ যেদিকেই তাকানো যাক না কেন পরিবারের কাঠামোগত এবং কার্যাবলীগত পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়।

৭৬.৬.১ কাঠামোগত পরিবর্তন

১) নগরসমাজ এবং গ্রামসমাজ উভয় জায়গাতেই দম্পতিকেন্দ্রিক পরিবারের প্রতি প্রবণতা দেখা যাচ্ছে।

২) পরিবারের সন্তান সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। সরকারি নীতিও সন্তান সংখ্যা সীমিত রাখার অনুকূলে থাকায় পরিবারের আয়তন ক্রমশই ছোট হয়ে যাচ্ছে।

৩) আর্থিক স্বনির্ভরতা লাভ করায় পরিবারে মহিলারা অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ প্রতিপত্তি ও মর্যাদা লাভ করেছে বলে ধরা হয়।

৪) আগে পরিবারে বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষের আদেশ সকলে মান্য করত। অগ্রজ অনুজের পারস্পরিক সম্পর্কেও তা প্রতিফলিত হত। কিন্তু বর্তমানে প্রত্যেকের কিছু বলার থাকতে পারে — এই নীতি মোটমুটিভাবে সর্বজনস্বীকৃত। ফলে শুধুমাত্র স্বামী-স্ত্রী বা পিতা-পুত্রের সম্পর্কেই নয়, অন্যান্য সম্পর্কও সাম্যের আদর্শে প্রভাবিত।

৫) বিবাহ-বিচ্ছেদের হাস ক্রমাগত বৃদ্ধি পাবার ফলে পারিবারিক স্থায়িত্ব হ্রাস পাচ্ছে।

৭৬.৬.২ কার্যাবলীগত পরিবর্তন

১) আধুনিক পরিবারের কোনও উৎপাদনকর কাজ নেই বললেই চলে।

২) আধুনিক পরিবার শিক্ষাসংক্রান্ত কাজকর্মও করে না। কালোপযোগী শিক্ষার জন্য অধিকাংশ পিতামাতাই কিণ্ডারগার্টেন, নার্সারী প্রভৃতি সংস্থার ওপর নির্ভরশীল।

৩) আধুনিক পরিবার নিরাপত্তামূলক কাজকর্মও বিশেষ করেনা। চিকিৎসা বা বয়স্ক বা দুঃস্থ ব্যক্তিদের দেখাশোনার জন্য পরিবার অন্যান্য সমিতির ওপর নির্ভরশীল।

৪) অবসর বিনোদনের বিভিন্ন সর্বজনীন ব্যবস্থা থাকায় অবসর যাপনের ক্ষেত্রেও পরিবারের বিশেষ কোনও ভূমিকা নেই।

৫) তাছাড়া নানাধরনের সমিতি তৈরি হয়ে যাবার ফলে, ভাল খাবার-দাবার তৈরি করা বা ভাল সেলাই করার কাজও আজকাল পরিবার না করলেও চলে।

তবে এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে পরিবারের কাঠামোগত বা কার্যাবলীগত পরিবর্তন হলেও পরিবারের যে মনোভাব তার পরিবর্তন ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এখনও সেরকমভাবে পরিলক্ষিত হয়না। এখনও পরিবারে বিবাহ, অন্নপ্রাশন উপনয়ন প্রভৃতি অনুষ্ঠানে বয়োজ্যেষ্ঠ জীবিত সদস্য/সদস্যার নামে নিমন্ত্রণপত্র ছাপানো হয়ে থাকে।

তার ভারতবর্ষে শিল্পভিত্তিক কতকগুলি গোষ্ঠী যেমন মাড়োয়ারী, গুজরাতি প্রভৃতিদের মধ্যে এখনও যৌথ পরিবারের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়।

৭৬.৭ পরিবারের ভবিষ্যৎ

ম্যাকাইভার ও পেজকে অনুসরণ করে বলা যায় যে আধুনিক পরিবারের কাঠামো বা কার্য পরিবর্তিত হলেও পরিবারকে নিম্নোক্ত তিনটি কাজ সব সময় সব জায়গায় করতেই হয়।

১) সন্তানের জন্মদান ও তার প্রতিপালন করা।

২) সমাজ অনুমোদিত পন্থায় যৌন বাসনা পরিতৃপ্তির জন্য পরিবারের প্রয়োজনীয়তা এবং

৩) কতকগুলি সূক্ষ্মবোধ যেমন স্নেহ-ভালবাসা এগুলি ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারেনা। এগুলি পরিবারের মধ্যেই পাওয়া সম্ভব।

৭৬.৮ বিবাহের উপযোগিতা

বিবাহ নরনারীর শারীরিক মিলনকে বৈধতা প্রদান করে।

যৌন আকাঙ্ক্ষা মানুষের স্বাভাবিক ও জৈব ধর্ম। বিবাহের মাধ্যমে এই আকাঙ্ক্ষা সুনিয়ন্ত্রিতভাবে চরিতার্থ হয়। বিবাহের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি ও একজন নারীর মধ্যে যৌন আকর্ষণ ও মিলন যদি সামাজিকভাবে নিয়ন্ত্রিত না হয় তা হলে সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতা ও স্বৈরাচার প্রশ্রয় পাবে।

নরনারীর যৌন মিলনের ফলে অনেক সময়ই সন্তানের জন্ম হয়। যদি মিলনকামী নর ও নারীকে বিবাহের মাধ্যমে সমাজ স্বামী ও স্ত্রী হিসাবে চিহ্নিত না করে দেয়, তাহলে ঐ নর ও নারীর মিলনের ফলে যে শিশুর জন্ম হবে তার দায়িত্ব কার ওপর বর্তাবে। স্বামী ও স্ত্রী শিশুর পিতা ও মাতা। শিশুটির যত্নআত্তি করার দায়িত্ব ও কর্তব্য প্রধানতঃ তার মাতা ও পিতার। যৌন মিলন প্রয়াসী নর ও নারী সমাজের দায়িত্বশীল সভ্য হিসাবে সমাজে প্রতিষ্ঠা পায় তখনই যখন তারা বিবাহ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে স্বামী ও স্ত্রী হিসাবে স্বীকৃত হয়।

বিবাহ প্রতিষ্ঠানের দ্বারা যৌন সম্পর্ক স্থাপনে ইচ্ছুক নরনারী পরস্পরের প্রতি দায়িত্ব স্বীকার করে নেয়। বস্তুতঃ বিবাহের অনুপস্থিতিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই পারস্পরিক দায়িত্বকে নির্দিষ্টভাবে প্রতিষ্ঠা করা যেত না। বিবাহে নর ও নারীর সমাজ বা গোষ্ঠীর অন্যান্য সদস্যরা উপস্থিত থাকে তাদের মিলনের সূচনার সাক্ষী হিসাবে। হিন্দু বিবাহে পাত্রের হস্তে পাত্রীপক্ষের দ্বারা কন্যাদান এবং পাত্র ও পাত্রীর সপ্তপদীর আচারের মাধ্যমে একত্রে অগ্নি-প্রদক্ষিণ বর ও বধূর সামাজিক স্বীকৃতির সাক্ষ্য। খ্রীষ্টান বিবাহে গীর্জায় পাদ্রীর বর ও বধূকে সমবেতজনের সমক্ষে স্বামী ও স্ত্রী হিসাবে ঘোষণা করা বা মুসলমানদের শাদীতে মোল্লার কলমা পড়ানো অথবা আধুনিক রাষ্ট্রীয় শাসনে ম্যারেজ রেজিষ্ট্রারের কাছে পাত্র-পাত্রী স্বামী-স্ত্রী হিসাবে পঞ্জীকরণ এই নরনানীর স্বামী-স্ত্রী হিসাবে সামাজিক স্বীকৃতির পরিচায়ক। বিবাহের মাধ্যমে এই সামাজিক স্বীকৃতি না থাকলে যৌন সম্ভোগকারী নরনারীর পারস্পরিক দায়িত্ব প্রতিপালনে বিঘ্ন ঘটে।

৭৬.৮.১ হিন্দু সমাজে বিবাহের তাৎপর্য

হিন্দু সমাজের মূল ভিত্তিটি সবসময়ে ব্যক্তিকে অতিক্রম করে সমষ্টি জীবনের সুখকে প্রাধান্য দেয়। হিন্দু শাস্ত্রকারগণ দেখিয়েছেন যে হিন্দুসমাজে ব্যক্তির সুখ সর্বদাই সমষ্টির সুখের মধ্যে নিহিত। সেই কারণে বর্ণাশ্রম ধর্মের মধ্যে ছাত্র গুরুর গৃহ থেকে প্রত্যাবর্তন করা মাত্রই তাকে উপদেশ দেওয়া হত গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশ করার জন্য। শাস্ত্রকারদের মতে গার্হস্থ্য সমাজের আবশ্যক উপাদান। অর্থাৎ গৃহ একটি উপলক্ষ মাত্র, লক্ষ্য নয়। এবং প্রকৃত গৃহী তিনিই হবেন, যিনি ঠিকভাবে গৃহের প্রতি কর্তব্যকর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে সমাজের উপকার সাধন করেন। হিন্দু শাস্ত্রকারগণ, গৃহস্থাশ্রমকে বনস্পতির সঙ্গে তুলনা করেছেন। এই গাছের যেমন স্কন্ধ, শাখা, পল্লব, তেমনই সমাজের সকল অঙ্গ গৃহের প্রাণে প্রাণবান।

হিন্দু শাস্ত্রকারগণ পঞ্চযজ্ঞের কথা বলেছেন — ব্রহ্মযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ এবং ভূতযজ্ঞ। গৃহস্থকে এই পঞ্চযজ্ঞ করতে বলা হয়েছে। এই যজ্ঞের মূল অর্থ হল সেবা। অর্থাৎ এই যজ্ঞানুষ্ঠানের মাধ্যমে গৃহস্থ সমাজকে সেবা করে থাকেন। গৃহস্থের এই কর্তব্যকর্ম একমাত্র স্ত্রীর সাহায্যেই পালন করা সম্ভব। তাছাড়া, বিবাহ না করলে প্রাত্যহিক লোকযাত্রা যেমন, অতিথি সেবা, ভিক্ষাদান প্রভৃতি পালন করা সম্ভব হয় না।

বর্তমান সমাজে বিবাহের এই গুরুত্ব নানাভাবে খর্ব হচ্ছে ঠিকই। কিন্তু এখনও বিবাহ প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব সমাজে বহুলাংশে অপরিবর্তিত থেকে যাচ্ছে।

৭৬.৯ সারাংশ

সমাজজীবনে পরিবারের অবদান অনস্বীকার্য। নরনারীর যৌন মিলন, সন্তান উৎপাদন এবং লালনপালন, পারিবারিক সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন গুণাবলীর বিকাশসাধন, কৃষিভিত্তিক এবং কতিপয় শিল্পভিত্তিক সমাজে অর্থনৈতিক কার্যপ্রক্রিয়া সম্পাদন, রাজনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক, আমোদপ্রমোদ, ধর্ম এবং সামাজিকীকরণ সংক্রান্ত নানাবিধ কর্মকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে পরিবার সামাজিক জীবনে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। তবে নারী, শিশু এবং বয়স্কদের ওপর নির্যাতনের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবারের অন্ধকারময় দিকগুলিকেও অস্বীকার করা যায় না।

কৃষিভিত্তিক গ্রামসমাজে একান্নবর্তী যৌথ পরিবারগুলি সাংসারিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যাবতীয় কার্যাদি সম্পাদন করে থাকে। এই সমস্ত পরিবারগুলিতে লোকসংখ্যার আধিক্য বর্তমান। পুরুষরা সাধারণত বাইরের কাজ এবং মহিলারা গৃহস্থলী এবং সন্তান প্রতিপালন সংক্রান্ত কাজ করে থাকে। বিভিন্ন ধরনের কাজকর্ম সম্পাদনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় লোকজন যৌথ পরিবারের মধ্যে থেকেই সরবরাহ করা হয়। এই ধরনের সমাজে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সাধারণতঃ ভৌগোলিক সচলতার অভাব লক্ষ্য করা যায়। পরিবারের নেতৃত্ব বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষ সদস্যের হাতে ন্যস্ত থাকে। এই ধরনের পরিবারগুলিকে নিরাপত্তামূলক নানাবিধ দায়-দায়িত্ব পালন করতে হয়। পরিবারের সদস্যদের প্রায় সবধরনের চাহিদার পূরণ এই পরিবারের মধ্যে হয় বলে একে ক্ষুদ্র সম্প্রদায় বা community বলা যায়। কিন্তু কৃষিব্যবস্থার ওপর ক্রমবর্ধমান চাপ, শিল্পায়নের ব্যাপক প্রসার, নগরায়ণের প্রভাব, গণতান্ত্রিক চিন্তা-চেতনার বিস্তার, বিজ্ঞান চর্চা এবং গবেষণার প্রভাবে কৃষিভিত্তিক পরিবার ব্যবস্থায় পরিবর্তন

ঘটেছে। দম্পতিকেন্দ্রিক পরিবারব্যবস্থা পরিবারের আয়তন হ্রাস, মহিলাদের আর্থিক স্বনির্ভরতা, পারিবারিক স্বাধীনতা ইত্যাদি কাঠামোগত পরিবর্তন এবং উৎপাদনশীল কাজের অভাব, শিক্ষার ক্ষেত্রে বিকল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের উদ্ভব, নিরাপত্তাসংক্রান্ত ক্রিয়াকর্ম সম্পাদনের নিমিত্ত অন্যান্য সমিতির উদ্ভব, অবসর বিনোদনের ক্ষেত্রে বিকল্প ব্যবস্থাসমূহ ইত্যাদি কার্যাবলীগত পরিবর্তন সাধিত হলেও পরিবারের প্রাসঙ্গিকতা অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে বর্তমান। সন্তান উৎপাদন ও প্রতিপালন, সমাজ অনুমোদিত পন্থায় যৌন বাসনায় পরিতৃপ্তি এবং স্নেহ-ভালোবাসা সংক্রান্ত সূক্ষ্ম অনুভূতিসমূহ পারিবারিক কাঠামোর মধ্যেই সম্পাদিত হয়।

বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নরনারীর শারীরিক মিলন বৈধতা লাভ করে থাকে। বিবাহের মাধ্যমে এই মিলন সামাজিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। শারীরিক মিলনের ফলশ্রুতি হিসাবে অনেক সময় সন্তানের জন্ম হয়। হিন্দু, মুসলমান এবং খ্রীষ্টান বিবাহে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান পালন করা হয় এবং এর ফলে বিবাহ সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করে।

হিন্দু সমাজে ব্যক্তিগত সুখের পরিবর্তে সমষ্টিগত সুখকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। সেই কারণে গার্হস্থ্য জীবনের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। গার্হস্থ্য জীবনে গৃহস্থকে পঞ্চযজ্ঞের মাধ্যমে সমাজ সেবা করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

বর্তমান যুগে বিবাহের গুরুত্ব নানাভাবে খর্ব হলেও এই প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা যায় না।

৭৬.১০ অনুশীলনী

১) নীচের প্রশ্নগুলির কোন্‌টি ঠিক এবং কোন্‌টি ভুল তা নির্দিষ্ট স্থানে '√' চিহ্ন দিয়ে দেখান ঃ

		ঠিক	ভুল
ক)	পরিবার নরনারীর যৌন মিলন এবং সন্তান উৎপাদন ও লালনপালনকে বৈধতা প্রদান করে থাকে।	☐	☐
খ)	পরিবারের সুষ্ঠু পরিবেশ রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নাগরিক সৃষ্টির পরিপন্থি।	☐	☐
গ)	ভারতবর্ষে পরিবারের অর্থনৈতিক ভিত্তি হল পারিবারিক সম্পত্তি।	☐	☐
ঘ)	ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রভাবে পরিবারের ক্ষমতা অনেকটাই দুর্বল হয়ে পড়েছে।	☐	☐
ঙ)	পরিবার সামাজিকীকরণের একটি উল্লেখযোগ্য মাধ্যম।	☐	☐
চ)	কৃষিভিত্তিক গ্রামসমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল একান্নবর্তী যৌথ পরিবারের অনুপস্থিতি।	☐	☐
ছ)	পরিবারের সদস্যদের ভৌগোলিক সচলতার উপস্থিতির প্রাবল্য কৃষিভিত্তিক গ্রামসমাজের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।	☐	☐
জ)	কৃষিভিত্তিক পরিবারকে ক্ষুদ্র সম্প্রদায় বলে অভিহিত করা হয়।	☐	☐

	ঠিক	ভুল
ঝ) পারিবারিক স্থায়িত্ব হ্রাস পাওয়ার অন্যতম কারণ হল বিবাহ-বিচ্ছেদের হার হ্রাস।	☐	☐
ঞ) কৃষিভিত্তিক গ্রাম সমাজ এবং শিল্পভিত্তিক নগর সমাজে আধুনিককালে যৌথ পরিবারকেন্দ্রিক প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।	☐	☐
ট) পঞ্চযজ্ঞের মূল অর্থ হল সেবা	☐	☐

২) **নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ**

ক) পরিবারের প্রয়োজনীয়তার ওপর একটি সংক্ষিপ্ত টাকা লিখুন।

খ) কৃষিভিত্তিক গ্রামসমাজে পরিবারের ভূমিকা আলোচনা করুন।

গ) অর্থনৈতিক কারণে পরিবারে কিভাবে পরিবর্তন আসতে পারে?

ঘ) পঞ্চযজ্ঞ কি কি?

ঙ) বর্ণাশ্রম ধর্মগুলির নাম লিখুন।

৩) **নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির বিশদ্ উত্তর দিন ঃ**

ক) পরিবারের কার্যাবলী নির্দেশ করুন।

খ) শিল্পায়ন এবং নগরায়ণের ফলে পরিবারের কাঠামোগত ও কার্যাবলীগত কি কি পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়?

গ) আধুনিক পরিবারের রূপ কি হবে বলে আপনি মনে করেন?

ঘ) হিন্দু সমাজে বিবাহের তাৎপর্য পর্যালোচনা করুন।

ঙ) সমাজে বিবাহের গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলি আলোচনা করুন।

৭৬.১১ উত্তর সংকেত

১) ক) ঠিক ; খ) ভুল ; গ) ঠিক ; ঘ) ঠিক ; ঙ) ঠিক ; চ) ভুল ; ছ) ভুল ; জ) ঠিক ; ঝ) ভুল ; ঞ) ভুল ; ট) ঠিক।

৭৬.১২ গ্রন্থপঞ্জী

১) Goode, W. J. : The Family ; Prentice Hall of India Pvt. Ltd., New Delhi, 1965

২) কর, পরিমলভূষণ ঃ সমাজতত্ত্ব, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ, কলকাতা ১৯৯৫।

৩) Mac Iver & Page : Society ; MacMillan & Co. Ltd., London ; 1959.

একক ৭৭ □ মানব সমাজে অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে সম্পত্তি ও তার বিবর্তন সম্পর্কে একটি সাধারণ আলোচনা

গঠন

৭৭.১ উদ্দেশ্য

৭৭.২ প্রস্তাবনা

৭৭.৩ অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রয়োজনীয়তা

৭৭.৪ সম্পত্তি কাকে বলে?

৭৭.৫ সম্পত্তির উপাদানসমূহ

৭৭.৬ সম্পত্তির বৈশিষ্ট্য

৭৭.৭ সম্পত্তির প্রকারভেদ

৭৭.৮ সম্পত্তির বিভিন্ন প্রকারের মালিকানা

৭৭.৯ সম্পত্তির মালিকানা সম্পর্কিত বিবর্তন তত্ত্ব

৭৭.১০ সারাংশ

৭৭.১১ অনুশীলনী

৭৭.১২ গ্রন্থপঞ্জী

৭৭.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন এবং বিষয় সম্পর্কিত একটি সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তুলতে সমর্থ হবেন ঃ—

- সমাজে অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের গুরুত্ব,
- অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবে সম্পত্তি ব্যবস্থা — এর প্রকৃত অর্থ, বিবিধ উপাদান এবং বৈশিষ্ট্যসমূহ,
- মানব সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে সম্পত্তির বিভিন্ন রূপভেদ,
- সম্পত্তি ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে বিবিধ মালিকানা,
- সম্পত্তি ব্যবস্থার বিবর্তনের ইতিহাস।

৭৭.২ প্রস্তাবনা

মানুষের যে কোনো ক্রিয়াকলাপের মূলে রয়েছে তার বেঁচে থাকার তাগিদ। জৈবিক তাগিদেই মানুষ খাদ্য আহরণের প্রচেষ্টা চালায়। মানুষের আদিম অবস্থায় যে কোনো সামাজিক ক্রিয়াকলাপের ভিত্তিই ছিল সেই খাদ্য আহরণ অথবা খাদ্য প্রস্তুতি সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ। একে আমরা অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ নামে অভিহিত করতে পারি। এই কারণেই অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ মানুষের সামাজিক ক্রিয়াকলাপের ভিত্তিস্বরূপ।

সম্পত্তি ব্যবস্থা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান। বর্তমান পৃথিবীতে আমরা সম্পত্তিব্যবস্থার যে প্রকৃতি লক্ষ্য করি তা দীর্ঘ দিনের বিবর্তনের ফল। যে নানাবিধ রূপ এবং নানাধরণের অধিকারের চরিত্র নিয়ে আধুনিক সম্পত্তিব্যবস্থা বিদ্যমান তা নিঃসন্দেহে মানুষের আদিম অবস্থায় ছিল না। বিবর্তনের অর্থই হ'ল কোনো কিছুর ক্রমবিকাশ বা ধীরগতিতে নতুনতর চরিত্র অর্জন। যে সম্প্রদায়গত চরিত্র নিয়ে আদিম সমাজে সম্পত্তির প্রকাশ ঘটেছিল তা ধীরে ধীরে কখনো যৌথ বা কখনো ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে বিকাশলাভ করতে থাকে। সম্পত্তির এই বিকাশ প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করার আগে অর্থাৎ মালিকানার প্রকারভেদ জানবার আগে সম্পত্তির নানা ধরণ এবং বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। বর্তমান এককে এই সমস্ত কিছুই যথাসম্ভব সংক্ষেপে বিবৃত হ'ল।

৭৭.৩ অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রয়োজনীয়তা

সমাজস্থ ব্যক্তিদের ভরণপোষণের জন্য প্রত্যেক সমাজেই সুনির্দিষ্ট নিয়মাবলী থাকে। এই ব্যবস্থা না থাকলে সমাজের অস্তিত্ব সঙ্কটাপন্ন হয়। প্রত্যেক সমাজ তার প্রয়োজন ও সামর্থ্য অনুযায়ী এই ব্যবস্থা প্রণয়ন করে। ভরণপোষণের জন্য সমাজের সদস্যদের নানারকম উৎপাদনশীল কাজকর্ম করতে হয়। ফলমূল আহরণ, পশুশিকার, কৃষিকাজ থেকে আরম্ভ করে বৃহদায়তন কারখানায় খাদ্যসামগ্রীর উৎপাদন প্রভৃতি সবকিছুই এই উৎপাদনশীল কাজকর্মের অন্তর্ভুক্ত। আদিমকাল থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত সব সময়েই মানুষ কোনও না কোনও ধরণের উৎপাদনশীল কাজকর্মে সামিল হয়েছে। একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে এইসব উৎপাদনশীল কাজকর্মের মধ্যে শ্রমবিভাগ রয়েছে। যেমন, অধিকাংশ সমাজে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে কাজের ভাগ থাকে। সাধারণতঃ ভারী কাজ পুরুষরা করে এবং অপেক্ষাকৃত হাল্কা কাজ মেয়েরা করে অথবা শিকার ও পশুপালনের কাজ পুরুষরা করে, অপরপক্ষে গৃহস্থালীর কাজ মেয়েরা করে থাকে।

উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতির সাথে তাল মিলিয়ে সমাজে নানাধরণের শ্রেণীর উদ্ভব হয় এবং এই শ্রেণীগুলির সঙ্গে শ্রমবিভাগ বিভিন্ন ধরণের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিভিন্নভাবে সম্পৃক্ত থাকে।

আবার কোনও কোনও দেশে, যেমন ভারতবর্ষে, পেশার সঙ্গে শ্রমবিভাগের এক ঘনিষ্ঠ যোগ দেখা যায়। সমাজস্থ লোকেরা বিভিন্ন পেশায় বিভক্ত হতে পারে। যেমন — কামার, কুমোর, কৃষক, তাঁতী ইত্যাদি। আবার একই কাজে নানারকম ভাগ করে বিভিন্ন লোককে এক একটি ভাগে নিয়োগ করা যেতে পারে। আধুনিক কলকারখানায় যেমন অনেক সূক্ষ্ম ভাগ নজরে পড়ে।

অর্থনীতিবিদ্‌গণ উৎপাদনের এই দিকটি নিয়ে নানারকম আলোচনা করেছেন। তাদের আলোচনার মুখ্য বিষয় হ'ল কীভাবে শ্রমবিভাজন প্রবর্তন করলে উৎপাদনের হার বৃদ্ধি পেতে পারে তা নির্ণয় করা। সমাজবিজ্ঞানীরা শ্রমবিভাগের বিভিন্ন সামাজিক দিক নিয়ে পর্যালোচনা করেন।

ভরণপোষণের ব্যবস্থার সঙ্গে সমাজের বণ্টন ব্যবস্থাও জড়িত। উৎপাদনের উপায় ও উৎপন্ন সামগ্রীসমূহ সমাজস্থ লোকেদের মধ্যে কীভাবে বণ্টিত হবে তা নিয়ে সমাজে সুনির্দিষ্ট নিয়ম থাকা উচিত। সেই কারণে প্রত্যেক সমাজেই সম্পত্তি ও স্বত্বাধিকার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নিয়মাবলী থাকে।

৭৭.৪ সম্পত্তি কাকে বলে?

বিভিন্ন অর্থনৈতিক কার্যকলাপের উপযোগের উপর স্বীয় অধিকার স্থাপনের মাধ্যমে ব্যক্তির মনে সম্পত্তির মালিকানা সম্বন্ধে ধারণা জন্মায়। অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিভিন্ন কার্যকলাপের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে সম্পত্তির বিকাশ।

সম্পত্তিকে যদি একটি সাধারণ কিন্তু ব্যাপক পরিসরে সংজ্ঞাবদ্ধ করতে চাওয়া হয়, তাহলে বলা যেতে পারে যে সম্পত্তি বলতে সেই বিষয় বা বস্তুকে বোঝায় যার উপযোগ আছে এবং সেই বিষয় বা বস্তুর উপর ব্যক্তির অধিকার সমাজ দ্বারা স্বীকৃত। অর্থাৎ যখন কোনও বিষয় বা বস্তুর উপর সমাজ স্বীকৃত নিরঙ্কুশ অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ব্যক্তি জীবিকা নির্বাহের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হয়, তখন তাকে সম্পত্তি হিসাবে গণ্য করা যায়।

ব্যক্তি তার সৃজনশীল ক্ষমতার মাধ্যমে অথবা উত্তরাধিকার সূত্রে কোনও কিছু অর্জন করে তার উপর নিজের অধিকার ও কর্তব্য প্রতিষ্ঠা করে থাকলে সেই অধিকার ও কর্ত্তব্যের আধারকে সম্পত্তি বলা হয়।

৭৭.৫ সম্পত্তির উপাদানসমূহ

সম্পত্তির সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে সম্পত্তির চারটি উপাদান দেখতে পাওয়া যায় —

ক) উপযোগ, খ) বস্তু বা বিষয়, গ) নিরঙ্কুশ মালিকানা ও ঘ) সামাজিক অনুমোদন বা স্বীকৃতি।

ক) **উপযোগ** — উপযোগ হল মানুষের অভাববোধ পরিতৃপ্ত করার জন্য দ্রব্যের গুণ বা ক্ষমতা। দ্রব্যটির গুণ বা ক্ষমতাই হল উপযোগ। যেমন — যে কলম দিয়ে লেখা হচ্ছে তা উপযোগ নয়, লেখাকে সহায়তা করার জন্য এর যা ক্ষমতা তা-ই উপযোগ। অতএব, উপযোগ একটি আপেক্ষিক এবং মানসিক ধারণা। কোনও দ্রব্য একজনের অভাব পরিতৃপ্ত করতে পারে, অপর একজনের হয়ত পারে না। আবার একই দ্রব্য দুই ব্যক্তির অভাব সমানভাবে পরিতৃপ্ত করতে পারে না। উপযোগ শব্দটির কোনও নৈতিক তাৎপর্য্য নেই। উপযোগ বিচারের একমাত্র মাপকাঠি হল ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষা। মানুষ সম্পত্তি বা বস্তু অর্জন করতে ভালবাসে। কারণ, সম্পত্তি বা বস্তুর সাহায্যে নানারকম প্রয়োজন চরিতার্থ করা সম্ভব হয়। সম্পত্তির প্রতি আকর্ষণ বা সম্পত্তি অর্জন করার আকাঙ্ক্ষা নানা কারণে উদ্ভূত হয়। যেমন — মৌল প্রয়োজনের তাগিদ, উদ্বেগহীন এবং অর্থবহ জীবনযাপন করার অনুকূল পার্থিব পরিবেশ সৃষ্টি করা, আত্মাভিমান ইত্যাদি।

খ) **বস্তু বা বিষয়** — সম্পত্তি বলতে কোনও বস্তু বা বিষয়ের কথা বোঝান হয়। অবশ্য সেইসব বস্তু বা বিষয়ের প্রয়োজন মেটানোর ক্ষমতা না থাকলে কেউই তাদের আকাঙ্ক্ষা করবে না। মানুষ প্রয়োজনের তাগিদে বস্তু বা বিষয়কে জীবন ধারণের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে। ব্যক্তির সাংস্কৃতিক জীবনের উৎকর্ষতায় বস্তু বা বিষয় হয়ে পড়ে সীমিত যোগানের ফসল এবং জীবিকার উপাদান। তখন বস্তু ও বিষয় অপরের প্রয়োজন মেটাবার জন্য সমাজে হয় স্বীকৃত।

বস্তু ও বিষয়-এর সঙ্গে উৎপাদন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। উৎপাদন বলতে কেবলমাত্র বস্তুগত দ্রব্য সৃষ্টিই বোঝায় না, সেবাও বোঝায়। বস্তুগত দ্রব্য হয় সাধারণ সামগ্রী এবং অবস্তুগত বিষয়কে সেবা হিসাবে গণ্য করা হয়।

যখন কোনও সামগ্রী প্রত্যক্ষভাবে আমাদের প্রয়োজন মেটায় তখন সেই সামগ্রীটি স্বভাবতই আমাদের নিকট বিশেষ মূল্যবান। আবার এমন অনেক সামগ্রী আছে যা প্রত্যক্ষভাবে আমাদের প্রয়োজন মেটায় না, কিন্তু দীর্ঘদিন যাবৎ সমাজে প্রচলিত মূল্যবোধের পরিপ্রেক্ষিতে তা আমাদের নিকট মূল্যবান বলে বিবেচিত হয়। যেমন — হীরা বা সোনা প্রত্যক্ষভাবে সাধারণ মানুষের কোনও প্রয়োজনই মেটাতে পারে না, অথচ দুষ্প্রাপ্য হওয়ার দরুণ এ সকল সামগ্রীর ভোগ-দখল প্রচলিত মূল্যবোধ অনুযায়ী সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে।

গ) **নিরঙ্কুশ মালিকানা** — সামাজিক জীবনের চাহিদা পূরণের জন্য কোনও বস্তু বা বিষয়কে সাংস্কৃতিক উপাদান হিসাবে তৈরি করার পরিপ্রেক্ষিতে তার উপর ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সৃজনশীল ক্ষমতার অধিকার বর্তায়। এই অধিকার অর্জনের মাধ্যমে মানুষ সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সমাজস্থ অপরাপর ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত থাকে। ব্যক্তি তার আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়নের মাধ্যমে এবং বস্তুগত ও অবস্তুগত সাংস্কৃতিক উৎকর্ষতার মাধ্যমে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

ঘ) **সামাজিক অনুমোদন বা স্বীকৃতি** — সামাজিক অনুমোদনের সাথে চাহিদা পূরণের ব্যাপারটি জড়িত। যখন কোন বস্তু বা বিষয় জীবিকা নির্বাহের উপায় হিসাবে তৈরি হয়, তখন তার সেই প্রয়োজনীয়তা থেকেই সে সামাজিক অনুমোদন লাভ করে। সমাজ কাঠামোর পরিবর্তনের সাথে সাথে চাহিদার যেমন পরিবর্তন ঘটে, তেমনি সামাজিক অনুমোদনের প্রশ্নটিও নতুনভাবে উত্থাপিত হতে পারে। গ্রীক সমাজে উৎপাদন কার্যে দাসদের শ্রম বিনিয়োগের স্বীকৃতির মাধ্যমে দাসত্ব প্রথার উদ্ভব ঘটেছিল। তখন 'দাস' ছিল সম্পত্তি। কিন্তু আজ তা অননুমোদিত। কারণ, একদিকে যেমন যন্ত্রশিল্পের বিকাশে দৈহিক শ্রমের চাহিদা কমেছে, অন্যদিকে মানবাধিকারের ও স্বাধীনতার চেতনায় দাসত্ব প্রথার বিলোপ ঘটেছে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে সমাজে অর্থনৈতিক কার্যপ্রক্রিয়ার এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। স্মরণাতীত কাল থেকে ব্যক্তির মনে সম্পত্তি অর্জনের প্রেরণা দেখা যায়। প্রতিটি যুগে মানুষের আহার, বস্ত্র, বাসস্থান প্রভৃতি সংগ্রহ করার জন্য যে সামগ্রীসমূহের সৃষ্টি হয়েছে তার অধিকার রক্ষার প্রয়াস চলাটা স্বাভাবিক। সেই কারণে সম্পত্তির বৃদ্ধি ও আহরণের উপায় ছিল প্রয়োজনের উপর নির্ভরশীল। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির প্রয়োজন বহুমাত্রিক হয়েছে। ফলে, সম্পত্তির উপযোগিতা ও অধিকার নানাভাবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

৭৭.৬ সম্পত্তির বৈশিষ্ট্য

কিংস্‌লে ডেভিস্ তাঁর *Human Society* বইতে নিম্নলিখিতভাবে সম্পত্তির বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করেছেন —

ক) হস্তান্তরযোগ্যতা — সম্পত্তির অধিকার হস্তান্তরযোগ্য। উত্তরাধিকার সূত্রে অথবা ক্রয়-বিক্রয়, বিনিময় ও দানের দ্বারা সম্পত্তির হস্তান্তর হতে পারে। আবার এমন সম্পত্তিও আছে যা আইনত বিক্রয় করা যায় না, কিন্তু উত্তরাধিকারসূত্রে বন্টন হতে পারে। সম্পত্তির অধিকারীর মৃত্যু হলে তার উত্তরাধিকারীরা সেই সম্পত্তি ভোগ ও বন্টন করতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে যেখানে সম্পত্তি গোষ্ঠীর অধিকারভুক্ত অথচ তার ব্যক্তিগত উপভোগ অনুমোদিত, সেখানে ব্যক্তিগত উপভোগ স্বীকৃত হলেও তা বিক্রয় করার অধিকার একমাত্র গোষ্ঠীরই থাকে। নাবালকের সম্পত্তি ও দেবোত্তর সম্পত্তি আইনগত অনুমোদন ছাড়া বিক্রয় করা যায় না। কতকগুলি নিতান্তই ব্যক্তিগত সম্পত্তি আছে যা হস্তান্তরযোগ্য নয়। যেমন — ব্যক্তির নিজস্ব গুণাবলী, প্রতিভা, কলাকৌশল, দক্ষতা, সৃজনশীল ক্ষমতা, ব্যবসায়ের সুনাম ইত্যাদি। এগুলির উপর অবৈধ হস্তক্ষেপ করে যদি কেউ কোন ব্যক্তির সুনাম অযথা নষ্ট করে, তাহলে সে আদালতের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারে।

খ) সম্পত্তির মালিকানা ও দখলের পার্থক্য — সম্পত্তির মালিকানার সঙ্গে সম্পত্তির ভোগদখলের পার্থক্য আছে। অর্থাৎ সম্পত্তির মালিকানা আছে বলেই যে সম্পত্তি স্বত্বাধিকারীর দখলে থাকবে বা ভোগ করবে তা নাও হতে পারে। সম্পত্তি অন্যের দ্বারা দখল হয়ে যেতে পারে বা চুরি, ডাকাতি হতে পারে। আবার সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী তার সম্পত্তি ঋণ হিসাবে অন্যকে দিতে পারেন, ভাড়া দিতে পারেন অথবা কেবলমাত্র ব্যবহারের অনুমতি দিতে পারেন।

গ) সম্পত্তি ক্ষমতার প্রতীক — সম্পত্তি অর্জনের মাধ্যমে ব্যক্তি সমাজে বিত্তশালী হতে পারে। আবার সম্পত্তি বিলুপ্তির মাধ্যমে ব্যক্তি বিত্তহীন হতে পারে। সম্পত্তির স্বত্বাধিকারের মাধ্যমে সমাজে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। সমাজে স্বাভাবিক কারণে বিত্তশালী লোক তার প্রভাব বিস্তার করে। বিত্তহীনরা এ প্রভাবের শিকারও হয়ে থাকে।

ঘ) সম্পত্তির বাহ্যিক ও গুণগত প্রকৃতি — সম্পত্তি অবস্তুগত হতে পারে যাকে অদৃশ্য বা মানসিক হিসাবে আখ্যায়িত করা যায়। আবার সম্পত্তি বস্তুগত হতে পারে যাকে পার্থিব বা বৈষয়িক বলা হয়। কোনও দ্রব্য বা গুণ তখনই সম্পত্তি হিসাবে পরিগণিত হয় যখন তার উপর ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর নিরঙ্কুশ অধিকার বোঝানো হয়। যেমন — শিল্পীর গুণগত প্রতিভা, বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কার বা যাদুকরের সম্মোহন ক্ষমতা ও কলাকৌশল ব্যক্তিগত সম্পত্তি। অপরপক্ষে জমি, গৃহ, মূল্যবান ধাতু বা রত্ন প্রভৃতি বস্তু গুণগত মান ও দুষ্প্রাপ্যতার কারণে সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হয়।

ঙ) সম্পত্তি সামাজিক প্রথাদ্বারা স্বীকৃত — সম্পত্তির বিনিময়, ক্রয়-বিক্রয়, গ্রহণযোগ্যতা, দান, উত্তরাধিকারসূত্রে অর্জনের ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির প্রয়োজন থাকে। সম্পত্তি সামাজিক অনুমোদন ব্যতীত অধিকারভুক্ত হতে পারে না।

চ) সম্পত্তির অধিকার ও নিয়ন্ত্রণ পৃথকীকরণ সম্ভব — সম্পত্তির মালিকানা ও পরিচালনার ভার একই জায়গায় নাও থাকতে পারে। আধুনিককালের বৃহদায়তন শিল্পসংস্থার যে পরিমাণ মূলধন প্রয়োজন তা অল্প কয়েকজন শিল্পপতির পক্ষে সরবরাহ করা সম্ভব নয়। এজন্য বাজারে শেয়ার বিক্রয় করে মূলধন যোগাড় করতে হয়। যাঁরা শেয়ার ক্রয় করেন তাঁরাই প্রকৃতপক্ষে শিল্পসংস্থার মালিক। কারণ তাঁরা ব্যবসায়ের লাভ-লোকসানের ঝুঁকি বহন করেন। হাজার হাজার শেয়ার ক্রেতাদের পক্ষে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা সম্ভব নয় বলে প্রতিষ্ঠানগুলি কিছু সংখ্যক যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে প্রতিষ্ঠানের পরিচালক হিসাবে নিয়োগ করে। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড অপর ব্যক্তি দ্বারা পরিচালনা করা যেতে পারে। তবে তা প্রকৃত মালিক বা আইনগত অনুমোদন সাপেক্ষে হওয়া সম্ভব।

ছ) সম্পত্তি চলমান — ব্যক্তির জীবনযাত্রার গতিশীলতার সাথে সাথে সম্পত্তির বৈচিত্র্য বেড়ে চলছে। ব্যক্তি নিজের প্রয়োজন ও কালক্রমের গতিধারায় সম্পত্তিকে নানাভাবে কাজে লাগায়।

৭৭.৭ সম্পত্তির প্রকারভেদ

মানবসমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে সম্পত্তির বিভিন্ন প্রকারভেদ দেখা যায়। যেমন —

ক) জমি—মানুষের শিকারী যুগ বা ফলমূল সংগ্রহের যুগ থেকে

খ) অস্থাবর সম্পত্তি

গ) মন্ত্রতন্ত্র ইত্যাদির উপর অধিকার

ঘ) দাস

ব্যক্তি বিভিন্ন প্রাকৃতিক অবস্থায় জীবিকা অর্জনের হাতিয়ার ও জীবনসম্পৃক্ত ধ্যানধারণা লাভ করে পার্থিব প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে এবং বিভিন্ন প্রকার বিষয় ও বস্তুকে উপযোগ হিসাবে গুরুত্ব আরোপ করে বিভিন্ন প্রকার সম্পত্তির ধারণা লাভ করেছে।

ব্যক্তির আদিম সম্পত্তি হল তার আহার্য বস্তু। এটাই ছিল তার একমাত্র প্রয়োজনীয় জিনিস। তখন ছিল মানুষের খাদ্য সংগ্রহের স্তর (Food gathering stage)।

জমি চাষ শুরু হওয়া থেকে মানুষ এ জ্ঞান লাভ করল যে পৃথিবীপৃষ্ঠ একটা বিরাট সম্পত্তির উৎস। তারপর প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তন হল কৃষি কাজের প্রবর্তন (Stage of agriculture)।

কৃষিকাজের সঙ্গে পশুপালন জড়িত ছিল। পশুপালনের (Pastoral) জন্য প্রয়োজন ছিল তৃণভূমি। এক তৃণভূমি শুকিয়ে গেলে নতুন তৃণভূমির সন্ধানে বেরোতে হত। শিকার ও পশুপালনের প্রাথমিক অবস্থায় মানুষকে তাই যাযাবর জীবন যাপন করতে হত। তখন জীবিকার সন্ধানে যে সব উপকরণ প্রয়োজন ছিল তাই তাদের সম্পত্তি বলে গণ্য হত। শিকারী জীবনে পশুপাখি ও পশুপাখির চামড়া, পালক, মাংস, দুধ ইত্যাদি ছিল সম্পদ। কৃষিকার্য আয়ত্ত করার পর জমিই হল সম্পত্তি।

যে অঞ্চলে কৃষিকাজ বা পশুপালন পদ্ধতি অসম্ভব, সে অঞ্চলে বাস করে এস্কিমোরা বা বিভিন্ন যাযাবর উপজাতি গোষ্ঠী। এস্কিমোদের সংস্কৃতির উপর পারিপার্শ্বিক জলবায়ু ও বাস্তুসংস্থানের প্রভাব পড়েছে। যে সামান্য কটি জীবজন্তু শিকার হিসাবে পাওয়া যায়, সেগুলোই তাদের জীবিকার সম্বল এবং তা থেকেই এস্কিমোরা হাতিয়ার ও পরিধেয় সংগ্রহ করে এবং তাই তাদের সম্পত্তি হিসাবে বিবেচ্য।

আদিবাসীদের জীবন ব্যবস্থায় তাদের নাম, প্রতীক, মন্ত্রতন্ত্র, যাদুবিদ্যা, ধর্মীয় গোপন রহস্য তাদের একান্ত নিজস্ব সম্পত্তি।

মানব জাতির সংস্কৃতি বিকাশে বিভিন্ন প্রকার হাতিয়ার উদ্ভাবনের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন প্রকার সম্পত্তির ধারণা ও প্রকারভেদ সৃষ্টি হয়েছে। সমাজ বিকাশের এক পর্যায়ে হাতিয়ার উদ্ভাবনের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন প্রকার সম্পত্তির ধারণা ও প্রকারভেদ সৃষ্টি হয়েছে। সমাজ বিকাশের এক পর্যায়ে হাতিয়ার প্রস্তুতকারী প্রাণী মানুষ নিজেই জীবন্ত সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হয়েছে। এ্যারিষ্টটল দাসকে জীবন্ত সম্পত্তি হিসাবে বলেছেন।

আধুনিক যান্ত্রিক যুগে অবশ্য ব্যক্তির ধ্যানধারণা, ধর্ম-দর্শন, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-কলকারখানা সভ্যতার গতিধারায় মূল্যায়িত হচ্ছে।

সমাজবিজ্ঞানী ও সামাজিক নৃবিজ্ঞানীগণ দেখিয়েছেন যে জমির মালিকানা আদি উৎপাদন ব্যবস্থায়, এমন কি, পশুপালন ও মৎস্য শিকারের পর্যায়ে নানা ধরণের মালিকানা দেখা যায়। যেমন —

ক) গোষ্ঠী বা দল মালিকানা

খ) পারিবারিক মালিকানা

গ) উচ্চবংশের পরিবারের মালিকানা

ঘ) সামন্তপ্রভুর মালিকানা

ঙ) দলপতির মালিকানা

চ) ব্যক্তিগত মালিকানা

উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে সম্পত্তির প্রকৃতি সামাজিক রীতিনীতি ও প্রথা দ্বারা নির্ধারিত হয়। সে জন্য সম্পত্তির প্রকারভেদ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে মালিকানা ও উত্তরাধিকার রীতি বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়। সমাজবিজ্ঞানী ও সামাজিক নৃবিজ্ঞাণীগণ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে মালিকানা ও উত্তরাধিকার, সম্পত্তির রকম, নমুনা বা প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। আবার সম্পত্তির প্রকৃতি নির্ভর করে বিয়ের রীতি, বংশানুক্রম পদ্ধতি, সমাজে গণতান্ত্রিক বা অভিজাততান্ত্রিক ব্যবস্থা, ধর্মীয় বা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর।

মার্ক্সীয় ধারণায় বলা হয় সম্পত্তির প্রকৃতি নিধারিত হয় উৎপাদন পদ্ধতির দ্বারা। মার্ক্স সেইজন্য আদিম সমাজে সম্পত্তির ব্যক্তি মালিকানার অস্তিত্ব নেই বলে উল্লেখ করেন। তাঁর মতে, আদিম গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজে গোষ্ঠী মালিকানা ছিল।

৭৭.৮ সম্পত্তির বিভিন্ন প্রকারের মালিকানা

সমাজে সাধারণত তিন প্রকার সম্পত্তি প্রচলিত।

ক) **সাধারণ সম্পত্তি বা এজমালী সম্পত্তি** — এ ব্যবস্থায় একাধিক লোকের অধিকার বর্তায় এবং সকলেই তাদের সম্পত্তি সমভাগে ভোগ করতে পারে। সমাজে প্রচলিত প্রথা দ্বারা নির্দিষ্ট স্থান বা এলাকা, গোষ্ঠী বা দল অথবা সম্প্রদায় সাধারণ সম্পত্তির উপর অধিকার স্থাপন করে।

খ) **সম্পত্তির যৌথ মালিকানা** — উত্তরাধিকার বা পারিবারিক সূত্রে অথবা যৌথ অংশীদার বা শেয়ারক্রয়ের মাধ্যমগুলো হচ্ছে যৌথ সম্পত্তি। যৌথ সংস্থার সম্পত্তির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন — এসব সংস্থার শেয়ার যারা ক্রয় করেছেন, তারাই সংস্থার মালিক। কিন্তু সংস্থার নামে আইন-স্বীকৃত স্বত্ত্ব থাকায় সংস্থার সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয় হয়।

সম্পত্তির অধিকার, তাদের সংখ্যা ও পরিচয় অনুসারে যৌথ সম্পত্তি বিভিন্ন রূপে দেখা যায়। যেমন —

ক) রক্ত-সম্পর্কীয় পরিজনের যৌথ মালিকানা,

খ) আইনবলে গঠিত কোন সরকারী বা বেসরকারী সংস্থার মালিকানা এবং

গ) স্থানীয় এলাকার ভিত্তিতে যৌথ মালিকানা।

গ) **সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা** — যে সকল বস্তু বা বিষয়ে ব্যক্তিগত ভোগ ও স্বত্ত্ব স্বীকৃত এবং ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে ক্রয়-বিক্রয় করতে পারে তাকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে গণ্য করা হয়। তবে ব্যক্তিকে সমাজ-নির্দিষ্ট আইন ও প্রথা অবশ্যই মেনে চলতে হবে।

সমাজবিজ্ঞানীগণ ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তির ভিতর পার্থক্য নির্ণয় করেছেন। ব্যক্তি বিশেষের সম্পত্তি বলতে ব্যক্তির একান্তভাবে ব্যবহারের উপযোগী দ্রব্যসামগ্রীকে বোঝায়। যেমন — জামা-কাপড়, জুতা, বই, কলম, চশমা, ব্যক্তির দক্ষতা, জ্ঞান, কলাকৌশল ইত্যাদি। ব্যক্তির নিজস্ব ভোগের সামগ্রীই হল ব্যক্তিগত সম্পত্তি। এছাড়া ব্যক্তির নিজস্ব প্রতিভা বা কর্মপ্রচেষ্টার সাথে যে সকল বিষয়বস্তু উপযোগ সৃষ্টি করে, যা অপর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং উত্তরাধিকার সূত্রেও লাভ করা সম্ভব নয়, তাকেই ব্যক্তি বিশেষের সম্পত্তি হিসাবে চিহ্নিত করা যায়।

৭৭.৯ সম্পত্তির মালিকানা সম্পর্কিত বিবর্তন তত্ত্ব

সম্পত্তির বিবর্তনের ইতিহাস মানব সমাজের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। সম্পত্তি ব্যবস্থার বিবর্তন সম্পর্কে বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী ও সামাজিক নৃবিজ্ঞানীদের বিভিন্ন মতাদর্শ দেখা যায়।

ক) **লুই হেনরী মর্গানের (Lewis Henry Morgan) মতবাদ** — মর্গান তাঁর *Ancient Society* বইতে সম্পত্তির ক্রমবিকাশের তিনটি মৌল ধারার বর্ণনা করেছেন —

প্রথমত, সম্পত্তি যখন যাবতীয় জ্ঞাতিবর্গের। দ্বিতীয়ত, সম্পত্তি যখন কেবল নিকট জ্ঞাতির। তৃতীয়ত, সম্পত্তি যখন কেবল ছেলেমেয়েদের অধিকারে থাকে।

এছাড়া আরও একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সম্পত্তি প্রথমে ছিল স্ত্রী ধারায়, পরে উত্তরাধিকার পরিবর্তিত হয় পুরুষ ধারায়। মর্গান আরও উল্লেখ করেন যে, সভ্যতা সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে সমাজে সম্পত্তির এত বিপুল ও বিভিন্ন ধারায় প্রকাশ ঘটেছে এবং তার ব্যবস্থাপক শ্রেণী এমন সব জাল ফেঁদেছে যে জনসাধারণ তাদের ছাড়া চলতেও পারে না। মানুষ নিজের সৃষ্টির সামনে নিজেই হিমসিম খেয়ে যায়। অবশ্য এমন সময় আসবে যখন মানুষের বুদ্ধিমত্তা আরও বৃদ্ধি পাবে এবং তারা এই সম্পত্তির অধিকার ও মালিকানার মধ্যে একটা সমন্বয় সৃষ্টি করবে। সমাজের স্বার্থ হল সবার উপরে। তাই ব্যক্তি ও সমাজের স্বার্থে একটা সমতা সৃষ্টি হবেই। শুধু সম্পত্তি গড়ে তোলা মানুষের জীবনের লক্ষ্য হতে পারে না। যদি তাই হয়, তবে অগ্রগতির ধারা ব্যাহত হবে। মর্গানের মতে, সমাজ হবে গণতান্ত্রিক, সমাজ হবে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ, সবার অধিকার হবে সমান এবং সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা থাকবে। এটাই হবে আগামী দিনের সমাজের চরিত্র। মানুষের জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা তাকে ক্রমশই সেদিকে ঠেলে দিচ্ছে। প্রাচীন যুগে যেমন ছিল সাম্য, স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃত্ব, তাই নতুন ও উচ্চতর আকারে পুনর্বার দেখা দেবে।

মর্গান সম্পত্তির অধিকার ও মালিকানার একটা সমন্বয় সৃষ্টির প্রয়াসে সমাজে ভ্রাতৃত্ববোধ, গণতান্ত্রিক সমাজ ও সার্বজনীন শিক্ষার মাধ্যমে সুষ্ঠু সমাজ প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত দিয়েছেন।

খ) এল. টি. হবহাউসের মতবাদ — হবহাউস সম্পত্তির মালিকানার উদ্ভবের তিনটি পর্যায়ের উল্লেখ করেন। তাঁর মতে, সকল সমাজেই কিছু সম্পত্তি ব্যক্তিবিশেষের ব্যবহার্য দ্রব্যাদি হিসাবে ছিল।

প্রথম পর্যায়ে সামাজিক পৃথকীকরণ এবং বৈষম্য খুব সামান্য ছিল। প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক সম্পত্তি যেমন — শিকার, ভূমি, পশুচারণ তৃণভূমি ইত্যাদি সমষ্টিগত সম্পত্তি বলে গণ্য হত।

দ্বিতীয় পর্যায়ে উন্নত চাষবাস করার পদ্ধতি ব্যবহৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অসমতা ও বৈষম্য দেখা দেয় এবং কালক্রমে তা সম্প্রদায়ের নিয়ন্ত্রণের বহির্ভূত হয়ে ব্যক্তি বা যৌথ পরিবার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে।

তৃতীয় পর্যায়ে সম্পত্তির বৈষম্য হ্রাস এবং সমাজ সম্পত্তির বৈষম্য দূরীকরণে সচেতন পদক্ষেপ গ্রহণে তৎপর হয়ে ওঠে যেন তা সম্প্রদায়ের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত থাকে।

হবহাউসের সম্পত্তি বিবর্তনের চিন্তাধারার সঙ্গে মার্কসীয় চিন্তাধারার সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

গ) **মার্ক্সীয় মতবাদ** — মার্ক্সীয় ব্যাখ্যায় আদিম সমাজে কোনও শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল না। অর্থাৎ প্রথম পর্যায়ে সম্পত্তির বৈষম্য ছিল না।

দ্বিতীয় পর্যায়ে সামাজিক বৈষম্য সৃষ্টির মাধ্যমে সম্পত্তির ভোগ বন্টনে অসমতা দেখা দেয়। অর্থাৎ শ্রেণীবিভক্ত সমাজ সৃষ্টির পর সম্পত্তির যৌথ ও ব্যক্তি মালিকানার উদ্ভব হয়। এ পর্যায়ে সম্পত্তি মুষ্টিমেয় পুঁজিপতির হাতে কুক্ষিগত হয়।

তৃতীয় পর্যায়ে শ্রেণীহীন, উন্নত সমাজে ব্যক্তিগত মালিকানা স্বত্ব বিলোপ এবং সমাজে সমভোগ সৃষ্টির প্রচেষ্টা গড়ে ওঠে।

ঘ) পি. ভিনোগ্রাডফের মতবাদ — ভিনোগ্রাডফ সম্পত্তি বিবর্তনের চারটি পর্যায়ের উল্লেখ করেছেন।

প্রথম পর্যায়ে সম্পত্তির সমষ্টিগত মালিকানার প্রচলন ছিল। এ পর্যায়ে জীবিকা পশুপালন ও শিকার নির্ভর ছিল।

দ্বিতীয় পর্যায়ে উন্নত চাষবাস করার পদ্ধতি প্রচলিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজে ব্যক্তিগত মালিকানা ও প্রভুত্বের দাবী গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

তৃতীয় পর্যায়ে ব্যক্তিগত সম্পত্তি আত্মসাতের প্রচেষ্টা ও ভূমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার উদ্ভব লক্ষ্য করা যায়।

চতুর্থ পর্যায়ে ব্যক্তিগত মালিকানার বিলুপ্তির নানা শর্তাবলীর আরোপ এবং সম্পত্তি মালিকানার বৈষম্যের অবসানকল্পে প্রয়াস চালানো হয়।

অনেক সামাজিক নৃবিজ্ঞানী গবেষণার মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে বিভিন্ন সমাজে মালিকানা উদ্ভব একই ধারায় হয়নি।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলতে পারা যায় যে, আদিম সমাজ শিকারী জীবন থেকে যত অগ্রসর হয়েছে, মানুষ ততই তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি বৃদ্ধি করেছে।

৭৭.১০ সারাংশ

সমাজে বসবাসকারী ব্যক্তিবর্গের ভরণপোষণের জন্য প্রত্যেক সামাজিক সদস্যের নানা ধরণের উৎপাদনধর্মী কাজে নিযুক্ত থাকতে হয়। উৎপাদনশীল কাজকর্মের সঙ্গে শ্রম বিভাজনের নিবিড় সম্পর্ক বর্তমান। উৎপাদন ব্যবস্থার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নানাধরণের শ্রেণীর উদ্ভব হয়। আবার, পেশার সঙ্গে শ্রমবিভাগের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্তমান। সমাজের বন্টন ব্যবস্থাও ভরণপোষণ ব্যবস্থার সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত।

সম্পত্তি ব্যবস্থা অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে বিবেচিত হয়। সম্পত্তির উপযোগ বর্তমান এবং এর ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা সমাজস্বীকৃত। অর্থাৎ, সম্পত্তির উপাদান বলতে উপযোগ, বস্তু অথবা বিষয়, নিরঙ্কুশ মালিকানা এবং সামাজিক অনুমোদনকে বোঝায়। হস্তান্তরযোগ্যতা, সম্পত্তির মালিকানা এবং ভোগদখলের পার্থক্য, ব্যক্তি ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ, বাহ্যিক এবং গুণগত প্রকৃতি, সামাজিক প্রথা দ্বারা স্বীকৃতি, অধিকার এবং নিয়ন্ত্রণের পৃথকীকরণের সম্ভাব্যতা, গতিশীলতা ইত্যাদির মাধ্যমে সম্পত্তির বৈশিষ্ট্যগুলি প্রতিফলিত হয়।

শিকারী অথবা ফলমূল সংগ্রহের সময় থেকে জমি এবং অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তির প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। আদিবাসী জীবনযাত্রায় বিভিন্ন প্রতীক, মন্ত্রতন্ত্র, যাদুবিদ্যা সম্পত্তি হিসাবে বিবেচিত হয়। এছাড়াও, সমাজবিকাশের এক বিশেষ পর্যায়ে হাতিয়ার প্রস্তুতকারী প্রাণী হিসাবে মানুষ সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হত। সম্পত্তির রকম, নমুনা এবং প্রকৃতির ওপর সম্পত্তির মালিকানা নির্ভরশীল। বিয়ের রীতি, ধর্মীয় বা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং গণতান্ত্রিক বা অভিজাততান্ত্রিক ব্যবস্থার ওপর সম্পত্তির প্রকৃতি নির্ভর করে। মার্ক্সীয় ধ্যানধারণায় সম্পত্তির প্রকৃতি নির্ধারিত হয় উৎপাদন পদ্ধতির দ্বারা। সাধারণ সম্পত্তি বা এজমালী সম্পত্তি, সম্পত্তির যৌথ মালিকানা, সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা — মূলত, এই তিন ধরণের মালিকানা সমাজে লক্ষ্য করা যায়।

মর্গান, হবহাউস, মার্ক্স এবং ভিনোগ্রাডফের মতবাদের মধ্য দিয়ে সম্পত্তির মালিকানা সম্পর্কিত বিবর্তন তত্ত্ব সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে ওঠে।

৭৭.১১ অনুশীলনী

১) নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ

ক) অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান কাকে বলে?

খ) কী কারণে অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানটিকে সামাজিক সম্পর্কের ভিত্তিস্বরূপ বলা যেতে পারে?

গ) সম্পত্তির বৈশিষ্ট্যগুলি নির্দেশ করুন।

ঘ) সম্পত্তির উপাদানগুলি কী কী?

ঙ) সম্পত্তিতে কয়প্রকারের মালিকানা দেখা যায়?

২) নীচের প্রশ্নগুলির বিশদ্ আলোচনা করুন ঃ

ক) সম্পত্তি কাকে বলে? ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিবর্তন সম্পর্কে আলোচনা করুন।

খ) সম্পত্তি বলতে কী বোঝেন? বিভিন্ন প্রকার সম্পত্তির বর্ণনা দিন।

৭৭.১২ গ্রন্থপঞ্জী

১) কর, পরিমলভূষণ ঃ *সমাজতত্ত্ব*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, 1995.

২) Bottomore, T. B. : *Sociology*, Unwin University Books, London, 1960.

৩) Davis, Kingsley : *Human Society*, The Macmillan Co., N.Y., 1961.

৪) MacIver & Page : *Society*, Macmillan & Co. Ltd, London, 1959.

একক ৭৮ □ পুঁজিবাদ — একটি প্রতিষ্ঠান

গঠন

৭৮.১ উদ্দেশ্য

৭৮.২ প্রস্তাবনা

৭৮.৩ সমাজ বিবর্তনের বিভিন্ন স্তর—পুঁজিবাদের উদ্ভব

৭৮.৩.১ আদিম সমাজ ও সম্পত্তির ধারণা

৭৮.৩.২ পশুচারণ সমাজ ও সম্পত্তির ধারণা

৭৮.৩.৩ কৃষিকেন্দ্রিক সমাজে সম্পত্তি ব্যবস্থা

৭৮.৩.৪ পুঁজিবাদ এবং পুঁজিবাদী অথবা ধনতান্ত্রিক সমাজ কাঠামো

৭৮.৩.৫ সমাজতান্ত্রিক এবং সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা

৭৮.৪ সারাংশ

৭৮.৫ অনুশীলনী

৭৮.৬ গ্রন্থপঞ্জী

৭৮.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিচার-বিশ্লেষণে সক্ষম হবেন ঃ —

- পুঁজিবাদের অর্থ,
- আদিম সমাজে সম্পত্তির ধারণা সম্পর্কিত আলোচনা,
- পশুচারণ সমাজে সম্পত্তি ব্যবস্থার স্বরূপ,
- দাস এবং সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় সম্পত্তিব্যবস্থার প্রকৃতি,
- ধনতান্ত্রিক অথবা পুঁজিবাদী সমাজে সম্পত্তি ব্যবস্থার ধাঁচ,
- সমাজতান্ত্রিক এবং সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থায় সম্পত্তির চরিত্র।

৭৮.২ প্রস্তাবনা

সম্পত্তি ব্যবস্থার প্রধান আধুনিক রূপটি হ'ল পুঁজিবাদী ব্যবস্থা। পুঁজিবাদ বলতে আমরা যে ব্যক্তিগত মালিকানাভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে বুঝি তার উদ্ভব হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর শিল্প বিপ্লবের প্রেক্ষাপটে। পুঁজিবাদী সম্পত্তি ব্যবস্থার উৎস অথবা ভিত্তিভূমি নিয়ে সমাজতান্ত্রিক মহলে যে আলোচনা এবং বিতর্ক চলে তার মূলে রয়েছে দুইজন বিশিষ্ট সমাজতান্ত্রিকের অবদান। এরা হলেন কার্ল মার্ক্স এবং ম্যাক্স ভেবার। মার্ক্সীয় ব্যাখ্যায় পুঁজিবাদের স্তরকে মানবসমাজের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার বিকাশে একটি বিশেষ স্তর হিসাবে গণ্য করা যায় যা

সমাজতান্ত্রিক স্তরের পূর্বগামী এবং Feudal অথবা সামন্ত ব্যবস্থার পরবর্তী স্তর হিসাবে চিহ্নিত। এই হিসাবে মার্ক্সীয় তত্ত্ব অনুযায়ী রেনেসাঁসের পর থেকে যেমন যেমন সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি ভাঙ্গতে আরম্ভ করেছে, সেই অনুযায়ী ঐসব ক্ষেত্রে আধুনিক পুঁজিবাদী অর্থনীতি তথা বুর্জোয়া আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটেছে। অন্যদিকে, পুঁজিবাদের উদ্ভবের বা উৎস সংক্রান্ত ভিন্ন ধরণের ব্যাখ্যা হাজির করেছেন অন্য এক জার্মান সমাজতাত্ত্বিক ম্যাক্স ভেবার। মার্ক্স কথিত অর্থনৈতিক বা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে অস্বীকার না করেও ভেবার যে বিশেষ বক্তব্য উপস্থাপিত করতে চাইলেন তা হ'ল পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় পশ্চিম ইউরোপেই কেন পুঁজিবাদের আগমন ঘটলো। ভেবার দেখিয়েছেন যে, জন ক্যালভিনের মতবাদের মতে, কিছু বিশিষ্ট প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মীয় চিন্তা-ভাবনা পশ্চিম ইউরোপে পুঁজিবাদের ভিত্তি হিসাবে গণ্য হতে পারে।

বর্তমান এককে এই বিষয়গুলি যথাসম্ভব বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে।

৭৮.৩ সমাজ বিবর্তনের বিভিন্ন স্তর—পুঁজিবাদের উদ্ভব

আধুনিক সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা শিল্পবিপ্লব ও পুঁজির বিনিয়োগের ফল। পাশাপাশি পুঁজিবাদের প্রতিস্পর্ধা হিসাবে কোথাও কোথাও সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও প্রচলিত রয়েছে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পুঁজির মালিকানা ব্যক্তির হাতে না থেকে সমাজ, বিশেষ করে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে থাকে। তবে পুঁজিবাদ ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার উদ্ভব কৃষিনির্ভর সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার অবসানের ফলেই হয়েছে।

কৃষিভিত্তিক সমাজের সঙ্গে শিল্পভিত্তিক সমাজের মূল পার্থক্য হল প্রথমটিতে উৎপাদনমূলক কাজকর্ম মনুষ্যশক্তির ও মনুষ্যেতর প্রাণীশক্তির সদ্ব্যবহারের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু শিল্পভিত্তিক সমাজে উৎপাদনের উপায় হিসাবে প্রাণীশক্তির পরিবর্তে কলকারখানা ও যন্ত্রশক্তির ব্যবহারের উপরে জোর দেওয়া হল। তার ফলে, উৎপাদিকা শক্তি বহুগুণ বেড়ে গেল। দ্বিতীয়ত, কৃষিভিত্তিক সমাজে ভূস্বামী ও ভূমিদাস প্রথার স্থায়ী বন্দোবস্তের বদলে দ্রুত পরিবর্তনশীল আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার উদ্ভব হল, যেখানে তত্ত্বগতভাবে অগণিত মানুষ বা শ্রমিক সামন্ততন্ত্রের নাগপাশ থেকে মুক্ত হল।

এ প্রসঙ্গে শিল্পব্যবস্থার ভিত্তিস্বরূপ শিল্পবিপ্লবের কথা উল্লেখ করতে হয়।

শিল্প বিপ্লব বলতে প্রধানত উৎপাদনকর্মে পদ্ধতিগত মৌলিক পরিবর্তনকে নির্দেশ করা হয়। বিশেষ উল্লেখ করতে হয় ফ্যাক্টরী পদ্ধতির (Factory system) কথা। একই স্থানে চার দেওয়ালের মধ্যে হাজার হাজার মানুষ একসঙ্গে শ্রম দান করে একটি পণ্যদ্রব্য বিপুল সংখ্যায় উৎপাদন করছে— এই ব্যাপারটাই তো বৈপ্লবিক। অষ্টাদশ শতকের আগে এ ধরনের ফ্যাক্টরী-ভিত্তিক উৎপাদনের কোন ধারণা ছিল না। এরূপ সম্ভবও ছিল না। নতুন যন্ত্র, কৌশলের উদ্ভাবন এবং প্রযুক্তির বিস্তার-এর পাশাপাশি এই পদ্ধতিগত বৈপ্লবিক পরিবর্তন শিল্পকর্মের গুরুত্বকে অনেকটা বাড়িয়ে দিল।

পুঁজিবাদ বা Capitalism-এর ধারণার সঙ্গে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সামাজিক পরিবর্তন ও বিবর্তনের একটা স্তরে নানা ধরণের পণ্য, বিলাস সামগ্রী ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রমশ একদল বণিক শ্রেণীর হস্তগত হয়ে পড়ে। মধ্যযুগের অবসানে ঐ বণিকশ্রেণীরই বংশধরগণ ধীরে ধীরে সমাজে পুঁজিপতিশ্রেণীতে

পরিণত হয় এবং সমাজে পুঁজিবাদী আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রসার। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় উৎপাদনের উপাদান কিছু সংখ্যক লোকের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকে। আপামর জনসাধারণ স্বভাবতই এই প্রকার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত।

পুঁজিবাদের ধারণা সম্পত্তির বিবর্তনের ধারণার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। আগেই বলা হয়েছে যে, পুঁজিবাদের ধারণার সঙ্গে সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত মালিকানার সম্পর্ক জড়িত। সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত মালিকানা সমাজবিজ্ঞানী ও সামাজিক নৃবিজ্ঞানীদের মতো মানব সভ্যতার আদিযুগ থেকেই ছিল। কিন্তু ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এই ব্যক্তিগত মালিকানা এক বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। বস্তুতপক্ষে, বিভিন্ন সময়ে সমাজ বিবর্তনের বিভিন্ন স্তরে আমরা সম্পত্তির ধারণা ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানার বিভিন্ন তাৎপর্য দেখতে পাই।

৭৮.৩.১ আদিম সমাজ ও সম্পত্তির ধারণা ঃ

আদিম সমাজে ফল মূল, আহার্য সংগ্রহ করাই ছিল মানুষের মৌল তাগিদ ও প্রয়োজন। আহারের অনুসন্ধানে মানুষ জোটবদ্ধ হয়ে ঘুরে বেড়াত এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায়। প্রকৃতির কাছ থেকে আহার্য সংগ্রহের মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সূচনা ঘটে। আহার্য সামগ্রী, যেমন — ফলমূল, শাকসবজি, পশুপাখি ইত্যাদি ছিল আদিম মানুষের একান্ত প্রয়োজন। এসকল খাদ্য জোগাড়ের জন্য তাদের অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে। যতদিন মানুষ সীমিত জ্ঞানের আওতায় থেকে খাদ্য উৎপাদন করতে সক্ষম হয়নি ততদিন সার্বিকভাবে সে ছিল প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। প্রকৃতির উপর সার্বিকভাবে নির্ভরশীল এই অবস্থাকে সমাজবিজ্ঞানী ও সামাজিক নৃবিজ্ঞানীগণ খাদ্য সংগ্রহ বা খাদ্য আহরক অর্থনীতি (food gathering economy) বলে আখ্যা দিয়েছেন। এ অবস্থায় সম্পত্তি বলতে প্রাকৃতিক সম্পদের ধারণাই প্রাধান্য পায়। জীবনোপযোগী যে কোনও প্রাকৃতিক বস্তু বা দ্রব্যাদি ছিল তাদের সম্পত্তি। সমষ্টিগতভাবে তা সংগৃহীত হতো এবং তা ব্যক্তির প্রয়োজন অনুযায়ী ভোগ করা হতো।

মার্ক্সীয় ধারণায় আদিম সমাজ ছিল গোষ্ঠীবদ্ধ সাম্যবাদী সমাজ। এই সমাজে কোনও শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল না এবং সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানাও ছিল না। এই ব্যবস্থায় সমষ্টিগত প্রচেষ্টায় যদি কোনও শিকার জুটত তাহলে সকলেই মিলে তা সমভাগে ভাগ করে আহার করত।

অমার্ক্সীয় ধারণায় আদিম সমাজের বিভিন্ন চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। সমাজের আদিম স্তরে মানুষ খাদ্য সংগ্রহের জন্য এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ঘুরে বেড়াত। ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা তারা ভাবতেই পারেনি। অপরপক্ষে, ব্যক্তিগত মালিকানা না থাকায় ধন-সম্পদ কুক্ষিগত করে শ্রেণীবিভেদ সৃষ্টির কোন সুযোগ হয়নি।

প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের এক পর্যায়ে কৃষিজীবী সমাজের প্রবর্ত্তন হয়। পৃথিবীর আদিম সমাজগুলোর মধ্যে কেউ কৃষিজীবী, কেউ পশুপালক, কেউ বা একাধারে কৃষিজীবী ও পশুপালক। যে অঞ্চলে পশুপালন বা কৃষিকাজ অসম্ভব, সে অঞ্চলের মানুষদের, যেমন—এস্কিমো বা অস্ট্রেলিয় উপজাতির পক্ষে, পশুপালন বা কৃষিকাজের সুবিধা ভোগ করা সম্ভব হত না। এতৎসত্ত্বেও বরফের দেশে বসবাসকারী এস্কিমো ও মধ্য অস্ট্রেলিয়ার মরুভূমিতে বসবাসকারী উপজাতিরা প্রকৃতির যৎসামান্য অবদানের বিচক্ষণ সদ্ব্যবহার করে বেঁচে আছে। পরিবেশগত

তারতম্যের ফলে মানুষের জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রেও তারতম্য ঘটেছে। সে কারণে নানাপ্রকার ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি এবং বিভিন্ন উপযোগী আহার্য ও বস্তুর উপর মানুষের নির্ভরশীলতা লক্ষ্য করা যায়। এর সাথে মানুষের সম্পত্তি সম্পর্কিত ধারণা ও মালিকানার স্পৃহা জড়িত।

আদিম অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য আলোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায় যে, তখন সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানার যে ধারণা ছিল তা নির্ভর করত তাদের ব্যবহৃত জিনিসের উপর। যেমন—তীর-ধনুক, পাথরের নির্মিত অস্ত্র, হাঁড়ি-কুড়ি ইত্যাদি। শ্রমবিভাগের তারতম্য অনুযায়ী এগুলো তাদের ছেলেমেয়েরা বা গোষ্ঠীভুক্ত অন্যান্য সকলে ব্যবহার করত। কিন্তু অপরপক্ষে সামাজিক নৃবিজ্ঞানীগণ দেখিয়েছেন যে, আদিম সমাজে সম্পত্তির মালিকানা ছিল গোষ্ঠীগত। যেমন— শিকারী জীবনে কেউ কোনও পশু শিকার করে একা ভোগ করত না। কেউ একা ভোগ করতে চাইলে সমাজ তাকে শাস্তি দিত।

তাছাড়া, যে এলাকা জুড়ে শিকারের স্থান নির্ধারিত ছিল, তা কেউ ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে দাবী করতে পারত না। এক্ষেত্রে বিচার করলে দেখা যায় যে, আদিম সমাজে সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা বলতে কিছুই ছিল না।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা আদিম সমাজে সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা ও যৌথ মালিকানা উভয়েরই কিছু কিছু ধারণা খুঁজে পাই।

অনেক সামাজিক নৃবিজ্ঞানীগণ দেখিয়েছেন যে মার্ক্সবাদীরা আদিম সাম্যবাদী সমাজ সম্পর্কে যে ধারণা দিয়েছেন তা সর্বক্ষেত্রে গ্রহণীয় নয়। আদিম সমাজে কোনও কোনও ক্ষেত্রে ব্যক্তি বিশেষের পারিবারিক, ব্যক্তিগত অথবা গোষ্ঠী মালিকানাভুক্ত সম্পত্তির হদিস পাওয়া যায়। যেমন— পরিবারের ব্যবহৃত অস্ত্র, হাঁড়ি-কুড়ি, পশুর চামড়া ও হাড় ইত্যাদি। মেয়েরাও শিকারীর নিজস্ব ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে স্বীকৃত ছিল। ফলে সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত মালিকানা নেই একথা সর্বক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয়। তাছাড়া, আদিম অধিবাসীদের আচার-অনুষ্ঠানের আলোচনা প্রসঙ্গে নৃবিজ্ঞানী লাউই (Robert, A. Lowic) দেখিয়েছেন যে, উৎপাদন ব্যবস্থার আদিম স্তরে অর্থাৎ পশু ও মৎস্য শিকার বা ফলমূল সংগ্রহের স্তরে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল না — একথা জোর করে বলা যায় না। দক্ষিণ আমেরিকার টরেস স্টেইট্স্ দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীরা উৎপাদন ব্যবস্থার আদিম স্তরে রয়েছে। লাউই বলেছেন যে এই দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদের মধ্যে ব্যক্তিগত মালিকানা যেমন বিরাজমান, প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জের অন্য কোথাও তা দেখা যায় না। সেখানকার কেবলমাত্র গ্রামের রাস্তাটিই জনসাধারণের এক্তিয়ারে। এছাড়া, প্রতিটি শিলা এমনকি খানাখন্দগুলিও ব্যক্তিগত মালিকানাধীন।

এই পরিপ্রেক্ষিতে একটি প্রশ্ন থেকেই যায় যে, সেই যুগের শিকারভূমি, পশুপালনের তৃণভূমি ও মৎস্য শিকারের জলাশয়গুলি কি ব্যক্তি মালিকানাধীন ছিল?

এল. টি. হবহাউস বলেন যে, ভূসম্পত্তি ও অন্যান্য অর্থনৈতিক সম্পত্তি এজমালী সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হতো এবং সম্পত্তি ভোগ করার উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ আরোপিত হতো। তিনি আরও বলেছেন যে, সব সমাজেই ব্যক্তিগত মালিকানা কিছু না কিছু ছিল ঠিকই, তবে তা একান্ত ব্যক্তিগত বলে মনে করা হত না।

এই আলোচনা থেকে আমরা দেখি যে, আদিম সমাজে কিছু জিনিসের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল আবার কোন কোনও ক্ষেত্রে যৌথ মালিকানাও ছিল। তবে এই যৌথ মালিকানা ও সাম্যবাদী মালিকানা সমতুল্য নয়।

৭৮.৩.২ পশুচারণ সমাজ ও সম্পাত্তর ধারণা ঃ

আদিম শিকারী জীবনে কোন কোন সময়ে শিকারীদের হাতে কিছু পশু জীবন্ত ধরা পড়ত। তখন আবশ্যকীয় খাদ্যের যোগান থাকলেও ওই পশুগুলোকে বেঁধে রাখা হত। যেদিন শিকার জুটত না সেদিন প্রয়োজনবোধে ধৃত পশুগুলোকে বধ করে খাদ্যের যোগাড় হত। খাদ্যের অভাব না হলে ওই পশুগুলোকে লালন-পালনের মাধ্যমে পোষ মানানো হত। আবার অনেক ক্ষেত্রে পশুগুলিও মানুষের আস্তানার আশেপাশে থেকে যায় শিকারীদের দেওয়া খাবারের আশায়। এভাবে বনের পশু মানুষের পোষ মেনেছে এবং এই পশুগুলোকে সম্পত্তি হিসাবে গণ্য করা হয়।

আদিম মানুষ দেখল যে কয়েকটি এরকম পশু মজুত রাখলে তাদের আর খাদ্যের অনিশ্চয়তা থাকে না। তখন তারা ঐ জাতীয় পশুদের বধ না করে প্রতিপালন করতে লাগল। তাতে দেখা গেল যে, সময়ে এরা বাচ্চা প্রসব করাতে পশুর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। উপরন্তু এদের দুগ্ধও ব্যবহার করা চলে। অবস্থা যখন এরূপ হল, তখন দলের সকলেই বের না হয়ে কেউ কেউ থাকতে লাগল পালিত পশুর তত্ত্বাবধানের জন্য।

আদিম মানুষ পশুপালনের মাধ্যমে নিজের খাদ্যের একটা ব্যবস্থা আয়ত্ত করে নেওয়ার পর পশুর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগল। গবাদি পশুর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে এমন অবস্থা দাঁড়াল যে, প্রতি বছর এদের দুধ ও মাংস খাওয়ার পরও এদের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে লাগল। এছাড়া, পশুর চামড়া ও পশম দ্বারা বস্ত্র ও তাঁবু তৈরি হতে লাগল। কিন্তু পশুর সংখ্যা ক্রমাগতই বৃদ্ধি পেয়ে যাওয়ায় সমস্যা হয়ে দাঁড়াল শত শত পশুর খাদ্য যোগানের। ফলে তারা তৃণভূমির সন্ধানে পশুরপাল নিয়ে এক আস্তানা ছেড়ে অন্য আস্তানায় যেতে বাধ্য হল। নতুন জায়গার তৃণভূমি নিঃশেষ হলে আবার অন্যত্র তৃণভূমির খোঁজে যেতে হত।

সমাজবিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানীদের ধারণা, এই যাযাবরদের জীবনেই সর্বপ্রথম ব্যক্তিগত মালিকানার ধারণা জন্মায় এবং এই অবস্থা থেকেই তা স্বীকৃত হতে থাকে। এই স্তরের সমাজ ব্যবস্থাতে বিনিময় ব্যবস্থার মাধ্যমেও ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রচলন ঘটে। অবশ্য বিনিময়ের মান সমবন্টনের বা সমমূল্যমানের উপর নির্ভরশীল ছিল না। প্রয়োজন পূরণের স্বার্থই ছিল বিনিময়ের মূল উদ্দেশ্য। এভাবে পশুকে সম্পদ হিসাবে গণ্য করে পশুচারণ সমাজে ব্যক্তিগত মালিকানার আবির্ভাব হয়। এর সাথে পশু ও বন্য জন্তুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তৈরি হাতিয়ারগুলোও ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হতে লাগল।

৭৮.৩.৩ কৃষিকেন্দ্রিক সমাজে সম্পত্তি ব্যবস্থা ঃ

যাযাবর জীবনে মানুষ কোথাও নির্দিষ্টভাবে থাকত না। সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই কৃষি ও পশুপালন চালু ছিল। কৃষির সঙ্গে ধাতুবিদ্যার সমন্বয়ের ফলে তারা ক্রমশ যাযাবর জীবন ত্যাগ করে। কৃষিতে ধাতুবিদ্যার সুষ্ঠু প্রয়োগের ফলে প্রতিটি সম্প্রদায়ে দু'দল লোকের উদ্ভব হয়েছিল — গ্রামবাসী একদল লোক কৃষিকাজ নিয়ে রইল, আর শহরবাসী একদল লোক এক একটি বিশেষ পেশায় নিয়োজিত হল। কৃষি এবং ধাতুবিদ্যা চালু হওয়ায় জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশ খাদ্য উৎপাদনের কাজ থেকে অব্যাহতি পেয়ে বিলাসদ্রব্য উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত হল। অর্থাৎ শিল্পকর্মী, কারিগর শ্রেণী গড়ে উঠতে লাগল। এদিকে পশুপালন সম্পর্কে জ্ঞানবৃদ্ধি হওয়ায় নবলব্ধ জ্ঞান প্রয়োগ করে পশুর বড় বড় পাল রাখা সম্ভব হল। পোষা জন্তুর সংখ্যাও স্বাভাবিক নিয়মে বৃদ্ধি পেল।

অচিরেই মালিকানার সূত্রপাত হল। কৃষি ভূস্বামী ও গবাদি পশুর মালিকের রূপে এবং কারিগরদের বহাল ও শোষণের মাধ্যমে ব্যক্তিগত মালিকানার সূত্রপাত হল। মার্ক্সবাদী তত্ত্ববিদ্‌দের মতে, সর্বপ্রথমে তথাকথিত পুরোহিত ও শাসক শ্রেণী প্রবল পরাক্রান্ত সামাজিক শ্রেণী হিসাবে তাদের সম্পত্তি ও সুযোগ-সুবিধা সংরক্ষণের উদ্দেশে আইন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে।

স্থায়ী পরিবেশে মানুষ যখন জীবিকার জন্য কৃষিকাজ আরম্ভ করল, তখন থেকেই ভূমিতে মালিকানার অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে 'ভূমি' সম্পত্তি হিসাবে পরিগণিত হল। প্রথমে সম্প্রদায়গত ও যৌথ এবং পরে ভূস্বামীর ব্যক্তিগত মালিকানার রূপ লাভ করল। কোন সম্প্রদায় কোনও একটি অঞ্চল জুড়ে বসবাস আরম্ভ করলে সেই স্থান সেই সম্প্রদায়ের অধীনে থাকত। এইভাবে ধীরে ধীরে মানব সমাজে ভূ-সম্পত্তির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃত হ'ল। এর পরে কৃষি যুগে শ্রম বিভাজন দেখা দিল। যারা ভূখণ্ড অধিকার করত, তারা সকলেই চাষ-আবাদ করতে পারত না। ফলে কৃষিকাজের জন্য শ্রমিক নিযুক্ত করতে হত। এভাবে কৃষিকাজে শ্রমের চাহিদা বেড়ে যাওয়ার ফলে বাড়তি শ্রম নিয়োগের প্রয়োজন দেখা দিল। কৃষি উৎপাদনে শ্রম নিয়োগের জন্য দাস প্রথার উদ্ভব ঘটল। সেকালে বিভিন্ন সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর মধ্যে ভূ-সম্পত্তি দখল নিয়ে যুদ্ধ বাধার ফলে যারা পরাজিত হতো তাদের এবং অধিকৃত অঞ্চলের লোকেদের দাস হিসাবে ব্যবহার করা হত। পরবর্তী পর্যায়ে এই দাসগণ দলপতির ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয়।

দাসদের যখন ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে ব্যবহার করা আরম্ভ হ'ল, তখন ভূ-সম্পত্তির মালিকগণ সমাজের অধিপতি হিসাবে উচ্চ আসন দখন করল। তারা তাদের সুবিধার্থে সম্পত্তির ব্যাপারে কতকগুলো রীতিনীতির প্রচলন করল। দাস ও সাধারণ গরীব কৃষকদের সাথে ভূমি মালিকানার দাবীতে ভূস্বামী এক নতুন চুক্তিতে আবদ্ধ হল। ফলে দেখা গেল সামন্ত প্রথা। এর ফলে সমাজে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সম্পত্তির গুরুত্ব দেখা গেল।

কৃষিযুগে অর্থনৈতিক কাঠামোকে কেন্দ্র করে দাস, সামন্ত ও ধনতন্ত্র — এই তিনটি সমাজ কাঠামো গড়ে উঠল।

৭৮.৩.৪ পুঁজিবাদ এবং পুঁজিবাদী অথবা ধনতান্ত্রিক সমাজ কাঠামো ঃ

কৃষি ভিত্তিক সমাজে প্রথমে দাস প্রথা ও পরে সামন্তপ্রথা যখন চরম আকার ধারণ করল, তখন সমাজে নানা শিল্পকলা গড়ে উঠল। সমাজে ব্যবসায়ীরা উৎপাদন ও ভোগ বন্টনের উপরে তাদের অধিকার স্থাপন করল। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর বিরাট ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যগুলো থেকেই ধনী শ্রেণীর মূলধন সঞ্চয় শুরু হয়। এ অবস্থা পুঁজিবাদের কেবলমাত্র শিশুকাল। মার্ক্সীয় অর্থনীতি শাস্ত্রেও সাম্রাজ্যবাদ বলতে পুঁজিবাদের অগ্রগতির একটা নির্দিষ্ট স্তরকেই বোঝান হয়েছে। একচেটিয়া পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদের সর্বোচ্চ এবং সর্বশেষ স্তর।

পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় সমগ্র অর্থনৈতিক কাঠামো ও সম্পত্তির ধরণ ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। উৎপাদন যন্ত্র, কলকারখানা, শিল্পপ্রতিষ্ঠান, উৎপাদিত দ্রব্যের মুনাফা—এসবই পুঁজিপতির অধিকারে থাকে। পুঁজিবাদী সমাজে মুনাফা অর্জনের মাধ্যমে সম্পত্তি অর্জন করার প্রয়াস চলে। সম্পত্তির মালিকানার উপর নির্ভর করে সমাজের মর্যাদা ও সমাজপতি হওয়ার লক্ষ্যে ক্ষমতা অর্জনের প্রয়াস।

পুঁজিবাদ তিনটি স্তরের মাধ্যমে বিকাশলাভ করেছে —

১) বাণিজ্যিক পুঁজিবাদ — বাণিজ্য প্রসারের সঙ্গে যুক্ত বণিক সম্প্রদায়ের একটি অংশ পুঁজিপতি হয়ে সমাজে তাদের প্রভাব বিস্তার করে। কাঁচামাল সরবরাহ ও পণ্যদ্রব্য বিপণনের জন্য পৃথিবীর নানা অঞ্চলে তাদের উপনিবেশ স্থাপনের প্রয়াস চলে। তখনকার অর্থের মান ছিল স্বর্ণ। স্বর্ণসঞ্চয়ের পরিমাণই জাতির সমৃদ্ধি ও ক্ষমতার পরিমাপক। বাণিজ্যিক পুঁজিবাদের নীতি হ'ল, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এমনভাবে পরিচালিত হবে যেন স্বর্ণের সঞ্চয় বৃদ্ধি পায় এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের লক্ষ্য হবে আমদানি হ্রাস ও রপ্তানি বৃদ্ধি। কেননা, রপ্তানির উদ্বৃত্ত মূল্য স্বর্ণের দ্বারা মেটাতে হয়।

২) শিল্পপুঁজিবাদ — শিল্পবিপ্লবের ফলে বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। বৃহদায়তন উৎপাদনের ফলে তা বহু লোকের ভোগ্য হয়েছে, জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে। যান্ত্রিক সভ্যতা মানুষকে বহুরূপ পণ্যের সাথে পরিচিত করিয়ে তার নতুন নতুন অভাব সৃষ্টি করে নব আবিষ্কারের প্রেরণা ও ক্ষেত্র সৃষ্টি করেছে। শ্রমিকেরা মুক্তভাবে তাদের শ্রমকে শিল্পের মাধ্যমে প্রয়োগ করে এবং উৎপাদন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে অধিক পণ্য উৎপাদনে সক্ষম হয়েছে। শিল্পভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হ'ল, সকল প্রকার সম্পত্তি ব্যক্তিগত মালিকানার অধীন। শিল্প-কলকারখানা, শ্রমিকের শ্রম ও শিল্পজাত পণ্য—সকল কিছুই এ সমাজ ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে বিবেচিত।

৩)পুঁজিবাদ — উৎপাদন ব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নতির উপর পুঁজিপতিরা ততটা গুরুত্ব আরোপ করেনি, যতটা তারা গুরুত্ব দিয়েছে একচেটিয়া মুনাফা অর্জনের উপর। এভাবেই সমাজে পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটে। পুঁজিবাদ বিকাশের ফলে ব্যক্তিগত মালিকানা চরম রূপ পরিগ্রহ করে।

আদিম সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা বলতে নিজের ব্যবহৃত দ্রব্যাদিকেই বোঝানো হত। মধ্যযুগে জমি, দাস ও ভূমিদাসকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে গণ্য করা হয়। আবার ধনতান্ত্রিক যুগে ব্যক্তিগত মালিকানা বলতে শিল্পোৎপাদিত পণ্য এবং শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মালিকানাকে বোঝানো হয়। তবে আধুনিককালে সম্পত্তির মালিকানার প্রকৃতি ও চরিত্রে বিপুল পরিবর্তন হয়েছে। বর্তমানে মুদ্রা বা টাকার উপর ভিত্তি করে অর্থনীতি গড়ে ওঠার ফলে ব্যক্তিগত মালিকানা সম্পর্কে লোকের চিরন্তন ধারণার পরিবর্তন হয়েছে।

পুঁজিবাদী সমাজে ব্যক্তিগত ভোগদখল আর সামাজিক উৎপাদনের মধ্যে ক্রমবর্ধমান দ্বন্দ্বে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। সেই কারণে মনে করা হয় যে, পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেই পুঁজিবাদের ধ্বংসের বীজ নিহিত। কেননা, ঐ ক্রমবর্ধমান দ্বন্দ্ব নিরসনের অন্তিম পথ হল পুঁজিবাদী আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার সামগ্রিক পরিবর্তন। মার্ক্সবাদীরা একে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথ বলে নির্দেশ করেছেন।

৭৮.৩.৫ সমাজতান্ত্রিক এবং সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা ঃ

ধনতন্ত্রের পরবর্তী স্তর সমাজতন্ত্র। সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কের মূলে রয়েছে উৎপাদনী উপায়গুলোর উপর ব্যক্তিগত মালিকানার বিলোপ ঘটিয়ে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা করা। সমাজতান্ত্রিক সমাজে সম্পত্তি দু'টি রূপে অবস্থান করে - ১) রাষ্ট্রীয় বা সরকারী এবং ২) সমবায়ী এবং যৌথ বা সমষ্টিগত কৃষি সম্পত্তি।

মার্ক্সবাদীদের মতে, সমাজতন্ত্রের পরবর্তী স্তর সাম্যবাদ। এই পর্যায়ে সামর্থ্য অনুযায়ী প্রত্যেকে কাজ করবে এবং প্রত্যেকে তার প্রয়োজন অনুযায়ী সুযোগ-সুবিধা পাবে।* এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, সমাজের উচ্চতর স্তরে জনগণকে আর শ্রমবিভাগের দাস থাকতে হয় না। মানুষ তখন মাত্র জীবিকা অর্জনের জন্য কাজ করবে না, করবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে শ্রম কর্মকে জীবনের প্রধানতম অনুপ্রেরণা হিসাবে জেনে।

৭৮.৪ সারাংশ

শিল্পবিপ্লব এবং পুঁজি বিনিয়োগের পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে আধুনিক সমাজের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ড বিশেষভাবে পরিচালিত হয়। সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অবসানের ফলে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে। সামন্ততান্ত্রিক কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির পরিবর্তে পুঁজিবাদী শিল্পভিত্তিক অর্থনীতির গোড়াপত্তন হয়েছে।

আদিম সমাজ ব্যবস্থা দিল মূলত খাদ্য সংগ্রহ অথবা খাদ্য আহরণনির্ভর। প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল মানুষের কাছে সম্পত্তি ছিল প্রাকৃতিক সম্পদেরই নামান্তর যা জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে অত্যন্ত অপরিহার্য। কার্ল মার্ক্সের মতে, আদিম সমাজ ব্যবস্থায় সম্পত্তির কোনো ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল না, ছিল না কোনো শ্রেণীর অস্তিত্ব। সমাজ ছিল সাম্যবাদী। তবে আদিম সমাজে ব্যক্তিগত মালিকানা প্রসঙ্গে মার্ক্সীয় ব্যাখ্যার সমালোচনা করে সামাজিক নৃবিজ্ঞানীরা সম্পত্তির গোষ্ঠীগত মালিকানার কথা বলেছেন।

পশুচারণ সমাজে খাদ্যের যথাযথ যোগানের জন্য বিভিন্ন পশু প্রতিপালনের ব্যবস্থা হয় এবং এই পশুগুলিই ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে বিবেচিত হতে থাকে। কিন্তু, পশুর সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় এই সমাজে বসবাসকারী মানুষদের যাযাবরকেন্দ্রিক জীবনযাত্রার ওপর নির্ভরশীল হতে হয়। কারণ, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত পশুদের খাদ্যের যোগান দেওয়ার অসুবিধা দেখা দেয়। এই সমাজ থেকেই প্রকৃত অর্থে ব্যক্তিগত মালিকানার ধারণা জন্মায় এবং বিনিময় ব্যবস্থার মাধ্যমে তা আরোও বলশালী হয়।

কৃষিভিত্তিক সমাজে জীবিকার প্রয়োজনে কৃষিকাজের সূত্রপাত ঘটায় ভূমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ভূমি সম্পত্তি হিসাবে বিবেচিত হয়। কৃষিকাজের জন্য শ্রমের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় দাস ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটে।

পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানার যথেষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। উৎপাদন যন্ত্র, শিল্পপ্রতিষ্ঠান, কলকারখানা, উৎপাদিত দ্রব্যের মুনাফা ইত্যাদি পুঁজিপতিদের অধিকারভুক্ত। মুনাফা অর্জনের মাধ্যমে সম্পত্তি অর্জনের প্রচেষ্টা এই সমাজব্যবস্থায় পরিলক্ষিত হয়। বাণিজ্যিক পুঁজিবাদ, শিল্প পুঁজিবাদ এবং পুঁজিবাদ— এই তিনটি স্তরে মধ্যে দিয়ে সামগ্রিকভাবে পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটে।

সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় উৎপাদনী উপায়গুলির উপর ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান ঘটিয়ে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্যদিকে, সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে। এই ধরণের সমাজব্যবস্থায় মানুষকে শ্রমবিভাজনের অধীন থাকতে হবে না।

* (From each according to his ability to each according to his need).

৭৮.৫ অনুশীলনী

১) নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষেপে উত্তর দিন ঃ

(ক) আদিম সমাজে সম্পত্তির ধারণা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

(খ) সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা বলতে কী বোঝানো হয়?

(গ) সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থার প্রকৃতি পর্যালোচনা করুন।

(ঘ) পশুচারণ সমাজে কীভাবে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণার সূত্রপাত ঘটে?

২) নীচের প্রশ্নগুলির বিশদ্ পর্যালোচনা করুন ঃ

ক) কৃষিভিত্তিক সমাজে কীভাবে ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানার ধারণা স্বীকৃতি লাভ করে?

খ) ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় সম্পত্তির প্রকৃতি বিষয়ে আলোচনা করুন।

৭৮.৬ গ্রন্থপঞ্জী

১) কর, পরিমলভূষণ ঃ সমাজতত্ত্ব, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ১৯৯৫।

২) Bottomore, T. B : Sociology, 1969.

৩) Davis, Kingsley : *Human Society*, The Macmillan Co., N. Y., 1961.

একক ৭৯ □ সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পারস্পরিক সম্পর্ক-সংক্রান্ত কার্ল মার্ক্স এবং ম্যাক্স ভেবারের মতবাদ

গঠন

৭৯১ উদ্দেশ্য

৭৯.২ প্রস্তাবনা

৭৯.৩ কার্ল মার্ক্স

৭৯.৪ ম্যাক্স ভেবার

৭৯.৫ সারাংশ

৭৯.৬ অনুশীলনী

৭৯.৭ গ্রন্থপঞ্জী

৭৯.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি বিচার-বিশ্লেষণ করতে পারবেন ঃ

- কার্ল মার্ক্স নির্দেশিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও সমাজের সম্পর্ক,
- ম্যাক্স ভেবার নির্দেশিত প্রোটেস্টান্ট ধর্ম ও ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রসার।

৭৯.২ প্রস্তাবনা

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্দেশে কার্ল মার্ক্স এবং মাক্স ভেবারের মতবাদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কার্ল মার্ক্স দেখিয়েছেন যে আধুনিক সমাজে শ্রমবিভাগ ব্যতিরেকে কোনও কাজ করা সম্ভব নয়। ধনতান্ত্রিক সমাজে উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রমবিভাগ কী সামাজিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং তার থেকে কীভাবে সামাজিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়, তা কার্ল মার্ক্সের এই আলোচনা থেকে জানা যায়। অপরপক্ষে, ম্যাক্স ভেবার দেখিয়েছেন যে, একটি বিশেষ ধরণের ধর্ম কীভাবে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রসারে সহায়তা করেছে।

৭৯.৩ কার্ল মার্ক্স

মার্ক্সের মতে, সম্পত্তিতে স্বত্বাধিকার এবং উৎপাদনে শ্রমবিভাগের প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে নানাধরণের শ্রেণী বিভাগের উদ্ভব হয়। দেখা যায়, শ্রমবিভাগ সমাজে ক্রমশ কতকগুলি পরস্পর বিরোধী শ্রেণীর সৃষ্টি করে চলেছে। যেমন — যাঁরা কায়িক পরিশ্রম না করে জীবিকা অর্জন করেন এবং যাঁরা কায়িক পরিশ্রম করে জীবিকা

অর্জন করেন। আবার যাঁরা মূলধন সরবরাহ করে উৎপাদনের কাজে সহায়তা করেন এবং যাঁরা শ্রমিক হিসাবে উৎপাদন কাজে নিযুক্ত থাকেন তাঁরা দুটি পৃথক শ্রেণীতে বিভক্ত — মালিক এবং শ্রমিক।

এই মালিক এবং শ্রমিকের পরস্পর বিরোধমূলক সম্পর্ক সমাজে নানারূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। একধরণের প্রতিক্রিয়া হল বিচ্ছিন্নতাবোধ বা 'a feeling of alienation'। মার্ক্স বলেছেন যে, প্রধানত দুটি কারণে সমাজে বিচ্ছিন্নতা বোধ লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, শ্রমিককে বাধ্যতামূলক কাজ করতে হয়। সে স্বেচ্ছায় কাজ নির্বাচন করে না। কাজে যোগ দেওয়াও তার ইচ্ছাধীন নয়। প্রত্যক্ষভাবে কাজ তার উপলক্ষ মাত্র — work is a means to an end। অন্যান্য প্রয়োজন চরিতার্থ করতে হয় বলেই তাকে বাধ্য হয়ে কাজ করতে হয়। সুতরাং কাজে সে আনন্দ পায় না এবং কাজ তার সৃজনীশক্তিরও বিকাশ ঘটায় না। শারীরিক ক্লান্তি ও হীনমন্যতা এই অবস্থায় অবশ্যম্ভাবী। অনেক সময় কাজ করার বাধ্যবাধকতা না থাকলে শ্রমিক কাজকে এড়িয়েও চলে। আবার দেখা যায় যে, কাজে থাকাকালীন সময়ে সে যেমন অসহায় বোধ করে, সেরকমভাবে অবসর সময়ে সে তার স্বাভাবিকসত্তা ফিরে পায়।

দ্বিতীয়তঃ, কাজের প্রতি তার বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি হওয়ার আর একটি কারণ হল যে, শ্রমিক যে কাজে নিযুক্ত সেই কাজকে সে নিজের বলে ভাবতে পারে না। সে অপরের নির্দেশে কাজ করতে বাধ্য হয়। সুতরাং, কর্মরত অবস্থায় সে নিজের সত্তা হারিয়ে সম্পূর্ণভাবে অপরের অধীন হয়ে পড়ে। বিচ্ছিন্নতাবোধের গভীরতা বৃদ্ধি পায় আরও একটি কারণে। তা হ'ল শ্রমিকের তরফে যন্ত্রের দাসত্ব। বৃহদায়তন শিল্পগুলিতে শ্রমিকগণ উত্তরোত্তর যন্ত্রের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। যন্ত্রের অবস্থা অনুযায়ী শ্রমিককে কাজ করতে হয়। শ্রমিক যন্ত্রাংশে পরিণত হয়। অথচ যন্ত্র হ'ল অতীতের শ্রমের ফসল। তাই বলা যায় ধনতন্ত্রে অতীত শ্রম (বা যন্ত্র) তথা মৃত শ্রম (Dead Labour) বর্তমান বা জীবন্ত শ্রম (Living Labour) এর উপর আধিপত্য বিস্তার করে। পরিণতিতে বিচ্ছিন্নতাবোধের প্রসার ঘটে। শ্রমজীবীর ব্যক্তিসত্তার চূড়ান্ত অবমূল্যায়ন ঘটে।

মার্ক্সের মতে, ধনতন্ত্রী বুর্জোয়া বা মূলধনের মালিকের সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর সম্পর্ক আসলে বিরোধের সম্পর্ক, শোষক ও শোষিতের সম্পর্ক। শ্রমিকই মার্ক্সের মতে, আসল উৎপাদক। অথচ এই শ্রমিক শ্রেণীর হাতে উৎপাদনের উপাদানের মালিকানা থাকে না বলে তার শ্রম থেকে যে অতিরিক্ত উপার্জন (Surplus value) হয়, তার উপর শ্রমিকের কোনও অধিকার থাকে না। বুর্জোয়া শ্রেণী ও ভূস্বামীদেরই থাকে অতিরিক্ত উপার্জনের উপর অধিকার। অতিরিক্ত উপার্জন হ'ল উদ্বৃত্ত মূল্যের (surplus value) ফসল। শ্রমজীবী প্রতিদিন যে পণ্যমূল্য তৈরী করে তার সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র তাকে মজুরি হিসাবে দেওয়া হয়। তার শ্রমমূল্যের বড় অংশটাই মালিক আত্মসাৎ করে। সেটাই উদ্বৃত্ত মূল্য এবং সেটাই মালিকের পুঁজির ভিত্তি। মার্ক্স দেখিয়েছেন, অতীতের শ্রমিক শোষণের ফলশ্রুতি হিসাবে বর্তমান মূলধনের সৃষ্টি হয়েছে। সেই কারণে তিনি মূলধনকে প্রাণহীন শ্রম (dead labour) বলে অভিহিত করেছেন। সুতরাং শোষণের উপর ভিত্তি করে ধনতান্ত্রিক কাঠামো গড়ে উঠেছে।

এই অবস্থায় শ্রেণীদ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবী বলে মার্ক্স মনে করেন। তবে শোষিত হচ্ছে বলেই শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে শ্রেণী চেতনা গড়ে উঠবে না। মজুরি বৃদ্ধি বা অন্যান্য দাবী-দাওয়াকে কেন্দ্র করে শিল্প-শ্রমিকগণ যখন আন্দোলন করেন, তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের আন্দোলন সঙ্কীর্ণ অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। নিজেদের দাবি-দাওয়া আংশিকভাবে পূরণ হলেই আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে। এই সচেতনাকে শ্রেণী সচেতনতা বলা

যায় না। উৎপাদন ব্যবস্থায় একইভাবে শোষিত হয় বলে মার্ক্স তাদের 'Class-in-itself' বলে অভিহিত করেছেন। শ্রেণী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে শোষণের অবসান ঘটানোর কোনো প্রচেষ্টাই এই শ্রেণীর মধ্যে থাকে না।

মার্ক্সের মতে, শ্রেণীসচেতনতা না গড়ে ওঠা পর্যন্ত শ্রমিকগণ যথার্থ শ্রেণী বা 'Class-for-itself' বলে পরিগণিত হয় না। তাঁর মতে, শিল্পোৎপাদনে মূলধনের প্রয়োগ উত্তরোত্তর বেড়ে যাওয়ার দরুণ ধনতন্ত্রী বুর্জোয়াদের সংখ্যা ক্রমশ কমতে থাকবে এবং শ্রমিক শ্রেণীর সংখ্যা বাড়বে। যাদের মূলধন অপেক্ষাকৃত কম থাকবে, যেমন — ছোট, মাঝারি ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, দোকানদার (যাদের মার্ক্স পাতি বুর্জোয়া আখ্যা দিয়েছেন) তারা নীচু শ্রেণীতে স্থান পাবে। তাছাড়া অসম বন্টনের জন্য নীচু শ্রেণীর আর্থিক দুর্দশা চরমে উঠবে। এই অবস্থায় শ্রেণীসচেতনতা বৃদ্ধি পাবে। বিচ্ছিন্ন প্রয়াসে শ্রেণী শোষণ বন্ধ করা যাবে না—এই বোধ শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে আস্তে আস্তে গড়ে উঠবে। এই কাজে কমিউনিষ্ট পার্টির ভূমিকার কথা মার্কস বিশেষভাবে বলেছেন। কমিউনিষ্ট ম্যানিফেষ্টোতে মার্ক্স বলেছেন যে, শ্রমিক শ্রেণীকে শ্রেণী সচেতন করে তুলতে হলে কমিউনিষ্ট পার্টিকে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।

ধনতন্ত্রের বিকাশধারা সম্পর্কে মার্ক্স যে ধরণের সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন বাস্তবে তা কার্যকর হয়নি। শিল্পোন্নত দেশগুলিতে শ্রমিক শ্রেণীর অর্থনৈতিক অবস্থা নিদারুণ হওয়ার পরিবর্তে আগের থেকে অনেক উন্নত হয়েছে। এর ফলে শিল্পোন্নত পাশ্চাত্য দেশগুলিতে শ্রমিক শ্রেণী ধনতান্ত্রিক কাঠামো ভেঙ্গে দেওয়ার উদ্দেশ্যে কোনও বিপ্লবাত্মক অভিযানে সামিল হবে বলে মনে হচ্ছে না। মার্ক্সের সমালোচকগণ অনেক আগেই এই সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছিলেন। অন্যদিকে, ভারতবর্ষের মত অনগ্রসর দেশগুলিতে অর্থনৈতিক কাঠামো অপেক্ষাকৃত নিশ্চল হওয়ায় শ্রমিকদের অসন্তোষ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাদের দাবি পূরণ করা সহজসাধ্য নয়। অবশ্য বর্তমান যুগে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যার এত অভাবনীয় উন্নতি হয়েছে যে, এই সব অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশেও কালক্রমে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করে, শ্রমিকদের অসন্তোষ নিয়ন্ত্রণ করে, বৈপ্লবিক আন্দোলন অপ্রয়োজনীয় করে দেওয়া যেতে পারে।

৭৯.৪ ম্যাক্স ভেবার

ম্যাক্স ভেবারের মতে, ধর্ম বা ধর্মীয় দর্শন অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপকে প্রভাবিত করতে পারে। ভেবার লক্ষ্য করেছিলেন যে প্রোটেষ্টান্ট ধর্মাবলম্বীরাই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তার করছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ইংল্যান্ড, ওয়েলস্ ও স্কটল্যান্ডের মোট জনসংখ্যার মাত্র ৭ শতাংশ ছিল প্রোটেষ্টান্ট ধর্মাবলম্বী, কিন্তু সারা গ্রেট ব্রিটেনে অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে যত ব্যবসায়ী ব্যবসায়ে নব আবিষ্কৃত পদ্ধতি গ্রহণ করেন, তাদের মধ্যে অর্ধেকই ছিলেন প্রোটেষ্টান্ট ধর্মাবলম্বী। ১৯০৫ সালে ভেবার তাঁর 'Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism' বইতে দেখাতে চেষ্টা করেন যে ধর্মীয় নীতিবোধ কীভাবে ধনতন্ত্রের আবির্ভাবে সহায়তা করেছিল। তাঁর মতে, প্রোটেষ্টান্ট ধর্মমত ব্যক্তির যোগ্যতাকে স্বীকৃতি দিয়েছিল, পার্থিব বৃত্তিকে নৈতিক মর্যাদা দান করেছিল, সৎ পরিশ্রমকে সম্মান জানিয়েছিল এবং পরিশ্রম ভিত্তিক অর্থ উপার্জনকে নিষ্পাপ কর্তব্যকর্ম বলে ঘোষণা করেছিল। এর ফলে যেমন ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের পক্ষে জোরালো সমর্থন সৃষ্টি হয়, তেমনি পরবর্তীকালে শক্তিশালী ব্যক্তিদের উদ্যোগে গঠিত পুঁজিবাদী অর্থনীতির ভিত্তি রচিত হয়।

ভেবার প্রোটেস্টান্ট ধর্মের মধ্যে, বিশেষ করে ক্যালভিনের মতবাদের ব্যবহারিক নীতিগুলি বিশ্লেষণ করে যে দেখিয়েছেন সেগুলি কীভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীতে পশ্চিম ইউরোপে ধনতন্ত্রের বিকাশে সহায়ক হয়েছিল।

প্রথমত, ক্যালভিনিয় মতবাদ অনুযায়ী, যে কোন ব্যক্তি পার্থিব জগতের ব্যাপারে মনোনিবেশ করতে পারে। তাতে ধর্মীয় অনুশাসনগত কোন বাধা থাকতে পারে না। এই নীতিবোধ ব্যক্তির মধ্যে বিজ্ঞানসম্মত ও যুক্তিবাদী মানসিকতার উন্মেষ ঘটাবে।

দ্বিতীয়ত, প্রোটেস্টান্ট নীতিবোধ অনুযায়ী কর্মই ধর্ম। কর্ম একটি পুণ্য বিশেষ। অতএব প্রোটেস্টান্ট মতাবলম্বীরা উৎপাদনমূলক কর্মের জন্য পরিশ্রম করা উচিত বলে মনে করেন। এই পরিশ্রম, প্রোটেস্টান্টদের মতে, ঈশ্বর উপাসনার সমতুল্য।

তৃতীয়ত, প্রোটেস্টান্ট নীতিবোধ অনুযায়ী, ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের জন্য ছুটি ভোগ করা অপ্রয়োজনীয়। তাঁদের কাছে কর্মই ধর্ম। অতএব কলকারখানা এবং ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলি সপ্তাহের সাতদিনই খোলা থাকতে পারে যার মাধ্যমে সর্বাধিক কর্ম ও শ্রমদান এবং তার ভিত্তিতে মুনাফা অর্জন সম্ভব।

চতুর্থত, ক্যালভিনিয় তত্ত্ব অনুযায়ী ব্যক্তির জীবনের সবকিছুই পূর্বনির্ধারিত হয়ে আছে। অথচ এই বিষয়ে ব্যক্তি কিছু আগে থেকে জানতে পারে না। সেই কারণে ব্যক্তি সর্বদাই এক অস্থিরতায় ভোগে — কীভাবে সে ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করতে পারে। ক্যালভিনিয় মতবাদ বলে, কতকগুলি বাহ্যিক চিহ্নের মাধ্যমে ব্যক্তি বুঝতে পারবে সে ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করেছে কি না। এই বাহ্যিক চিহ্নের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল পার্থিব সাফল্য। প্রত্যেক ব্যক্তিই চেষ্টা করে একটি বৃত্তি নির্বাচন করে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে তাতে সাফল্য লাভ করতে। এই কঠোর পরিশ্রম লাভজনক কর্ম ও ধনসঞ্চয়ের সূচনা করে। আর ঐ ধনসঞ্চয় পুঁজি সৃষ্টিতে তথা পুঁজিবাদ এর আগমনের সূচনা করে।

পঞ্চমত, ক্যালভিনিয় তত্ত্বে ঋণের উপর সুদগ্রহণের ব্যাপারকে কোনও নিন্দাসূচক ব্যাপার বলে মনে করা হয় না। ক্যালভিন নিজে ঋণের উপর সুদগ্রহণের ব্যাপারে আধ্যাত্মিক অনুমোদন দিয়েছিলেন। এর ফলে বিভিন্ন ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠল, মূলধন সঞ্চিত হতে থাকল, বিভিন্ন অর্থনৈতিক উদ্যোগে পুঁজির বিনিয়োগ হতে থাকল এবং অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বৃদ্ধি পেল।

ষষ্ঠত, প্রোটেস্টান্ট ধর্মমত অনুযায়ী, প্রত্যেক ব্যক্তির নিজেরই বাইবেল পড়তে পারা উচিত, তার পুরোহিতের ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করা উচিত নয়। সেই কারণে প্রোটেস্টান্ট ধর্মমত সাক্ষরতা ও শিক্ষাবিস্তারে প্রেরণা জোগাল। এর ফলে সাধারণ শিক্ষাবিস্তার এবং বিশেষীকৃত শিক্ষার উন্নতি দুইই সম্ভব হ'ল।

সপ্তমত, প্রোটেস্টান্ট ধর্মে মদ্যপানের উপর নিষেধ আরোপিত। এর ফলে অর্থের অপব্যয় রোধ করা হল এবং নতুন উদ্যোগে বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সঞ্চয় সহজ হ'ল।

অষ্টমত, প্রোটেস্টান্ট ধর্ম সঞ্চিত অর্থ পার্থিব সুখে ব্যয় করতে নিষেধ করল। ফলে সঞ্চিত অর্থ অর্থনৈতিক উদ্যোগের জন্য প্রয়োজনীয় পুঁজির কাজ করতে লাগল। এর ফলে ধনতন্ত্রের অভ্যুদয় ত্বরান্বিত হল।

ভেবার ইউরোপে পুঁজিবাদের উত্থানের পিছনে ভৌগোলিক উপাদান, সামরিক প্রয়োজন, বিলাসদ্রব্যের চাহিদা, কয়লা ও লোহার প্রতুলতা, অংশীদারী কারবারের উদ্ভব, শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও তৎকালীন যুদ্ধবিগ্রহের প্রভাব —

এসব কিছুই স্বীকার করে নিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর মতে, শুধু এগুলিই ধনতন্ত্রের উদ্ভব ঘটায়নি। ধনতন্ত্রের উদ্ভব ঘটিয়েছিল যুক্তিবাদী স্থায়ী উদ্যোগ, যুক্তিবাদী হিসাব রক্ষণ ব্যবস্থা, যুক্তিবাদী প্রযুক্তি এবং যুক্তিবাদী আইন। এর সাথে আবার যুক্তিবাদী উদ্যম, সাধারণভাবে জীবনযাপন প্রণালীর যুক্তিসম্মতকরণ এবং একটি যুক্তিবাদঅনুসারী অর্থনৈতিক নীতিবোধ প্রয়োজনীয় পরিপূরক হিসাবে কাজ করেছিল। ভেবারের মতে, এই যুক্তি গ্রাহ্য উপাদানগুলি যা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার উদ্ভবে সহায়তা করেছিল, তা প্রধানত প্রোটেষ্টান্ট ধর্মের নীতিবোধগুলির উপরই নির্ভরশীল ছিল।

৭৯.৫ সারাংশ

সমাজ এবং অর্থনীতির পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে কার্ল মার্ক্স এবং ম্যাক্স ভেবারের মতামত বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে।

মার্ক্সের মতে, উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রম বিভাগের প্রবর্তন এবং সম্পত্তির অধিকারের ফলশ্রুতি হিসাবে সমাজে বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মালিক এবং শ্রমিক — এই দুই শ্রেণী বিভাজন। মালিক এবং শ্রমিক সম্পর্কের বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া হিসাবে বিচ্ছিন্নতাবোধের সৃষ্টি হয়। মূলত, বাধ্যতামূলকভাবে শ্রমদান, অপরের অধীনে থেকে শ্রমশক্তি প্রয়োগ, যন্ত্রের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীলতা ইত্যাদি শ্রমিকের মনে বিচ্ছিন্নতাবোধ সৃষ্টি করে। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় বুর্জোয়ারা মালিক, তারাই শোষক। অন্যদিকে, শ্রমিকরা শোষিত, শ্রমিকরা উৎপাদনের উপাদানের মালিকানা বঞ্চিত বলে শ্রম থেকে অতিরিক্ত উপার্জনের উপর তাদের কোনো অধিকার থাকে না। মার্ক্স মনে করেন যে, অতীতে শ্রমিক শোষণের ফলশ্রুতি হিসাবে বর্তমান মূলধনের সৃষ্টি হওয়ায় মূলধন হ'ল প্রাণহীন শ্রম। শ্রমিকরা প্রথম অবস্থায় শ্রেণীসচেতনতাবোধহীন থাকে। শোষণের স্বরূপ, যথার্থ উপলব্ধি করার মাধ্যমে প্রকৃত অর্থে তাদের মধ্যে শ্রেণীসচেতনতাবোধ গড়ে উঠবে। এই বোধ সৃষ্টিতে কমিউনিষ্ট পার্টির অবদান অস্বীকার করা যাবে না। ধনতন্ত্রের বিকাশধারা সম্পর্কে মার্ক্সের চিন্তাধারা অনেকক্ষেত্রে বাস্তবজীবনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে উঠতে পারেনি। মার্ক্স বুর্জোয়াদের অত্যাচার এবং শোষণের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর সর্বাত্মক বিপ্লবের অনিবার্যতার কথা বললেও পাশ্চাত্যের শিল্পোন্নত দেশগুলিতে এমনকি ভারতবর্ষের মতো অনগ্রসর দেশেও বিপ্লবের সম্ভাবনা সুদূরপরাহত হতে পারে।

ম্যাক্স ভেবার অর্থনৈতিক ক্রিয়াকার্যের উপর ধর্মের প্রভাব সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তাঁর মতে, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি স্বাভাবিক স্পৃহা প্রোটেষ্টান্ট মতাবলম্বীদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। ধর্মীয় নীতিবোধ ধনতন্ত্রের আবির্ভাব এবং বিকাশকে ত্বরান্বিত করেছিল। প্রোটেষ্টান্ট ধর্মমত একদিকে যেমন ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদী চিন্তা- চেতনার পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল, তেমনই অন্যদিকে পুঁজিবাদী অর্থনীতির ভিত্তিকে সুগঠিত করেছিল। প্রোটেস্টান্ট ধর্মমত বিশেষত, ক্যালভিনিয় মতবাদ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞানসম্মত এবং যুক্তিবাদী মানসিকতা গড়ে তোলে, কর্মকে ভগবান সাধনার সমার্থক বলে মনে করে, মুনাফা অর্জনের দিকে গুরুত্ব দেয়, পার্থিব সাফল্যের প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরে, সুদগ্রহণের বিষয়কে ধনাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখে, বিশেষীকৃত শিক্ষার উন্নয়নের কথা বলে এবং অর্থের অপব্যয় রোধের জন্য সোচ্চার হয়। ভেবারের মতে, প্রোটেষ্টান্ট ধর্মের নীতিবোধের উপর ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার উদ্ভবে সহায়তাকারী বিবিধ যুক্তিগ্রাহ্য উপাদানসমূহ বিশেষভাবে নির্ভরশীল।

৭৯.৬ অনুশীলনী

১) নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ

ক) অতিরিক্ত উপার্জন বা উদ্বৃত্ত মূল্য কাকে বলে?

খ) 'ক্লাস-ইন-ইটসেল্‌ফ' - কাকে বলে? 'ক্লাস-ফর-ইটসেল্‌ফ' এর সঙ্গে তার পার্থক্য নির্ণয় করুন।

গ) কীভাবে 'ক্লাস-ইন-ইটসেল্‌ফ' থেকে 'ক্লাস-ফর-ইটসেলফে' যাওয়া যায়?

ঘ) সমাজতান্ত্রিক সাম্যবাদী সমাজের বৈশিষ্ট্য গুলি নির্দেশ করুন।

ঙ) ক্যালভিনিয় নীতিগুলি নির্দেশ করুন।

২) নীচের প্রশ্নগুলির বিশদ্ আলোচনা করুন ঃ

ক) মার্ক্সের ধারণা অনুযায়ী ধনতান্ত্রিক সমাজে সম্পত্তির স্বত্বাধিকার এর প্রকৃতি নিরূপণ করুন।

খ) ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় বিভিন্ন পরস্পর বিরোধী গোষ্ঠীর সম্পর্ক কী রকম হয় তা দেখান।

গ) মার্ক্সীয় তত্ত্ব অনুযায়ী পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা কীভাবে সমাজতান্ত্রিক সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থায় উন্নীত হয় তা আলোচনা করুন।

ঘ) মার্ক্স ভেবারকে অনুসরণ করে ধর্ম ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে একটি প্রবন্ধ রচনা করুন।

৭৯.৭ গ্রন্থপঞ্জী

১) কর, পরিমলভূষণ ঃ সমাজতত্ত্ব, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৯৫।

২) Bottomore, T. B.: **Sociology,** A guide to problems & Literature, G. A. U Ltd., 1969.

৩) Davis, Kingsley : **Human Society,** The Macmillan Co., N.Y., 1961.

৪) MacIver & Page : **Society,** Macmillan & Co. Ltd., London, 1959.

৫) Tumin, M. M.: **Social Stratification, The Forms & Functions of Inequality**: Prentice Hall of India Pvt. Ltd., N. Delhi, 1969.

একক ৮০ □ মানবসমাজে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সমূহের বিবর্তন — রাষ্ট্রের উদ্ভব

গঠন

৮০.০ উদ্দেশ্য

৮০.১ প্রস্তাবনা

৮০.২ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্র

৮০.৩ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের বিবর্তন

৮০.৩.১ কৌমগোষ্ঠী সমাজ

৮০.৩.২ উপজাতীয় সমাজ

৮০.৩.৩ দলপতি চালিত সমাজ

৮০.৩.৪ রাষ্ট্রীয় সমাজ

৮০.৪ রাষ্ট্রের উদ্ভব

৮০.৫ সারাংশ

৮০.৬ অনুশীলনী

৮০.৭ গ্রন্থপঞ্জী

৮০.০ উদ্দেশ্য

এই এককে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সমূহের বিবর্তন এবং সেই বিবর্তন প্রক্রিয়ায় আধুনিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে রাষ্ট্রের উদ্ভব নিয়ে আলোচনা হবে। এককটি পঠন-পাঠনের মধ্য দিয়ে আমরা যে বিষয়গুলি জানতে পারব তা হল—

- রাষ্ট্রপূর্ব রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রকৃতি.
- রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের বিবর্তন প্রক্রিয়া.
- কৌম. উপজাতীয় ও দলপতি চালিত সমাজে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রকৃতি.
- রাষ্ট্রের উদ্ভবের সম্ভাব্য কারণসমূহ.
- রাষ্ট্রের উদ্ভবে কৃষির ভূমিকা।

৮০.১ প্রস্তাবনা

মানব সভ্যতার বিকাশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বহু সহস্র বছর আগে মানব প্রজাতির অস্তিত্ব লক্ষ করা গেলেও রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছে অনেক পরে প্রাচীন ব্যাবিলনীয়, মেসোপটেমিয়া বা সিন্ধু সভ্যতার কালে। পরবর্তী পর্যায়ে রাষ্ট্রব্যবস্থার অস্তিত্ব লক্ষ করি খ্রিস্টপূর্ব ৫০০ শতকে প্রাচীন গ্রিসে। এ সময় বা এর কিছু আগে থেকেই ভারতে প্রাচীন সাহিত্যে রাষ্ট্রব্যবস্থার উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু সমাজ বিকাশের ধারা সব জায়গায় একইভাবে ঘটেনি। এখনও অনেক জনগোষ্ঠী রয়েছে যাদের মধ্যে রাষ্ট্রব্যবস্থার অস্তিত্ব বা প্রভাব খুবই কম। যেমন, রাজনৈতিকভাবে আন্দামানের জারোয়া জনগোষ্ঠী ভারতের নাগরিক ; কিন্তু উক্ত জনগোষ্ঠীর মধ্যে রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রভাব খুবই কম। সুতরাং বলা যায়, রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে উঠেছে সমাজ বিকাশের এক নির্দিষ্ট পর্বে। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়, রাষ্ট্রশাসিত জনগোষ্ঠীর পূর্বে যে সমস্ত জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব ছিল তাদের মধ্যে অন্য কোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থা ছিল কিনা। যদি ধরে নেওয়া যায় মানুষের মধ্যে বিরোধ-মীমাংসা বা সমাজ-শৃঙ্খলার জন্য কোনো না কোনো বাধ্যবাধকতা বা কর্তৃত্বের প্রয়োজন তবে প্রশ্ন উঠবে এই প্রাক-রাষ্ট্রপর্বে কর্তৃত্ব প্রয়োগের ধরন কীরকম ছিল এবং সেই কর্তৃত্বের অধিকারীই বা কে ? এই সমস্ত প্রশ্ন নিয়ে আলোচনায় এগিয়ে এসেছেন সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বিশেষজ্ঞগণ। বর্তমান এককে আমরা মানব সমাজে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের বিবর্তনের ধারা এবং আধুনিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে রাষ্ট্রের উদ্ভবের বিষয় নিয়ে আলোচনা করব।

৮০.২ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্র

অধিকাংশ সমাজবিজ্ঞানী সমাজবিকাশের প্রতিটি পর্বেই (তা প্রাক্-রাষ্ট্রীয় বা রাষ্ট্রীয় পর্ব যাই হোক না কেন) ব্যক্তির আচরণ নিয়ন্ত্রণকারী কতকগুলি বিধিনিষেধ ও এই বিধিনিষেধ-এর প্রয়োগকারী কোনো ব্যক্তি/সংস্থার অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিয়েছেন। সমাজজীবনের সঙ্গে রাজনীতি ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ ; নতুবা ব্যক্তির পক্ষে কোনোরকম সমাজজীবন যাপন সম্ভবপর নয়। বলাবাহুল্য, রাজনৈতিক ব্যবস্থা বলতে সংকীর্ণ অর্থে শুধুমাত্র রাষ্ট্রকেই বোঝায় না। কারণ, প্রাক্-রাষ্ট্রপর্বে বিভিন্ন বিধিনিষেধ প্রয়োগকারী রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং সুশৃঙ্খল সম্পর্ক বজায় রাখাতে সক্ষম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব ছিল। এখানে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বলতে কী বুঝায় সে সম্পর্কে একটা ধারণা করে নেওয়া ভালো। ম্যাক্স ওয়েবার (Max Weber)-কে অনুসরণ করে র‍্যাডক্লিফ ব্রাউন (Radcliffe Brown) রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বলতে বুঝিয়েছেন সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে যার লক্ষ্য হল বলপ্রয়োগের মাধ্যমে কোনো নির্দিষ্ট ভৌগোলিক কাঠামোয় সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা। এ ধরনের সংজ্ঞায় আমরা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের তিনটি লক্ষণ খুঁজে পাই— (১) রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য হল সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা করা। (২) এই শৃঙ্খলা রক্ষার উপায়/মাধ্যম হল বলপ্রয়োগ এবং এই বলপ্রয়োগের অধিকারী কোনো

সংগঠিত বাহিনী বা ব্যবস্থাপনা। (৩) রাজনৈতিক সংগঠনের সীমানা/এলাকা হল কোনো নির্দিষ্ট ভূখণ্ড। কিন্তু রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের এ ধরনের সংজ্ঞা প্রদানের ক্ষেত্রে আমাদের বর্তমান রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের ধারণা অতিমাত্রায় সক্রিয় থাকায় প্রাক-রাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের আলোচনায় বেশ কিছু সমস্যা দেখা দেয়। যেমন, অধিকাংশ প্রাক-রাষ্ট্রীয় সমাজকাঠামোতে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের কোনো বিশেষীকরণ বা বিধিবদ্ধ সাংগঠনিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই সমাজ-শৃঙ্খলা রক্ষা করা হত। সুতরাং এরকম সমাজ কাঠামোয় [যেমন কৌম সমাজ (Bard Society), উপজাতি সমাজ (Tribal Society)] সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলিই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের তথা সমাজ-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব নিত। এ কারণে এধরনের সমাজ-কাঠামোয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের অনুসন্ধান করতে গিয়ে সামাজিক প্রতিষ্ঠানেরই রাজনৈতিক দিকগুলি (Political aspect of social institution) সন্ধান করা দরকার। দ্বিতীয়ত, বলপ্রয়োগের সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনাও উক্ত সমাজ-কাঠামোতে লক্ষ করা যায় না। এগুলি গড়ে উঠেছে সমাজ-বিকাশের প্রাথমিক স্তরে নয়— পরবর্তী স্তরে যখন রাজনৈতিক বিষয়টির বিশেষীকরণ ঘটে গেছে। নির্দিষ্ট সমাজের অন্তর্গত পুরুষজন, নীতিজ্ঞ, ধর্মীয় বা তুকতাক জানা লোকজন, দক্ষ শিকারী, বিশেষ পরিবার/গোষ্ঠীর সদস্য প্রভৃতি ব্যক্তিদের মধ্যে সেই রাজনৈতিক ক্ষমতা ছড়িয়ে ছিল। তৃতীয়ত, বর্তমান রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের আলোচনায় নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হলেও আদিম সমাজ-কাঠামোয় বিশেষত ভ্রাম্যমাণ সমাজগোষ্ঠীর মধ্যে নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকার কোনো সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। জীবিকার তাগিদে তাদের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটে বেড়াতে হত। অবশ্য এটা নির্ভর করত কোন অঞ্চলে, কী ধরনের শিকার পাওয়া যায় এবং তা কতদিন জনগোষ্ঠীর জীবনধারণের সহায়ক হবে তার উপর। উদাহরণস্বরূপ মৎস্যশিকারের উপর যে জনগোষ্ঠী নির্ভরশীল সেই জনগোষ্ঠী তুলনামূলকভাবে স্থায়ী জনসমাজ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। অবশ্য রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের উদ্ভবে কারণ/উদ্দেশ্য/অস্তিত্বের সময়সীমা সম্পর্কে তাত্ত্বিকগণ একমত পোষণ করেন না। যেমন, উদারনীতিবাদী বা মার্কসবাদী তাত্ত্বিকগণ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন; যদিও উদারনীতিবাদী তাত্ত্বিকদের মতে, এই ধরনের প্রতিষ্ঠান ছিল অপরিহার্য এবং মঙ্গলজনক (ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা অবশ্য একে 'মন্দের ভালো' বলে মনে করেন)। বিপরীতদিকে কার্ল মার্কস এই ধরনের সংগঠনকে ব্যক্তি অধিকার ও স্বাতন্ত্র্যের বিচ্ছিন্নরূপ বলে মনে করেন। কারণ, এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের উদ্ভবের পিছনে ছিল বৈষম্যমূলক সমাজকে বৈধকরণের এক প্রয়াস।

৮০.৩ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের বিবর্তন

নৃতাত্ত্বিকগণ কোনো সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থা, ক্ষমতা প্রয়োগের ধরন, ব্যক্তি-কর্তৃত্বের সম্পর্ক প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের বিবর্তনের চারটি পর্যায়ের উল্লেখ করেন। যথা— (১) কৌমগোষ্ঠী সমাজ (Band Society); (২) উপজাতিগোষ্ঠী সমাজ (Tribal Society); (৩) দলপতি

শাসিত সমাজ (Chiefdom Society) এবং (৪) রাষ্ট্রীয় সমাজ (State Society)। আমরা উক্ত চার ধরনের সমাজের রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রভৃতি বিশ্লেষণ করব।

৮০.৩.১ কৌমগোষ্ঠী সমাজ ঃ

কৌমগোষ্ঠী সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এর সদস্যসংখ্যা অত্যন্ত কম এবং এটা মূলত যাযাবর গোষ্ঠী। এই ক্ষুদ্র গোষ্ঠীই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের একমাত্র একক হিসাবে কাজ পরিচালনা করে। শিকারি অথবা খাদ্য সংগ্রাহক গোষ্ঠীর মধ্যে এ ধরনের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান লক্ষ করা যায়। অধিকাংশ নৃতাত্ত্বিকগণই মনে করেন যে কৃষিব্যবস্থা উদ্ভবের আগে অর্থাৎ আনুমানিক দশ হাজার বছর আগে প্রায় প্রতিটি সমাজই ছিল কৌমগোষ্ঠী সমাজ। ব্যতিক্রম যে ছিল না তা নয়। যেমন, যে সমস্ত সংগ্রাহক গোষ্ঠী বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর প্রান্তিক গোষ্ঠী (Marginal Group) হিসাবে বসবাস করত সেই সমস্ত সংগ্রাহক গোষ্ঠীকে বৃহত্তর গোষ্ঠীর রাজনৈতিক সংগঠনের দ্বারা কমবেশি প্রভাবিত হতে হত। একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য সেই সমস্ত গোষ্ঠীগুলির ক্ষেত্রে যা এখনও পর্যন্ত সংগ্রাহক গোষ্ঠী হিসাবে টিকে রয়েছে।

কৌমগোষ্ঠীগুলি শুধুমাত্র তার আয়তনেই ক্ষুদ্র নয়; জনসংখ্যা এবং জনঘনত্বের দিক থেকেও স্বল্প। জুলিয়ান স্টিয়ার্ড (Julian Steward) হিসাব করে দেখিয়েছেন, এই সমস্ত কৌমগোষ্ঠীগুলির জনঘনত্ব প্রতি পাঁচ বর্গমাইলে একজন থেকে প্রতি পঞ্চাশ বর্গমাইলে একজন মানুষ। মর্টন ফ্রাইড (Morton H. Fried) প্রদত্ত পরিসংখ্যানে দেখা যায় আমাজন নদীর অববাহিকায় গুয়াকি (Guayaki) কৌমগোষ্ঠীর সদস্যসংখ্যা কম বেশি ২০ জন মাত্র; সাময় উপদ্বীপে সেমাং (Semang) কৌমগোষ্ঠীর সদস্যসংখ্যা কমবেশি ৫০ জন; দক্ষিণ আমেরিকার তেহুলচে (Tehuelche) কৌমগোষ্ঠীর সদস্যসংখ্যা ৪০০ থেকে ৫০০ পর্যন্ত এবং সম্ভবত এটাই সবচেয়ে বেশি সদস্য বিশিষ্ট কৌমগোষ্ঠী। অবশ্য এই সংখ্যা সারা বছর ধরে একই রকম থাকে না। যেমন, বছরের কোনো নির্দিষ্ট সময়ে বা স্থানে খাদ্যের যোগানের হ্রাস বা বৃদ্ধি ঘটলে এই গোষ্ঠীগুলিকে হয় উপগোষ্ঠীতে বিভক্ত করতে নতুবা সংবদ্ধ হতে বাধ্য হয়। উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যায় এস্কিমো (Eskimo) গোষ্ঠীকে, যারা শীতের সময়ে খাদ্যের স্বল্পতা হেতু ছোট ছোট গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। আবার গরমের সময়ে খাদ্য সংগ্রহ যেহেতু সহজলভ্য হয়ে পড়ে সেহেতু এ সময় সংঘবদ্ধভাবে বসবাস করে।

কৌমগোষ্ঠীতে সিদ্ধান্তগ্রহণের ধরন সাধারণত অনানুষ্ঠানিক (informal)। কারণ, এরকম গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনে কোনো বিধিবদ্ধ, সংগঠিত স্থায়ী নেতৃত্ব বা কর্তৃত্ব থাকে না। এর ফলে সিদ্ধান্তসমূহ যৌথভাবেই গৃহীত হয়। যাযাবর গোষ্ঠীর সাধারণ ধরন অনুযায়ী, কখন গোষ্ঠীকে স্থানান্তরিত হতে হবে (মূলত খাদ্য-সংগ্রহের বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে) বা কীভাবে শিকার পরিচালনা করতে হবে— এ ধরনের সিদ্ধান্ত গোষ্ঠী সামগ্রিকভাবেই নিয়ে থাকে। কোনো কোনো গোষ্ঠীতে অনানুষ্ঠানিক গোষ্ঠীপ্রধান বা শিকার-

নিপুণ ব্যক্তির প্রাধান্য থাকলেও এই প্রাধান্য নিরঙ্কুশ ছিল না। অপরদিকে, প্রাধান্যকারীর দক্ষতা, সততা প্রভৃতি বিষয়ে গোষ্ঠীসদস্যদের স্বীকৃতি ছিল প্রধান। এম্বার এবং এম্বার (Ember & Ember)-এর মতে, 'বলা চলে নেতৃত্বের উদ্ভব হত ক্ষমতা থেকে নয়— প্রভাব থেকে; পদ থেকে নয়— (সমাজস্বীকৃত) ব্যক্তিগত গুণাবলী থেকে।' উদাহরণ হিসাবে এস্কিমোদের কথাই উল্লেখ করা যায়। এস্কিমো গোষ্ঠীর মধ্যে গোষ্ঠীপ্রধান প্রভাব বিস্তার করতে পারত এ কারণেই যে তার গোষ্ঠীর অন্যান্য সদস্যরা গোষ্ঠীপ্রধানের ভালো/সঠিক সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতার ও অধিকতর দক্ষতার প্রতি আস্থাশীল ছিল। কিন্তু এই আস্থা যেমন দীর্ঘস্থায়ী ছিল না, অপরদিকে গোষ্ঠীপ্রধানের পক্ষে কোনো রকম নিষেধাজ্ঞা জারী করার ক্ষমতাও ছিল না। এস্কিমোদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে থারকেল ম্যাথিয়াসেন (Tharkel Mathiassen, 1928) বলেন, প্রতিটি গোষ্ঠীতেই নিয়ম অনুসারে একজন বয়স্ক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিদের কাছে শ্রদ্ধেয় বলে বিবেচিত হতেন এবং যিনি শিকারের স্থান পরিবর্তনের ব্যাপারে, কখন শিকার শুরু করা হবে সে ব্যাপারে, শিকারলব্ধ জন্তু কীভাবে বন্টিত হবে এবং কুকুরদের (শিকারি সমাজে অন্যতম শিকার সহায়ক প্রাণী হল কুকুর এবং নৃতাত্ত্বিকগণ মনে করেন, সর্বপ্রাচীন গৃহপালিত প্রাণীও হল কুকুর) কখন খাওয়াতে হবে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতেন। তিনি 'isumaitoq' অর্থাৎ 'যিনি চিন্তা করেন' বলে পরিচিত হন। তিনি সবচেয়ে যে প্রবীণ ব্যক্তি হবেন তা নয়। তবে নিয়ম অনুসারে তিনি এমন একজন প্রবীণ ব্যক্তি যিনি দক্ষ শিকারি অথবা বৃহৎ পরিবারের প্রধান। তাকে প্রকৃত অর্থে দলপতি (Chief)ও বলা যায় না কারণ তার নির্দেশ বা পরামর্শ মানার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা মেনে চলা হয় কারণ অংশত তার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে অন্যান্যদের আস্থা আছে এবং অংশত তিনি অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখেন। অবশ্য গোষ্ঠীপ্রধান হতেন পুরুষদের মধ্য থেকেই এবং অধিকাংশক্ষেত্রেই সবচেয়ে প্রধান গোষ্ঠীপতির স্ত্রী বা যে সমস্ত মহিলা শিকারে অংশ নিতেন এবং দক্ষ শিকারি ছিলেন তাঁদের প্রাধান্যও ছিল অন্যান্য মহিলাদের তুলনায় অনেক বেশি।

কুঙ (Kung) কৌমগোষ্ঠীর মধ্যে গোষ্ঠীপ্রধান বংশানুক্রমিকভাবে স্থলাভিষিক্ত হলেও অযোগ্য গোষ্ঠীপ্রধানের পরিবর্তে অন্য কোনো প্রধান ব্যক্তিকে গোষ্ঠীপ্রধান হিসাবে গণ্য করার ক্ষমতা গোষ্ঠীসদস্যদের রয়েছে। যদি গোষ্ঠীপ্রধান তাঁর দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন না করেন তাহলে সদস্যদের অধিকার থাকত অন্য প্রবীণ ব্যক্তিকে গোষ্ঠীপ্রধান করার। দায়িত্বগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল গোষ্ঠীসদস্যদের যেন খাদ্যাভাব না ঘটে তা দেখা, শিকারের বিষয়ে তদারকি করা, অন্য কোনো ব্যক্তিকে গোষ্ঠীর মধ্যে স্থান দেওয়া বা না-দেওয়ার ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া ইত্যাদি। সুতরাং বলা চলে কৌম সমাজে গোষ্ঠীপ্রধানদের ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত ও অন্যান্য সদস্যদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল।

৮০.৩.২ উপজাতীয় সমাজ ঃ

কৌম সমাজের তুলনায় উপজাতীয় সমাজের জনসংখ্যা বেশি। ভ্রাম্যমাণ সমাজ ক্রমশ স্থায়ী

সমাজ স্থাপনে উন্মুখ। জীবিকা শিকার বা খাদ্য সংগ্রহের পরিবর্তে পশুপালন এবং বিক্ষিপ্ত কৃষিকাজ। অবশ্য সমাজ তখনও সমভোগী, বৈষম্যহীন। রাজনৈতিক কাঠামোয় ক্রমশ বংশ-সংগঠন এবং সমবয়সী সংস্থা (age-set) প্রাধান্য বিস্তার করতে শুরু করেছে। এই সমস্ত সংস্থাগুলি ছোট ছোট গোষ্ঠীগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে এক বৃহৎ গোষ্ঠী (যা মূলত একই বংশজ) স্থাপনে আগ্রহী। বিপরীতভাবে, জনসংখ্যা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে একই বংশধারার অন্তর্গত ভেঙে যাওয়া ছোট ছোট গোষ্ঠীগুলির মধ্যে সংহতি স্থাপনের চেষ্টাও লক্ষ করা যায়। বলাবাহুল্য, এই ধরনের সংঘবদ্ধকরণ আদৌ স্থায়ী বা বিধিবদ্ধ নয়। প্রয়োজনের তাগিদে বিশেষ করে বহির্গোষ্ঠীর আক্রমণ হলে অথবা বড়রকমের বিপদের সম্মুখীন হলে একই বংশোদ্ভূত গোষ্ঠীগুলি ঐক্যবদ্ধ হয় এবং বিপদমুক্ত হলে পুনরায় স্বচালিত/স্বশাসিত কৌমগোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

উপজাতীয় সমাজে মূলত দুধরনের রাজনৈতিক সংস্থা দেখা যায়— (১) রক্তের সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা কুল সংস্থা (Clan Group) এবং (২) বয়সের ভিত্তিতে সমবয়সী সংস্থা (Age-set)। কুল গোষ্ঠীগুলির মধ্যে কুলের বয়স্ক ব্যক্তিরা গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যেকার বিরোধ মীমাংসায় বা অন্য কুলগোষ্ঠীর সঙ্গে বিরোধের মোকাবিলায় প্রধান দায়িত্ব নেয়। আবার কুল গোষ্ঠীগুলির মধ্যে বংশলতিকার দিক থেকে কাছাকাছি রক্তের সম্পর্কের মধ্যে সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা বেশি। উদাহরণ হিসাবে টিভ (Tiv) জনগোষ্ঠীর উল্লেখ করা যেতে পারে। একই বংশধারার অন্তর্ভুক্ত ৮ লক্ষেরও বেশি এই গোষ্ঠীর সদস্যরা বিভিন্ন ছোট ছোট উপগোষ্ঠীতে বিভক্ত এবং কাছাকাছি দুই প্রজন্ম বা তিন প্রজন্মের মানুষদের মধ্যে (যার সদস্য সংখ্যা ২০০ থেকে ১০০০-এর মধ্যে) সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা বেশি। পল বোহানন (Paul Bohannan) টিভ কুলগোষ্ঠীর কুললতিকার মাধ্যমে কুল সংঘকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে —

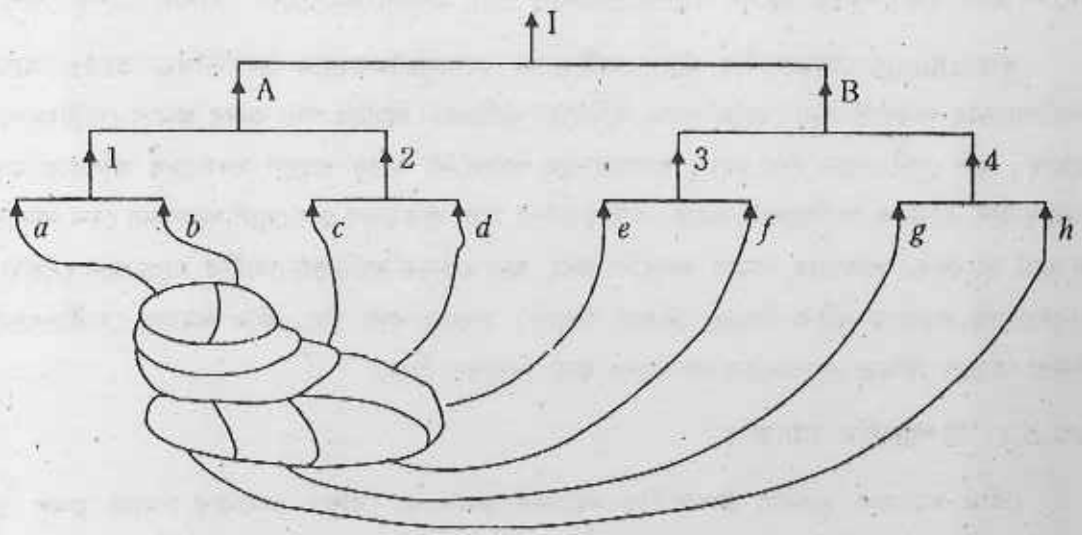

উপরোক্ত রেখাচিত্রের মাধ্যমে টিভ জনগোষ্ঠীর চার প্রজন্মের মানুষের রাজনৈতিক সংগঠনের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। *a* এবং *b*-এর মধ্যেকার বিরোধ কম তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, এ বিরোধ মূলত I দ্বারাই মীমাংসিত হয়। কিন্তু *a* এবং *c*-এর মধ্যে যখন কোনো বিরোধ দেখা দেয় তখন *a* এবং *b*-এর মধ্যে ঐক্য গড়ে ওঠে। এটা প্রত্যাশিত যে *c* বিরোধ মীমাংসায় *d*-এর সাহায্য পাবে। আবার *a*-এর সঙ্গে যখন *h*-এর কোনো বিরোধ দেখা দেয় তখন গোটা কুলগোষ্ঠীই দুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে — A এবং B-এর বংশধরদের মধ্যে। আবার বিরোধ নিষ্পত্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি উপগোষ্ঠী স্বাতন্ত্র্যের জায়গায় ফিরে আসে। সমগ্র টিভ গোষ্ঠীই ঐক্যবদ্ধ হয়ে পড়ে যখন অন্য কোনো বংশগোষ্ঠীর সঙ্গে বিরোধের সূত্রপাত হয়। বিরোধ মীমাংসার সঙ্গে সঙ্গে ঐক্যও ভেঙে পড়ে।

সমবয়সী ব্যবস্থা : উপজাতি গোষ্ঠী রাজনৈতিক সংস্থা হিসাবে সমবয়সী ব্যবস্থা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সমবয়সী ব্যবস্থা বলতে বুঝায় একই বয়সের ব্যক্তিরা একই ধরনের মর্যাদা ভোগ করে। শৈশব থেকে কৈশোর, যৌবন থেকে প্রাপ্তবয়স্ক এবং প্রাপ্তবয়স্ক থেকে প্রবীণ— এক এক স্তরের ব্যক্তিরা এক এক ধরনের সামাজিক ভূমিকা পালন করে এবং তদনুরূপ মর্যাদা ভোগ করে। যখন কোনো ব্যক্তির এক স্তর থেকে অন্যস্তরে উত্তরণ ঘটে তখন সেই ব্যক্তির সমবয়সী সকল ব্যক্তিরই একই সঙ্গে উত্তরণ ঘটে। উদাহরণ হিসাবে উত্তর-পূর্ব উগান্ডার কারিমজঙ (Karimojong) জনগোষ্ঠীর উল্লেখ করা যেতে পারে।

কারিমজঙ জনগোষ্ঠীর মূল জীবিকা হল পশুপালন এবং কৃষি। এই জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক সংস্থায় রয়েছে প্রবীণ ব্যক্তিরা যারা দৈনন্দিন কাজকর্মের ব্যাপারে, বিরোধ মীমাংসায়, উৎসব-অনুষ্ঠানাদি পরিচালনায় এবং জনগোষ্ঠীর দেব-দেবীর পূজার্চনায় সিদ্ধান্ত নেয়। প্রাপ্তবয়স্কদের দায়িত্ব হল এই সমস্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজকর্ম সম্পাদন করা।

কুলগোষ্ঠী ব্যবস্থা এবং সমবয়সী ব্যবস্থা : এই দু'ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থা উপজাতি সমাজে লক্ষ করা গেলেও আধুনিক অর্থে কোনো বিধিবদ্ধ/আনুষ্ঠানিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বা কোনো স্থায়ী রাজনৈতিক পদাধিকারীর অস্তিত্ব দেখা যায় না। নেতৃত্বের বিষয়টি একান্তই অবিধিবদ্ধ এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক। ব্যক্তির বয়স, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা প্রভৃতি বিষয়গুলি গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। নেতৃত্বের প্রকৃতি ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্থানিক (Local) স্তরের। এ ধরনের সমাজ কাঠামোয় নেতৃত্বের ক্ষেত্রে কোন কোন ব্যক্তিগত গুণাবলী গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয় সে সম্পর্কে বেশ কিছু নৃতাত্ত্বিক গবেষণা করেছেন। যেমন ডেনিস ওয়ারনার (Dennis Werner) মধ্য ব্রাজিলের একটি উপজাতির (Mekranoti-Kayapo) ওপর সমীক্ষা করতে গিয়ে দেখলেন, নেতৃত্বদানের ক্ষেত্রে বুদ্ধি (intelligence) ঔদার্য (generosity), বোধগম্যতা (knowledgeability), প্রত্যাশা (ambition) এবং আগ্রাসন মনোভাব (Aggressiveness) প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলি গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হয়। তাছাড়া, প্রবীণতা, উচ্চতা, এমনকি সমভোগী সমাজ

হওয়া সত্ত্বেও নেতার সন্তানাদি, লিঙ্গভেদে পুরুষ নেতৃত্বের বাছাইয়ে অগ্রাধিকারী। অপর এক নৃতাত্ত্বিক W. H. Kracke আমাজন অববাহিকায় বসবাসকারী আর একটি উপজাতির (Kagwahiv) ওপর সমীক্ষা চালিয়ে দেখালেন সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার যে মনোভাব সেই মনোভাব নেতৃত্বের দাবীদারের থাকা বাঞ্ছনীয়। বেশ কিছু উপজাতি সমাজে নেতৃত্বের জন্য এক ধরনের প্রতিযোগিতাও লক্ষ করা যায়। যেমন, নিউ গিনি (New Guinea) এবং দক্ষিণ আমেরিকার উপজাতিদের মধ্যে উপজাতির অন্যান্য সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য নেতৃত্বদানকারীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা দেখা যায়। অন্যান্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য নেতাকে অবশ্যই লড়াই-এ সাহসী, কৃষিকার্যে পারদর্শী, কঠোর পরিশ্রমী, এবং তুকতাক বিদ্যায় পারদর্শী হতে হবে। নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তির স্ত্রীও অনেক সময় কোনো কোনো ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়ে থাকে। যেমন Kagwahiv গোষ্ঠীপ্রধানের স্ত্রী-সমাজের মহিলাদের নেতৃত্বদানকারী। উৎসব অনুষ্ঠানাদিতে খাদ্য-বাছাই ও বন্টনের ব্যাপারে তার ভূমিকা প্রধান।

৮০.৩.৩ দলপতি চালিত সমাজ ঃ

উপজাতীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা একই উপজাতিভুক্ত বিভিন্ন গোষ্ঠীকে যেমন ঐক্যবদ্ধ করে অবিধিবদ্ধ উপায়ে, দলপতি চালিত রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিধিবদ্ধ কাঠামোর মধ্যে বিভিন্ন কৌমগোষ্ঠী সংঘবদ্ধ হয়ে এক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের জন্ম দেয়। এই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ব্যাপারে হয় কোনো একক ব্যক্তি অথবা কতিপয় ব্যক্তি নিয়ে এক মন্ত্রণী (Council) সক্রিয় ভূমিকা নেয়। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোনো ব্যক্তি এই পদমর্যাদা ভোগ করে কর্তৃত্বের অধিকারী হয়। আবার কোনো কোনো সমাজে একাধিক দলপতি চালিত গোষ্ঠী নিয়ে এক বৃহৎ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে এবং অধিকতর ক্ষমতাসম্পন্ন দলপতি-দ্বারা চালিত হয়। উপজাতীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থার তুলনায় এই ব্যবস্থায় জনসংখ্যা ও জনঘনত্ব অনেক বেশি। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আরো উন্নততর ও উদ্বৃত্ত উৎপাদন সক্ষম। একারণে, রাজনৈতিক ব্যবস্থাও অনেক বেশি স্থায়ী এবং বংশানুক্রমিক। সমাজব্যবস্থাও সমতাবাদী হবার পরিবর্তে মর্যাদাভিত্তিক স্তরবিন্যস্ত। অন্যান্যদের তুলনায় দলপতি ও তার পরিবারবর্গ অধিকতর সুযোগসুবিধার দাবিদার। উপজাতীয় ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত গুণাবলীকে নেতৃত্বদানের শর্ত হিসাবে গণ্য করা হয়। দলপতি চালিত ব্যবস্থায় ধরে নেওয়া হয় উক্ত গুণাবলী দলপতির রক্তের মধ্যে প্রবাহিত এবং বংশানুক্রমিকভাবে অর্জিত।

কৌমগোষ্ঠী বা উপজাতীয় সমাজব্যবস্থা যেখানে সমতাবাদী, দলপতি চালিত সমাজব্যবস্থা সেখানে অংশত বৈষম্যমূলক। দলপতির অধিকার রয়েছে যৌথ/গোষ্ঠী-শ্রমকে ব্যবহারের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা এবং পরিচালনা করা, সম্পদের পুনর্বন্টন করা, ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পরিচালনায় মুখ্য ভূমিকা নেওয়া ইত্যাদি। এর ফলে সমাজের অন্যান্য সদস্যদের তুলনায় দলপতি অধিকতর ক্ষমতা ও মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি। অন্যান্য সদস্যদের কাছে দলপতি ঐশীক্ষমতাসম্পন্ন বা পবিত্র পরিবারের বা বিশেষ গুণসম্পন্ন ব্যক্তি।

কোনো কোনো দলপতি চালিত রাজনৈতিক ব্যবস্থায়, যেমন তাহিতি (Tahiti) জনগোষ্ঠীর মধ্যে, দলপতি অন্যান্য সদস্যদের উপর নিয়ন্ত্রণ জারী করতে পারে যেহেতু তারই হাতে সমাজের যৌথ সম্পদের বন্টনক্ষমতা রয়েছে এবং এর ফলে তারই অধস্তন (যেমন ধর্মীয় অনুষ্ঠান পরিচালনায় পারদর্শী/অধিকতর নিপুণ যোদ্ধা) ব্যক্তিদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধাদানের ক্ষমতা রয়েছে। এভাবে সমতাবাদী সমাজ ক্রমশ স্তরবিন্যস্ত সমাজের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। উদাহরণ হিসাবে তাহিতি (Tahiti) সমাজের রাজনৈতিক ব্যবস্থার উল্লেখ করা যেতে পারে। তাহিতি সমাজব্যবস্থায় দলপতির কাজ হল সমাজের যৌথ সম্পদ যেমন জমি তদারকি করা, যৌথ/গোষ্ঠী শ্রমকে পরিচালনা করা, নৌকাগুলির রক্ষণাবেক্ষণ করা ও নাবিকদের যথাযথ নির্দেশ দেওয়া ইত্যাদি। সমাজও একারণে মর্যাদাভিত্তিক স্তরবিন্যস্ত। প্রথমে দলপতি ও তার পরিবারবর্গ, পরবর্তীস্তরে ধর্মীয়, যুদ্ধ, নৌ ইত্যাদি বিষয়ে পারদর্শী বিশেষ ব্যক্তিবর্গ এবং তারপরে রয়েছে সাধারণ সদস্যগণ। এই দলপতি চালিত রাজনৈতিক ব্যবস্থায় যখন পারদর্শীগণ সম্পদ ও ক্ষমতার স্থায়ীপদের অধিকারী হয়ে ওঠে এবং দলপতি অন্যান্যদের কাছ থেকে শ্রম ও সম্পদকর আদায়ের অধিকারী হয় তখন উদ্ভূত হয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে রাষ্ট্রব্যবস্থা। দলপতি ও তার ঘনিষ্ঠজন অন্যান্যদের শ্রম-সম্পদ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে একদিকে যেমন বৈষম্যমূলক সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠতে সহায়তা করে, তেমনি ওই নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতাভিত্তিক বিশেষ সুবিধাটি স্থায়ী করে তোলার জন্য রাষ্ট্রীয় সংস্থা গড়ে তোলার প্রাথমিক প্রক্রিয়াগুলোও সম্পন্ন করতে থাকে।

৮০.৩.৪ রাষ্ট্রীয় সমাজ ঃ

রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে রাষ্ট্রব্যবস্থার উদ্ভব সমাজবিকাশের এক বিশেষ পর্বে। বিবর্তন প্রক্রিয়ায় দলপতি চালিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরবর্তী ধাপ হয় রাষ্ট্রব্যবস্থা। রাষ্ট্রব্যবস্থা হল এক স্বাধীন রাজনৈতিক একক যা এক নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়ীভাবে বহু সম্প্রদায়ের মানুষ নিয়ে গঠিত এবং যা পরিচালনার জন্য এক কেন্দ্রানুগ সরকার থাকবে। এই সরকারের দায়িত্ব থাকবে কর সংগ্রহ করা, নিয়মকানুন তৈরি ও বলবৎ করা, ব্যক্তিকে বিভিন্ন কার্যসম্পাদনে, যুদ্ধে যুক্ত করা এবং নিয়মভঙ্গকারীকে শাস্তিদানের ব্যবস্থা করা। বলাবাহুল্য, এ ধরনের রাষ্ট্রীয় সমাজব্যবস্থা পূর্ববর্তী সমাজব্যবস্থার তুলনায় জটিল, স্তরবিন্যস্ত উদ্বৃত্ত-নির্ভর, অধিকাংশ ক্ষেত্রে (মধ্য-এশিয়ার কয়েকটি অঞ্চল বাদ দিলে) সমৃদ্ধ কৃষিব্যবস্থায় পুষ্ট। পেশার বিশেষীকরণ, বহির্বাণিজ্য, নগর-সভ্যতার ক্রমবিকাশ প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলি রাষ্ট্রীয় সমাজব্যবস্থার অন্যতম শর্ত। এই গোটা ব্যবস্থাকে পরিচালনার জন্য প্রয়োজন এক কেন্দ্রীয় শক্তির— স্থায়ী পুলিশ, সামরিক বাহিনী, কমবেশি স্থায়ী সরকার, সরকারি কর্মচারী, মতাদর্শের সৃজনে ও সংক্রমণে ধর্মীয় যাজক-সম্প্রদায় ও বৌদ্ধিককুল। পরিবারে অগ্রজের প্রতি অনুজের আনুগত্য, পুরুষের প্রতি নারীর আনুগত্য, রাষ্ট্রের তথা রাষ্ট্রপ্রধানের প্রতি জনগণের আনুগত্যের ভিত তৈরি করে। পূর্ববর্তী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের পার্থক্যকে ছক-১-এর মাধ্যমে তুলে ধরা যেতে পারে —

রাজনৈতিক সংস্থার ধরন	রাজনৈতিক সংহতির সর্বোচ্চ স্তর	রাজনৈতিক কর্মীর বিশেষীকরণ	প্রধান অর্থনৈতিক ব্যবস্থা	সম্প্রদায়ের আয়তন ও জনঘনত্ব	সামাজিক স্তর ব্যবস্থা	বন্টন ব্যবস্থার ধরন
কৌমগোষ্ঠী	স্থানিক	নামমাত্র. বিশেষীকরণ ঘটেনি, নেতৃত্ব অ-প্রাতিষ্ঠানিক	শিকারি ও সংগ্রাহক	অত্যন্ত ক্ষুদ্র, জনঘনত্ব অতি অল্প	সমতাবাদী	প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিনিময়মূলক
উপজাতীয়	কখনও কখনও বহুস্থানিক	"	ভ্রাম্যমাণ কৃষি এবং/অথবা পশুপালন	ক্ষুদ্র সম্প্রদায় জনঘনত্ব অল্প	"	বিনিময়মূলক
দলপতিচালিত	বহুস্থানিক	কোন কোন ক্ষেত্রে	কৃষি এবং/অথবা পশুপালন	বৃহৎ সম্প্রদায় মাঝারি জনঘনত্ব	স্তরবিন্যস্ত মর্যাদাভিত্তিক	পারস্পরিক ও পুনর্বন্টন
রাষ্ট্রীয়	বহুস্থানিক, প্রায়শ এক ভাষাগোষ্ঠী, অনেক ক্ষেত্রে বহুমাত্রিক	অধিকাংশ ক্ষেত্রে	সহজ কৃষি ও পশুপালন	নগর ব্যবস্থার পত্তন, ব্যাপক জনঘনত্ব	শ্রেণী/জাত নির্ভর	বাজার অর্থনীতি

ছক-১ : উৎস — Ember & Ember (1990), Page-398

রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে রাষ্ট্রের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে পূর্বতম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির বিলোপ বা স্থানিক একক-এর স্বাতন্ত্র্য লুপ্ত হতে থাকে। রবার্ট কারনাইরো (Robert Carneiro) প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী, এক হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দে পৃথিবীতে প্রায় এক লক্ষ থেকে দশ লক্ষ পৃথক/স্বতন্ত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব ছিল। গত তিন হাজার বছর ধরে এবং বিশেষ করে বিগত দুশো বছরের মধ্যে এর অধিকাংশই কোনো না কোনো রাষ্ট্রের আওতায় আসে হয় যুদ্ধবিগ্রহ ও আধিপত্য বিস্তার করে অথবা অর্থনৈতিক চাপসৃষ্টির মাধ্যমে। অবশ্য আনুগত্য আদায়ের ধরন, আনুগত্য আদায়কারীর প্রকৃতি সকল ক্ষেত্রে এবং সব সময়ে একই রকম থাকেনি। উদাহরণ হিসাবে রোম সাম্রাজ্যের উত্থান-এর উল্লেখ করা যেতে পারে। এর সূচনা হয়েছিল এক ক্ষুদ্রায়তন রাষ্ট্র (City State বা নগর-রাষ্ট্র) হিসাবে। কিন্তু চার-পাঁচ শত বছর ধরে ক্রমাগত আগ্রাসী লড়াই-এ বহু স্বতন্ত্র গুণবিশিষ্ট রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের পতন ঘটিয়ে আত্মপ্রকাশ ঘটে বিশাল রোম সাম্রাজ্যের। ভারতেও মৌর্য বা গুপ্তযুগে এ ধরনের রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে বহু রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের বিলোপ ঘটিয়ে। গড়ে উঠতে থাকে এক বিশাল সরকারি কর্মীবাহিনী যা আধুনিক ভাষায় আমলাতন্ত্র, বেতনভোগী সামরিক বাহিনী, অধস্তন শাসক ও বিচার-বিভাগীয় সংস্থাসমূহ,

জনসাধারণের কাছ থেকে সংগৃহীত এক বিপুল রাজকোষ নিয়ন্ত্রিত বণিকগোষ্ঠী, বাজারসমূহ ও বাণিজ্যিক পথের ওপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ এবং এসবের ফলে উদ্ভূত রাষ্ট্রপ্রধানকে ঘিরে এক অভিজাতগোষ্ঠী। একই ঘটনা ঘটতে থাকে পশ্চিম আফ্রিকায়, আরব ভূখণ্ডে।

সুতরাং প্রাথমিকভাবে শ্রম ও সম্পদ নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে এবং পরবর্তী স্তরগুলিতে প্রাধান্য বিস্তারকারী গোষ্ঠীগুলো তাদের বিশেষ সুবিধাগুলো বজায় রাখার স্বার্থে নানা দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও যুদ্ধবিগ্রহের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। অতঃপর ধীরে ধীরে সামরিক বাহিনী, কর্মীবাহিনী, আমলাগোষ্ঠী, বিচারসংস্থা, পুরোহিত ও অভিজাত গোষ্ঠী, বণিক শ্রেণী ইত্যাদি নিয়ে বিপুলায়তন সাম্রাজ্যগুলো বিস্তার লাভ করেছে।

৮০.৪ রাষ্ট্রের উদ্ভব

গ্রিক যুগের অন্যতম রাষ্ট্র-দার্শনিক অ্যারিস্টটল রাষ্ট্রের উদ্ভবকে ব্যাখ্যা করেছেন এক বিবর্তন প্রক্রিয়ার ফসল হিসাবে। জৈবিক ও অর্থনৈতিক চাহিদা থেকে সৃষ্ট পরিবারের বর্ধিত রূপ হল গ্রাম এবং গ্রামের সমষ্টি থেকে রাষ্ট্র। মধ্যযুগের রাষ্ট্র-দার্শনিক সেন্ট অগাস্টিন এবং সেন্ট টমাস এ্যাকুইনাস রাষ্ট্রের উদ্ভবকে ঈশ্বরের ইচ্ছা বলে ব্যাখ্যা করেছেন। আধুনিক যুগের সূচনাপর্বে সামন্ত সমাজ থেকে পুঁজিবাদী সমাজের উদ্ভব পর্বের তাত্ত্বিক টমাস হবস (১৬৫১)। পরবর্তীকালে জন লক (১৬৯০) বা রুশো (১৭৬২) রাষ্ট্রের উদ্ভবকে প্রাকৃতিক রাজত্বে (হবসের বর্ণনায় অ-সামাজিক, জন লক এবং রুশোর বর্ণনায় সামাজিক) বসবাসকারী মানুষের মধ্যে চুক্তির ফলশ্রুতি বলে ব্যাখ্যা করেন। আবার একদল তাত্ত্বিক (Oppenheimer, Jenks, Leacock) রয়েছেন যাঁরা রাষ্ট্রের উদ্ভবের কারণ হিসাবে বলপ্রয়োগের উল্লেখ করেছেন। আদিম সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলির মধ্যেকার সংঘাত থেকে দলপতি ক্রমশ নৃপতি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে।

বলাবাহুল্য, উপরোক্ত কোনো তত্ত্বই রাষ্ট্রের উদ্ভবের একমাত্র কারণ হিসাবে বিবেচিত হয় না। উদারনীতিবাদী তাত্ত্বিকগণ রাষ্ট্রকে ব্যাখ্যা করেছেন বিবর্তনবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে। অর্থাৎ কৌম, উপজাতি গোষ্ঠী রূপান্তরিত হয়েছে রাষ্ট্রে। উদারনীতিবাদী তাত্ত্বিকগণ রাষ্ট্রের উদ্ভবকে আবার ব্যাখ্যা করেছেন কার্যবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে। কারণ, এ ধরনের তাত্ত্বিকগণ মনে করেন, শিকারি সমাজ যখন কৃষিজীবী সমাজে রূপান্তরিত হল তখন সমাজে দেখা গেল স্তরবিন্যাস, সামাজিক জটিলতা এবং প্রয়োজন হল রাষ্ট্রের ন্যায় এক সংঘবদ্ধ কর্তৃত্বের।

কার্ল মার্কসও রাষ্ট্রকে ব্যাখ্যা করেছেন কার্যকারিতার দৃষ্টিকোণ থেকে। কিন্তু উদারনীতিবাদী তাত্ত্বিকগণ রাষ্ট্রকে দেখেছেন সমাজে শৃঙ্খলা আনয়নকারী এক প্রগতিশীল সংস্থা হিসাবে, কার্ল মার্কস সেখানে রাষ্ট্রকে ব্যাখ্যা করেছেন শ্রেণী শোষণের যন্ত্র হিসাবে। উদারনীতিবাদী তাত্ত্বিকদের মতে, রাষ্ট্র-কর্তৃক ব্যবহৃত বলপ্রয়োগ যথাযথ ও বৈধ, কারণ রাষ্ট্র সামগ্রিকভাবে সমাজের সকলের অথবা অন্ততপক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের

জন্য গঠিত একটি প্রতিষ্ঠান। উদারনীতিবাদীদের এই তত্ত্বকে কার্ল মার্কস অসত্য বলে প্রত্যাখ্যান করেন। মার্কস-এর মতে, আদিম সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং সমাজ-স্বার্থের মধ্যে কোনো সংঘাত ছিল না। ব্যক্তি সমগ্র গোষ্ঠীদ্বারা পরিচালিত হত এবং ওই গোষ্ঠীতে তার অংশগ্রহণ ছিল প্রত্যক্ষ। সমাজবিকাশের এই অবস্থায় রাজনৈতিক ক্ষমতার বিচ্ছিন্নকরণ (Alienation) হয়নি। কিন্তু উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমাজেরও রূপান্তর ঘটতে থাকে। শ্রমবিভাজনের সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন উপকরণের মালিকানাকে কেন্দ্র করে শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে এবং এর ফলে ব্যক্তিস্বার্থের সঙ্গে সমাজস্বার্থের সংঘাত শুরু হয়। প্রয়োজন হয় এই স্বার্থের দ্বন্দ্বের মোকাবিলায় এক বিচ্ছিন্ন ক্ষমতার বা রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার। রাষ্ট্র এবং অন্যান্য রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হল এই ক্ষমতারই বাহন। ম্যাগুইরে (Maquire, 1978) রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্পর্কে কার্ল মার্কস-এর উপরোক্ত ধারণাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, কার্ল মার্কস সরকার (Government) এবং রাজনীতির (Politics) মধ্যে পার্থক্য করেন। আদিম সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তিস্বার্থকে কেন্দ্র করে যে দ্বন্দ্ব দেখা দিত তা সামগ্রিকভাবেই মোকাবিলা করা হত সেই সমাজে প্রত্যেকের প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে। এই অবস্থায় সরকারের অস্তিত্ব ছিল সম্পর্কগুলি পরিচালনার জন্য। কিন্তু এই অবস্থায় সমাজ বিচ্ছিন্ন কোনো কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা ছিল না, কিন্তু শ্রমবিভাজনকে কেন্দ্র করে শ্রেণীর ও রাজনীতির উদ্ভব ঘটল। এক কথায়, ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভবের সঙ্গে শ্রেণীর উদ্ভব এবং শ্রেণীর উদ্ভবকে কেন্দ্র করে শ্রমিক শ্রেণীকে শোষণ ও নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য মালিকশ্রেণীর শোষণযন্ত্র হিসাবে রাষ্ট্রের উদ্ভব।

রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্পর্কে রাষ্ট্র-দার্শনিকগণ যে সমস্ত বক্তব্য রেখেছেন সেই সমস্ত বক্তব্যের পাশাপাশি আর এক ধরনের বক্তব্য শোনা যায় সমাজতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিকগণের রচনায়। অধিকাংশ নৃতাত্ত্বিক-এর মত হল, রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে এক বিবর্তন ধারায় শিকারি-সংগ্রাহক সমাজ থেকে কৃষিজীবী সমাজে রূপান্তর পর্বে। মেসোপটেমিয়ায়, সিন্ধুনদের অববাহিকা অঞ্চলে, চীনে, পেরুতে যে রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে ওঠে তা বহুলাংশে কৃষিনির্ভর। কার্ল ভিটফোগেল (Karl Wittfogel, 1957) মেসো-আমেরিকা (Mesoamerica), দক্ষিণ ইরাক (সুমেরীয় অঞ্চল) ও নীলনদের অববাহিকা অঞ্চলে নগর-রাষ্ট্রের উদ্ভবের কারণ হিসাবে কৃষি-উৎপাদন ব্যবস্থাকে চিহ্নিত করেন। উক্ত তাত্ত্বিকের মতে, কৃষি-উৎপাদনে সেচ-ব্যবস্থায় শ্রম-সরবরাহ ও পরিচালনার জন্য এক রাজনৈতিক এলিট গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয় এবং এই এলিট গোষ্ঠীই পরে শাসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। রাষ্ট্রের উদ্ভবের কারণ অন্বেষণে কার্ল ভিটফোগেল যেখানে সেচ-ব্যবস্থার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন, রবার্ট অ্যাডামস্ (Adams, 1960) সেখানে সেচ-ব্যবস্থার পরিবর্তে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থায় জমির মালিকানা, জমির সীমানা নির্ধারণ, উৎপাদন, অপর ব্যক্তি/গোষ্ঠীর সঙ্গে জমির সীমানা নিয়ে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য নিরাপত্তাবাহিনী ও রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রয়োজন— প্রভৃতি কারণগুলিকে গুরুত্ব দিয়েছেন। অ্যাডামস্-এর মতে উপরোক্ত কারণগুলি দক্ষিণ ইরাকে (সুমেরীয় অঞ্চলে) রাষ্ট্রব্যবস্থার উদ্ভবের জন্য দায়ী। অ্যাডামস্ মনে করেন, দক্ষিণ ইরাকে নগর পত্তনের গোড়ার দিকে সেচ ব্যবস্থা ছিল খুবই

নিম্নমানের এবং ক্ষুদ্রায়তন বিশিষ্ট এবং সেখানে ব্যাপক শ্রমদান ও শ্রমপরিচালনার জন্য রাষ্ট্রের ন্যায় কোনো কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার প্রয়োজন হত না।

অবশ্য মার্শাল শালিনস্ (Marshal Shalins)-এর মতো বেশ কিছু তাত্ত্বিক রয়েছেন যাঁরা মনে করেন, শিকারি-সংগ্রাহক গোষ্ঠী কৃষিকাজকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক ছিল না। কারণ, শিকারি-সংগ্রাহক অবস্থায় যে বিশ্রাম ও বাড়তি সময় পাওয়া যায় তার তুলনায় কৃষিকাজ অধিকতর শ্রমসাপেক্ষ। তাছাড়া, শিকারি-সংগ্রাহকদের ভ্রাম্যমাণ জীবনের পরিবর্তে মৎস্য শিকার নির্ভর জনগোষ্ঠীর মধ্যে কোনো নির্দিষ্ট স্থানে বসবাসের, গ্রাম-পত্তনের ও স্তরবিন্যস্ত সমাজের অস্তিত্ব দেখা যায়। সুতরাং একমাত্র কৃষিকার্যের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রবেশ করল— এ ধরনের সিদ্ধান্ত অত্যন্ত একপেশে।

রবার্ট কারনায়েরো (Robert Carneiro, 1970) নামে আর এক তাত্ত্বিক পেরু অঞ্চলের ওপর সমীক্ষা চালিয়ে এই সিদ্ধান্তে আসেন যে ভৌগোলিক ও সামাজিক দিক থেকে আবদ্ধ এক নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের জনসংখ্যা বৃদ্ধিই রাষ্ট্রের উদ্ভবের কারণ। কারনায়েরোর মতে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে প্রতিযোগিতা ও দ্বন্দ্ব বাড়তে থাকে এবং পরাজিত গোষ্ঠীগুলিকে বিজয়ী গোষ্ঠীর অধীনে থাকতে হয়। অবশ্য, যতদিন পর্যন্ত স্থানাভাব না ঘটে ততদিন পর্যন্ত গোষ্ঠীগুলি বশ্যতা স্বীকারের পরিবর্তে আরো গভীর অরণ্যে বা ফাঁকা জায়গায় বসতি গড়ে তোলে। কিন্তু যখন পাহাড়, সমুদ্র, মরুভূমি — প্রভৃতির ফলে আর নতুন বসতি স্থাপন সম্ভবপর হয় না তখন আনুগত্য স্বীকার করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। কার্ল পোলানী (Karl Polanyi, 1957) প্রাচীনতম রাষ্ট্রগুলির উদ্ভবের কারণ হিসাবে বাণিজ্যের সম্প্রসারণকে দায়ী করেন। রাইট এবং জনসন (Wright And Johnson) এই তত্ত্বের সমর্থন করে বলেন, উৎপাদিত দ্রব্যগুলির রপ্তানি, আমদানিকৃত দ্রব্যগুলির ব্যবস্থাপনা, বাণিজ্যের নিরাপত্তা — প্রভৃতি কারণে এক সংগঠিত রাষ্ট্রক্ষমতার দরকার হয়। এই সংগঠিত ক্ষমতাই রাষ্ট্রের উদ্ভবের কারণ বলা যাবে।

রাষ্ট্রের উদ্ভবের প্রসঙ্গে সম্প্রতি আর একটা বিশ্লেষণধারা পুষ্ট হতে চলেছে। প্যাট্রিসিয়া ক্রোন (Patricia Crone, 1986) দেখাতে চেয়েছেন যে, মানুষের পক্ষে কোনো ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে মেনে নেওয়া তখনই সম্ভবপর হয়েছে যখন সেই ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অতিমানবীয় তথা ঈশী-ক্ষমতাসম্পন্ন বলে মনে হয়েছে। মেসোপটেমীয়ার রাষ্ট্রসৃষ্টির পিছনে অন্যান্য তাত্ত্বিকগণ যেখানে কৃষিব্যবস্থার উল্লেখ করেন। ক্রোন সেখানে অর্থাৎ মেসপটেমীয়ায় রাষ্ট্রের উদ্ভবে মন্দির অর্থনীতি (Temple Economy— যার মূল উদ্দেশ্য হল ঈশ্বরকে তুষ্ট/পুষ্ট করা) উল্লেখ করেন। পলিনেসিয়া এবং ওয়েসেক্স (Wessex)-এর ক্ষেত্রেও দলপতি বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সম্পাদন করত এবং অন্যান্য সাধারণ মানুষের থেকে অতিরিক্ত ঈশী-ক্ষমতাসম্পন্ন বলে দাবী করত। ঈশী-ক্ষমতার প্রতি আনুগত্য পরবর্তী পর্যায়ে রাষ্ট্রপ্রধানের প্রতি আনুগত্যকে দৃঢ়মূল করে তোলে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে, ঠিক কোন কারণে এবং কেন রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটল সে সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে কিছু বলা সম্ভবপর নয়। সব জায়গায় যে একই কারণে এবং একই সময়ে রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটেছে — এ ধরনের ধারণাও সঠিক নয়। সম্ভবত, বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন পরিস্থিতি কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার জন্ম দিয়েছেন যা পরবর্তী পর্যায়ে রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটিয়েছে। সেচ-ব্যবস্থায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বাণিজ্য, অলৌকিক ক্ষমতার প্রতি আনুগত্য — প্রভৃতি ঘটনাগুলির মধ্যে কোনো একটি ঘটনা বা একাধিক ঘটনার সমন্বয়ে রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসাবে রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটেছে। সব জায়গাতেই কোনো একটি মাত্র ঘটনা বা উপাদানকে রাষ্ট্রের উদ্ভবের কারণ হিসাবে উল্লেখ করা সমীচীন নয়। তবে, নৃতাত্ত্বিক গবেষণা এ পর্যন্ত যতদূর এগিয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, রাষ্ট্রের উদ্ভবের ক্ষেত্রে কৃষি-অর্থনীতি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কৃষি-অর্থনীতির বিকাশ, মানুষের কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস, সামাজিক বিশেষীকরণ, স্তরবিন্যাস, উদ্বৃত্ত সম্পদত, কর ব্যবস্থায়, স্থায়ী কর্মীবাহিনীর উদ্ভব ঘটিয়ে রাষ্ট্রের উদ্ভবের প্রেক্ষাপট তৈরি করেছে।

অতএব সাধারণভাবে বলা যায়, রাষ্ট্রের উৎপত্তি দীর্ঘ সময়ের এক বিবর্তন ধারার ব্যাপার। হঠাৎ একদিন একটি কোনো কারণে রাষ্ট্রের আবির্ভাব হয় নি। অর্থনৈতিক উপাদান ছাড়াও ধর্মীয় ও রক্তের বন্ধন ভিত্তিক উপাদান এবং অবশেষে একদিকে বলপ্রয়োগ ও অপরদিকে সমাজের কিছু অংশের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা— এই সব কিছুর এক মিলিত জটিল বিবর্তন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও বিকাশ।

৮০.৫ সারাংশ

মানব সভ্যতার বিকাশের এক বিশেষ পর্বে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে রাষ্ট্রের উদ্ভব। রাষ্ট্রের উদ্ভবের পূর্বেও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব ছিল। সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা, এই শৃঙ্খলা বজায় রাখার উপায় বা মাধ্যম হিসাবে সংগঠিত বাহিনী বা ব্যবস্থাপনার উপস্থিতি (বিধিবদ্ধ বা অবিধিবদ্ধ, সামাজিক বা রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ) এবং রাজনৈতিক সংগঠনের সীমানা / এলাকা হিসাবে নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের (বা জনগোষ্ঠীর) উপস্থিতি প্রাক্-রাষ্ট্রীয় সমাজেও লক্ষ করা যায়। অর্থনৈতিক অবস্থা, ক্ষমতা প্রয়োগের ধরন, ব্যক্তি-কর্তৃত্বের পারস্পরিক সম্পর্ক ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক নৃতাত্ত্বিকগণ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের বিবর্তনের চারটি পর্যায়ের উল্লেখ করেন। যথা— (১) কৌমগোষ্ঠী সমাজ, (২) উপজাতি গোষ্ঠী সমাজ, (৩) দলপতি চালিত সমাজ এবং (৪) রাষ্ট্রীয় সমাজ।

কৌমগোষ্ঠী সমাজ ঃ শিকারি অথবা/এবং খাদ্য সংগ্রাহক গোষ্ঠীর মধ্যে এ ধরনের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান লক্ষ করা যায়। অধিকাংশ নৃতাত্ত্বিক মনে করেন যে কৃষিব্যবস্থার উদ্ভবের পূর্বে অর্থাৎ আনুমানিক দশ হাজার বৎসর পূর্বে প্রায় প্রতিটি সমাজ ব্যবস্থারই রাজনৈতিক সংগঠন ছিল এই ধরনের। এই

কৌমগোষ্ঠীগুলি আয়তনে যেমন ছিল ক্ষুদ্র, জনসংখ্যা ও জনঘনত্বের দিক থেকেও ছিল স্বল্প এবং মূলত যাযাবর তথা ভ্রাম্যমাণ গোষ্ঠী। ওয়াকি, সেমাঙ বা তেহুলচে জনগোষ্ঠীর মধ্যে এ ধরনের রাজনৈতিক সংগঠন দেখা যায়। এই ধরনের গোষ্ঠীগুলির মধ্যে বিধিবদ্ধ, সংগঠিত এবং স্থায়ী নেতৃত্বদানকারী কোনো সংস্থা থাকে না। সিদ্ধান্তসমূহ যৌথভাবেই গৃহীত হয়।

উপজাতি গোষ্ঠী সমাজ ঃ কৌমগোষ্ঠী সমাজের তুলনায় উপজাতি গোষ্ঠী সমাজের জনসংখ্যা বেশি। জীবিকা শিকার বা খাদ্য সংগ্রহের পরিবর্তে পশুপালন এবং বিক্ষিপ্ত কৃষিকাজ। ভ্রাম্যমাণ সমাজ ক্রমশ স্থায়ী গ্রাম পত্তনের দিকে অগ্রসরমান। অবশ্য সমাজ তখনও সমভোগী এবং বৈষম্যহীন। রাজনৈতিক কাঠামোয় ক্রমশ বংশ সংস্থা এবং সমবয়সী সংস্থা প্রাধান্য বিস্তার করে। এই সমস্ত সংস্থাগুলি ছোট ছোট বহু গোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ করে এক বৃহৎ গোষ্ঠী (যা মূলত একই বংশজ) অন্তর্ভুক্ত করতে থাকে। এই ধরনের সংঘবদ্ধ হওয়া আদৌ স্থায়ী নয় — বিধিবদ্ধও নয়। প্রয়োজনের তাগিদে বিশেষ করে বহিঃশত্রুর আক্রমণে গোষ্ঠীগুলি ঐক্যবদ্ধ হয়ে ওঠে এবং বিপদ-মুক্ত হলে পুনরায় স্বচালিত কৌমগোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এ ব্যাপারে টিড, কারিমজঙ উপজাতির উল্লেখ করা যেতে পারে।

দলপতি চালিত ব্যবস্থা ঃ দলপতি চালিত রাজনৈতিক ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ কাঠামোর মধ্যে বিভিন্ন কৌমগোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ করে এক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের জন্ম দেয়। এই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান পরিচালন ব্যাপারে হয় কোনো একক ব্যক্তি অথবা কতিপয় ব্যক্তি নিয়ে গঠিত এক মণ্ডলী সক্রিয় ভূমিকা নেয়। উপজাতি রাজনৈতিক ব্যবস্থার তুলনায় এই ব্যবস্থায় জনসংখ্যা এবং জনঘনত্ব অনেক বেশি। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আরো উন্নত, উদ্বৃত্ত উৎপাদনক্ষম এবং এ কারণে রাজনৈতিক ব্যবস্থাও অনেক বেশি স্থায়ী এবং বংশানুক্রমিক। সমাজ ব্যবস্থাও সমভোগী হবার পরিবর্তে মর্যাদা ভিত্তিক। তাহিতি বা হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের আদিবাসীদের মধ্যে এই ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থা লক্ষ করা যায়।

রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ঃ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে রাষ্ট্রব্যবস্থার উদ্ভব সমাজ বিকাশের এক বিশেষ পর্বে— বিবর্তন প্রক্রিয়ায় দলপতি চালিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরবর্তী পর্যায় হল রাষ্ট্রব্যবস্থা। রাষ্ট্রব্যবস্থা হল এক স্বাধীন রাজনৈতিক একক যা এক নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বহু সম্প্রদায়ের মানুষ নিয়ে গঠিত এবং যা পরিচালনার জন্য এক কেন্দ্রীভূত সরকার থাকবে; কর সংগ্রহের জন্য, নিয়মকানুন তৈরি ও বলবৎকরণের জন্য। বিবাদ মীমাংসার জন্য নিয়মভঙ্গকারীকে শাস্তিদানের জন্য, ব্যক্তিকে বিভিন্ন কার্যসম্পাদনে, যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য এই সরকার মুখ্য ভূমিকা নেবে। বলাবাহুল্য, এ ধরনের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা পূর্ববর্তী সমাজ ব্যবস্থার তুলনায় জটিল, স্তরবিন্যস্ত, উদ্বৃত্ত নির্ভর, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমৃদ্ধ কৃষিব্যবস্থায় পুষ্ট।

৮০.৬ অনুশীলনী

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

১) রাষ্ট্রপূর্ব রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রকৃতি নির্ণয় করুন।

২) রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বিবর্তন প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা করুন।

৩) রাষ্ট্রের উদ্ভবের সম্ভাব্য কারণগুলি উল্লেখ করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন ঃ

১) রাষ্ট্রের উদ্ভবে কৃষির ভূমিকা বিশ্লেষণ করুন।

২) কৌম সমাজের রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রকৃতি নির্ণয় করুন।

৩) উপজাতীয় সমাজের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি নির্ণয় করুন।

৪) দলপতি চালিত সমাজে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি নির্ণয় করুন।

৮০.৭ গ্রন্থপঞ্জী

1. C. R. Ember and M. Ember (1990) — Ahthropology, U.S.A. Prentice Hall, Inc.
2. J. A. Hall and G. J. Ikenberry (1997, Indian Edn.) — The State, Delhi, World View.
3. John Beattic (1964/1992) — Other Cultures, London, Routledge.
4. Lowie R. H. (1940/1952) — An Introduction to Cultural Anthropology, New York, Rinehart & Co.
5. Lucy Mair (1965/1972) — An Introduction to Social Anthropology, O.U.P.
6. Maguire (1978 — Marx's Theory of Politics.
7. Randall Collins (1997, Indian Edn.) — Theoretical Sociology, New Delhi, Rawat Pub.

একক ৮১ □ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক

গঠন

৮১.০ উদ্দেশ্য

৮১.১ প্রস্তাবনা

৮১.২ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণে মার্কসীয় তত্ত্ব

৮১.২.১ রাষ্ট্রের আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্যের ধারণা

৮১.৩ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণে ঃ অ-মার্কসীয় তাত্ত্বিকগণের বক্তব্য

৮১.৩.১ লিপসেট-এর তত্ত্ব

৮১.৩.২ ফ্রেড ব্লক-এর তত্ত্ব

৮১.৩.৩ জেমস ও' কুলার-এর তত্ত্ব

৮১.৪ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণে নয়া-প্রাতিষ্ঠানিক অর্থনৈতিক তত্ত্ব

৮১.৫ বিশ্বব্যবস্থায় অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক

৮১.৬ সারাংশ

৮১.৭ অনুশীলনী

৮১.৮ গ্রন্থপঞ্জী

৮১.০ উদ্দেশ্য

অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়টি প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক প্লেটোর সময় থেকেই অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হয়েছে। এ যুগেও বিষয়টি একইভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার আলোচ্যসূচিতে স্থান পেয়েছে। এই এককের পঠন-পাঠনের মাধ্যমে আমরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে জানতে পারব—

- অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পারস্পরিক সম্পর্কের ধরন.
- এ ব্যাপারে কার্ল মার্কস ও তার অনুগামীদের বক্তব্য.
- রাষ্ট্রের আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্যের ধারণা.
- অ-মার্কসীয় তাত্ত্বিকদের বক্তব্য.
- নয়া প্রাতিষ্ঠানিক অর্থনীতির প্রবক্তাদের মতামত।

৮১.১ প্রস্তাবনা

সমাজের অন্যতম দুটি দিক — অর্থনীতি ও রাজনীতির পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়টি সমাজতত্ত্বের অন্যতম এক আলোচ্য বিষয়। এ ব্যাপারে প্রথম শৃঙ্খলাবদ্ধ তত্ত্বগত আলোচনা আমরা লক্ষ করি কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩)এর রচনায়। কার্ল মার্কসের পূর্বেও বিভিন্ন তাত্ত্বিক বিষয়টি সম্পর্কে বিক্ষিপ্তভাবে মন্তব্য করেছেন। যেমন গ্রিক দার্শনিক প্লেটো ন্যায়-শাসিত রাষ্ট্রের কথা বলতে গিয়ে 'কাম্য' অর্থব্যবস্থার বিষয়ে আলোচনা করেন। আধুনিক যুগের তাত্ত্বিক মন্তেস্কু ব্রিটেনের রাষ্ট্রব্যবস্থার সঙ্গে ফ্রান্সের রাষ্ট্রব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনায় ব্রিটেনের পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা ও তৎসম্পর্কিত নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র তথা পার্লামেন্টীয় ব্যবস্থাকে স্বাগত জানিয়েছেন। অবশ্য মন্তেস্কু বা তাঁর সমকালীন অন্য কোনো রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর রচনায় আমরা বিষয়টি সম্পর্কে কোনো তাত্ত্বিক ছক পাই না। এ ব্যাপারে অন্যতম পথিকৃৎ হলেন কার্ল মার্কস।

৮১.২ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণে মার্কসীয় তত্ত্ব

মার্কসীয় তত্ত্বে অর্থনীতির সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্কটি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বলে বিবেচিত হয়। প্রথমত, যে কোনো সমাজ কাঠামোয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা তার অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে গড়ে ওঠে। মার্কসীয় তাত্ত্বিকগণ মনে করেন, মানুষ তার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য— খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের প্রয়োজন মেটানোর জন্য, এক নির্দিষ্ট উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যুক্ত হয়। এই উৎপাদন প্রক্রিয়ার মধ্যে একদিকে রয়েছে উৎপাদনের উপকরণ অর্থাৎ হাতিয়ার বা যন্ত্রপাতি প্রাকৃতিক সম্পদ ও শ্রম ছাড়া অন্য উপাদান, এবং তার সঙ্গে রয়েছে ব্যক্তি শ্রম, যেহেতু মানুষের শ্রম ছাড়া উৎপাদন হয় না। অপরদিকে উৎপাদনের জন্য মানুষকে সামাজিকভাবে সংগঠিত হতে হয় যা উৎপাদন সম্পর্ক নামে পরিচিত। উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ সমাজে ব্যক্তিগত মালিকানার সৃষ্টি করে এবং এই ব্যক্তিগত মালিকানাকে কেন্দ্র করে উৎপাদন সম্পর্ক মানুষকে মূল দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে— একটি শ্রেণী মালিকানা বা অন্য উপায়ে উৎপাদন উপকরণ নিয়ন্ত্রণ করে এবং অন্য শ্রেণী তথা শ্রমিকশ্রেণী উৎপাদনের উপকরণের মালিকানা ভোগ না

করলেও শ্রমশক্তির সাহায্যে উৎপাদনে অংশগ্রহণ করে। এই দুই শ্রেণীর অবস্থান পরস্পরবিরোধী যেহেতু এদের স্বার্থ পরস্পরবিরোধী। এর ফলে শ্রেণীদ্বন্দ্ব বা শ্রেণী-সংগ্রামের সৃষ্টি হয়। এই শ্রেণীদ্বন্দ্ব বা শ্রেণী-সংগ্রামকে প্রশমিত করে ব্যক্তিগত মালিকানা সুনিশ্চিত করার জন্য কতিপয় নিয়মকানুন ও নিয়মকানুন প্রয়োগকারী তথা বলপ্রয়োগকারী সংস্থার প্রয়োজন হয়। রাষ্ট্র হল এরকম এক বলপ্রয়োগকারী সংস্থা বা শ্রেণী-শোষণের হাতিয়ার। বস্তুত যে কোনো সমাজ-কাঠামোয় উৎপাদন সম্পর্কের এই সামগ্রিক অবস্থা সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো বা প্রকৃত ভিত তৈরি করে এবং এই ভিতের অর্থাৎ অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর আইনগত এবং রাজনৈতিক উপরিকাঠামো ও তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ সামাজিক চেতনা, সংস্কৃতি গড়ে ওঠে।

সুতরাং বলা যায়, রাজনীতি হল সেই সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থারই প্রতিফলন মাত্র। অর্থনীতি রাজনীতির প্রকৃতিকে সুনিশ্চিত করে তিন ভাবে— (১) শ্রেণী ও শ্রেণী-সম্পর্কের উপস্থিতি; (২) মতাদর্শ ও মানবিক/বৌদ্ধিক উৎপাদনের মাধ্যমসমূহ; (৩) রাজনৈতিক গতিশীলতার বস্তুগত মাধ্যমসমূহ।

শ্রেণী ও শ্রেণী-সম্পর্কের উপস্থিতি ঃ যে কোনো শ্রেণীবিভক্ত সমাজব্যবস্থায় (যা উৎপাদন উপকরণের মালিকানাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে) প্রতিটি শ্রেণীর নিজস্ব স্বার্থ থাকে। উৎপাদন উপকরণের মালিক শ্রেণীর স্বার্থ হল ব্যক্তিমালিকানাকে সুনিশ্চিত করা এবং রাষ্ট্রকে তথা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান-সমূহকে সেই উদ্দেশ্য সাধনে ব্যবহার করা; সম্পদ যাতে চুরি না হয় বা অন্য কোনো উপায়ে হস্তচ্যুত না হয়, শ্রমিকরা যাতে কারখানার মালিকানা হস্তগত না করে, এমনকী মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলন ধর্মঘট, শ্রমিক সংগঠন না করে তার জন্য রাষ্ট্রের পুলিশ/প্রশাসন যাতে সক্রিয় হয়ে ওঠে তার ব্যবস্থা করা। পুঁজিপতিগণ তাদের মধ্যেকার দ্বন্দ্বনিরসনে ব্যাঙ্ক-এর কাছ থেকে স্বল্প সুদে এবং স্বল্প আয়াসে ঋণ গ্রহণেও রাষ্ট্রকে ব্যবহার করতে চায়। বিপরীতদিকে শ্রমিকরাও চায় এই ব্যবস্থার মাধ্যমে নিজ শ্রেণীস্বার্থকে সংরক্ষিত করতে। ছাঁটাই বা ক্লোজআপ-এর বিরুদ্ধে, উপযুক্ত মজুরী ও অন্যান্য ভাতা প্রদান, জীবনবীমা প্রকল্প চালু করা প্রভৃতি বিষয়ে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের দাবি রাখতে— যদিও শ্রমিক-স্বার্থ সংরক্ষিত হতে পারে একমাত্র উৎপাদন উপকরণের ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান ঘটিয়ে। শ্রেণীবিভক্ত সমাজ-কাঠামোয় উৎপাদন উপকরণের মালিকানা যে শ্রেণীর হাতে থাকে রাষ্ট্রের মাধ্যমে সেই শ্রেণীর স্বার্থই সুরক্ষিত হয়। পুঁজিবাদী সমাজে এই মালিকানা যেহেতু পুঁজিপতিদের হাতে থাকে সেহেতু রাষ্ট্র পুঁজিপতি শ্রেণীর প্রশাসনিক যন্ত্র হিসাবে কাজ করে। মতাদর্শ ও বৌদ্ধিক উৎপাদনের মাধ্যমসমূহ— যে কোনো ধারণা বা মতাদর্শ শুধুমাত্র সামাজিক বা সাংস্কৃতিক বিষয় নয়— একই সঙ্গে রাজনৈতিক বিষয়ও। যে শ্রেণী তার স্বার্থ সম্পর্কে সচেতন এবং শ্রেণী-সচেতন গোষ্ঠী হিসাবে ঐক্যবদ্ধ, সেই শ্রেণীর পক্ষে ক্ষমতা দখলের জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করা সহজ। অপরদিকে যে শ্রেণী তার শ্রেণীস্বার্থ সম্পর্কে সচেতন নয়, যার সদস্যরা মিথ্যা চেতনার দ্বারা অপর শ্রেণীর সঙ্গে নিজেদের একত্ব অনুভব করে সেই শ্রেণীর

পক্ষে ক্ষমতালাভও সহজ হয় না। তাছাড়া, যে কোনো ধারণাই বস্তুগত ও সামাজিক পরিস্থিতি থেকে গড়ে ওঠে। অন্যান্য দ্রব্য উৎপাদনে যেমন যন্ত্রপাতি, পুঁজি, শ্রম ইত্যাদির দরকার হয়, ধারণার সম্প্রসারণে সেরকম পুস্তক, লেখার সরঞ্জাম, মুদ্রাযন্ত্র, পুঁজি এবং যারা জ্ঞানচর্চা করে তাদের বাঁচার জন্য বস্তুগত উপকরণ, বেতন ইত্যাদির দরকার হয়। যে শ্রেণী বৌদ্ধিক উৎপাদনের এই সমস্ত মাধ্যমগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা সেই শ্রেণীর পক্ষে কি ধরনের ধারণা ও মতাদর্শ নির্মিত হবে তা নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হয়। সাধারণত যে কোনো সমাজব্যবস্থায় মূল ধারণাগুলি মালিকশ্রেণীর স্বার্থকেই প্রতিফলিত করে। কারণ, তারাই ধারণাগুলি নির্মাণের ব্যয়ভার বহন করে। এ কারণে মতাদর্শ উৎপাদনের বস্তুগত মাধ্যমগুলির নিয়ন্ত্রণে এক বড় ধরনের রাজনৈতিক হাতিয়ার। এটা একদিক থেকে যেমন পুঁজিপতি শ্রেণীকে নিজ শ্রেণীস্বার্থ সম্পর্কে সচেতন করে তোলে, অপরদিকে শ্রমিক শ্রেণীর কাছে নিজ শ্রেণীস্বার্থ সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। মিথ্যা চেতনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ শ্রমিকশ্রেণী নিজের শোষণকে দৈবনির্ভর বা পূর্বজন্ম নির্ধারিত বলে মনে করায় শোষণমুক্ত সমাজ গঠন করার ব্যাপারে সক্রিয় হয় না। একইভাবে, জাতীয়তাবাদের ধারণা মানুষকে ইংরেজ, ফরাসি, আমেরিকান বা ভারতীয় হিসাবে চিহ্নিতকরণ করে তার শ্রেণীগত অবস্থানকে অস্পষ্ট করে তোলে এবং শ্রেণী-সচেতনভাবে শোষণমূলক সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধাচরণ করে না।

রাজনৈতিক গতিশীলতার বস্তুগত মাধ্যমসমূহ ঃ রাজনীতিতে অংশগ্রহণের জন্য বস্তুগত সম্পদ দরকার। শুধুমাত্র সংখ্যা নয়; সংগঠন ও সাংগঠনিক কাজকর্মের সুষ্ঠু রূপায়ণ ক্ষমতা লাভের সহায়ক। এ কারণেই অসংগঠিত শ্রমিকের বিরুদ্ধে সংগঠিত মুষ্টিমেয় পুঁজিপতির পক্ষে রাষ্ট্রকে ব্যবহার করা সম্ভবপর হয়। রাজনৈতিক গতিশীলতার বস্তুগত মাধ্যম বলতে পরিবহণ ব্যবস্থা, যোগাযোগ মাধ্যমসমূহ, এমনকি লেখার সরঞ্জাম, টেলিফোন, রাজনৈতিক প্রচারের জন্য অর্থ সশস্ত্রবাহিনীর উপস্থিতি ও ব্যবহার, রাজনৈতিক কাজকর্ম করার জন্য উদ্বৃত্ত শ্রম ও সম্পদ প্রভৃতিকে বোঝায়। সাধারণত শ্রমিক শ্রেণীর তুলনায় অর্থনৈতিক দিক থেকে সমৃদ্ধ মালিক শ্রেণীর হাতে এই সমস্ত সম্পদ থাকায় মালিক শ্রেণীর পক্ষে রাজনৈতিক গতিশীলতা বজায় রাখা এবং রাজনৈতিক ক্ষমতাদখল সহজ হয়।

কিন্তু পুঁজিবাদের সংকট এই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটাতে থাকে। পুঁজিপতিদের মধ্যেকার বিরোধ, পুঁজির কেন্দ্রীভবন পুঁজিপতিদের সংখ্যাকে আরো কমিয়ে আনে। অপরদিকে, শ্রমিক অসন্তোষ শ্রমিককে শ্রেণী-সচেতন ও সংঘবদ্ধ করে তোলে। শাসকশ্রেণীর একাংশ, বিশেষ করে বৌদ্ধিক গোষ্ঠী, পরিবর্তনের এই দেওয়াল লিখন আগে থেকেই পড়তে পারে এবং শ্রমিকের পাশে এসে দাঁড়ায়। বৃহদায়তন কারখানা ব্যবস্থা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের বা ইতস্তুতভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বিভিন্ন অংশের কারখানার শ্রমিকরা একই ছাদের তলায় সমবেত হয়। এর ফলে রাজনৈতিক গীতশীলতাও বৃদ্ধি পায়। পুঁজিবাদের সংকট বিদ্যমান মতাদর্শ ও ধারণাগুলির স্ববিরোধিতাকে তুলে ধরতে থাকে। তাছাড়া, পুঁজিপতি শ্রেণীর

নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, গণমাধ্যমগুলি যেমন— মুদ্রাযন্ত্র, সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে বিপ্লবী-চেতনার সম্প্রসারণে সহায়ক হয়। এসব কিছুই শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের সহায়ক হয়ে ওঠে।

যে কোনো সমাজ-কাঠামোয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা একদিকে যেমন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিফলন, অপরদিকে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের ফলে রাজনৈতিক ব্যবস্থারও পরিবর্তন ঘটতে থাকে। অর্থাৎ রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন নির্ভর করে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের ওপর। যেহেতু প্রত্যেক সমাজের রাজনৈতিক ব্যবস্থা তথা উপরিসৌধ তার প্রাতিষঙ্গিক অর্থনৈতিক ভিত্তির দ্বারা প্রভাবিত হয় সেহেতু যতদিন পুরাতন ভিত্তিটি তথা অর্থনৈতিক কাঠামো অপরিবর্তিত থাকে ততদিন রাজনৈতিক ব্যবস্থা তথা উপরিকাঠামোর কোনো ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয় না। উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ পুরাতন উৎপাদন সম্পর্ক ভেঙে দিয়ে নতুন উৎপাদন সম্পর্কের ভিত্তি স্থাপন করে। সমাজের পুরাতন অর্থনৈতিক কাঠামোটি ভেঙে গিয়ে নতুন ভিত্তি গড়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থা তথা উপরিসৌধের বিকাশ শুরু হয়। এ কারণেই দেখা যায় দাসব্যবস্থা বা সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় যেমন সর্বজনীন ভোটাধিকার দেওয়া যায় না তেমনি পুঁজিবাদী সমাজ কাঠামোয় শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে প্রকৃত রাজনৈতিক ক্ষমতা ভোগ করা সম্ভবপর হয় না। অর্থাৎ আর্থ-সামাজিক কাঠামো অস্থায়ী রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক অধিকারগুলো উপস্থাপিত হয়ে থাকে।

৮১.২.১ রাষ্ট্রের আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্যের ধারণা ঃ

সমাজে, পরিবর্তনশীল উৎপাদন সম্পর্কে যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার জন্ম দেয় তারই সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠার সম্ভাবনা সৃষ্টি হলেও তা থেকে এধরনের সিদ্ধান্তে আসা অনুচিত হবে যে রাজনৈতিক ব্যবস্থার তথা উপরিসৌধের বিভিন্ন উপাদান আবশ্যিকভাবে অর্থনৈতিক ভিত্তির যান্ত্রিক প্রতিফলন মাত্র। দেখা গেছে, রাষ্ট্রও ইতিবাচক বা নেতিবাচক ভূমিকা পালন করে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। তাছাড়া, রাজনৈতিক ব্যবস্থা/উপরিসৌধ বিপ্লবাত্মক উপায়ে বা বিপ্লবের বিরোধিতা করে অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন ঘটাতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, জার্মান পুঁজিবাদ যে ফ্যাসিবাদী ভাবাদর্শের জন্ম দেয় সেই ভাবাদর্শই পরে জার্মান পুঁজিবাদের বিকাশে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। রাষ্ট্রের এই আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্যের বিষয়টি কার্ল মার্কসের বিশ্লেষণেও লক্ষ করা যায়। রাষ্ট্র সম্পর্কে কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো (১৮৪৮) বর্ণিত মডেলটিতে রাষ্ট্রের আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্যের বিষয়টি উপেক্ষিত হলেও The Eighteenth Brummair of Louis Bonaparte (1852) এবং Civil War is France (1870) গ্রন্থে কার্ল মার্কস রাষ্ট্রের আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্যের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেন। প্রথমোক্ত গ্রন্থে (১৮৫২) মার্কস তিনটি পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রের আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার বিষয়ে উল্লেখ করেন। (এক) শাসকশ্রেণীর মধ্যেকার বিরোধ বা অন্তঃকলহে শাসকশ্রেণী যখন দুর্বল এবং এককভাবে আধিপত্য

বিস্তারে অক্ষম। (দুই) যখন সমাজে মূল দুই শ্রেণীর মধ্যেকার দ্বন্দ্ব তীব্রতর হয় এবং কোনো পক্ষই জয়লাভে সমর্থ না হয়, এবং (তিন) যদি এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যখন পুঁজিপতি শ্রেণী ক্ষমতা হারিয়েছে কিন্তু শ্রমিকশ্রেণী ক্ষমতা দখল করতে পারছে না— তখন রাষ্ট্র আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়। দ্বিতীয়োক্ত গ্রন্থে (১৮৭০) মার্কস সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের ফ্রান্সে রাষ্ট্রের আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্যের বিষয়টি তুলে ধরেন।

মার্কস-এর পরবর্তী পর্যায়ে রাষ্ট্রের আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্যের বিষয়টি তুলে ধরেন মিলিব্যান্ড (Ralph Miliband, 1973) এবং পুলানৎসজাস (Poulantzas) যদিও যুক্তির বিস্তারে উভয়ের বক্তব্যের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। The State in Capitalist Society, 1973 গ্রন্থে মিলিব্যান্ড কার্ল মার্কসের কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর বিশ্লেষণ (Instrument of Exploitation, Executive Machinery of the Bourgeois) অনুসরণ করে বলেন, পাশ্চাত্যের উন্নত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলিতে রাষ্ট্র, রাষ্ট্রযন্ত্রের বিভিন্ন বিভাগ যথা— পুলিশ, আমলা ও সামরিক বাহিনী পুঁজিপতি শ্রেণীর হাতিয়ার হিসাবেই কাজ করে। তাছাড়া রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালনায় অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিগণ পদমর্যাদা ও কর্মস্থলের পরিবেশগুণে শাসকশ্রেণীর সঙ্গে এতটাই একাত্ম হয়ে ওঠে যে রাষ্ট্রযন্ত্র বিষয়গতভাবে শাসকশ্রেণীর স্বার্থবাহী শোষণযন্ত্রে পরিণত হয়। Marxism and Politics (1977) গ্রন্থে মিলিব্যান্ড অবশ্য রাষ্ট্রের আপেক্ষিক অবস্থানের বিষয়টি তুলে ধরেন। মিলিব্যান্ডের মতে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থাতেও পুঁজিপতিদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব থেকেই যায়। রাষ্ট্র শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে মধ্যস্থতা ও সমন্বয় ঘটানোর জন্য আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়।

আলথুসারের (Althusser) কাঠামোবাদী ধারণাকে অনুসরণ করে পুলানৎজাস তার ধারণা গড়ে তোলেন। পুলানৎজাস-এর মতে, বিভিন্ন ধরনের উৎপাদন-পদ্ধতি বা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা এক ধরনের উৎপাদন ব্যবস্থা। এছাড়া রয়েছে সামন্ততান্ত্রিক, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী পুঁজিবাদী, একচেটিয়া পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থা। যে কোনো বিশেষ ঐতিহাসিক সামাজিক গঠনব্যবস্থায় (Social formation) উপরোক্ত বিভিন্ন উৎপাদন পদ্ধতিগুলি মিলেমিশে এক জটিল একক গড়ে তোলে। তারই মধ্যে বিশেষ একটি উৎপাদন পদ্ধতি সাধারণত প্রাধান্য বিস্তার করে এবং সেই সমাজের সামাজিক গঠনের প্রধান নীতি হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া সামাজিক গঠনের ক্ষেত্রে অর্থনীতি ছাড়াও অন্যান্য উপাদানগুলিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বস্তুত, যে কোনো সামাজিক গঠন হল এক জটিল সমগ্র (a complex whole) যা গড়ে ওঠে বিভিন্ন সহ-কাঠামো নিয়ে। এই সহ-কাঠামোগুলি হল অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, মতাদর্শগত এবং এরা সমাজগঠনের ক্ষেত্রে আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্য ভোগ করে। [যদিও অর্থনৈতিক উৎপাদন প্রক্রিয়াই শেষ পর্যন্ত (in the last instance) নির্ধারকের ভূমিকা নেয়]। পুলানৎজাস অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ভিত্তি এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে উপরিসৌধ হিসাবে ব্যাখ্যা করার পরিবর্তে অর্থনীতি, রাজনীতি ও মতাদর্শকে সমাজ-গঠনের সহায়ক উপাদান হিসাবে ব্যাখ্যা করেন।

পুলানৎজাম-এর মতে, পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি উৎপাদন উপকরণের মালিক এবং শ্রমশক্তির মালিকদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে শ্রেণী-সংগ্রামের পটভূমি তৈরি করে। পুঁজিপতি শ্রেণীর মধ্যেকার সংগ্রামও তীব্রতর হতে থাকে। এক্ষেত্রে পুলানৎজাম মালিকানার (ownership) সঙ্গে দখলদারীত্বের (Possession) পার্থক্য করেন। পুলানৎজামের মতে, উনবিংশ শতকের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পুঁজির মালিকানার সঙ্গে পুঁজির দখলদারীত্বের কোনো পার্থক্য ছিল না। পুঁজিপতি শ্রেণী ছিল পুঁজির মালিক ও দখলদার। কিন্তু বর্তমানে একচেটিয়া পুঁজিবাদের যুগে পুঁজির মালিক হল অনুপস্থিত স্টকহোল্ডার, ব্যাঙ্ক, বাণিজ্যিক সংস্থাসমূহ, ব্যাঙ্কের আমানতকারী ব্যক্তিগণ। অপরদিকে দখলদার হল পরিচালকমণ্ডলী। আধুনিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় এই দুই শ্রেণীর মধ্যে যেমন বিরোধ রয়েছে, অপরদিকে শিল্পপুঁজির সঙ্গে ফিনান্সপুঁজির বিরোধ রয়েছে। এই বিভিন্ন ধরনের বিরোধের মধ্যে থেকে রাষ্ট্রসমাজকে ধরে রাখার চেষ্টা করে। এর ফলে প্রয়োজন অনুযায়ী রাষ্ট্রকে অর্থনীতির ব্যাপারে হস্তক্ষেপ যেমন করতে হয়, তেমনি কাঠামোগত দিক থেকেও রাষ্ট্র স্বতন্ত্র (autonomous) প্রতিষ্ঠান হিসাবে নিজেকে জাহির করতে পারে।

৮১.৩ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণে অ-মার্কসীয় তাত্ত্বিকগণের বক্তব্য

অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়টি অ-মার্কসীয় তাত্ত্বিকগণের দ্বারাও আলোচিত হয়েছে বিভিন্ন ঢঙে। একদল তাত্ত্বিক রয়েছেন যাঁরা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান-সমূহের বিশেষত গণতন্ত্রের প্রকৃতি যে অর্থনৈতিক কাঠামোর তথা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সমৃদ্ধির ওপর নির্ভরশীল তার উল্লেখ করেন। আর একদল তাত্ত্বিক রয়েছেন যাঁরা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে ধরে নিয়ে উভয় ধরনের প্রতিষ্ঠানের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ে অগ্রসর হন। প্রথমোক্ত তাত্ত্বিকদের মধ্যে রয়েছেন লিপসেট (Lipset), দ্বিতীয়োক্ত তাত্ত্বিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ফ্রেড ব্লক (Fred Block) জেমস ও' কুনার (James O' Conner)।

৮১.৩.১ লিপসেট-এর তত্ত্ব

লিপসেট (Lipset, pg 63)-এর গবেষণার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল রাজনৈতিক গণতন্ত্রের প্রকৃতি অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। কোনো দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি যত বেশি হবে সেই দেশের গণতন্ত্র ও তত বেশি সুরক্ষিত হবে। এবং যে দেশ যত বেশি দরিদ্র সেই দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা হয় একনায়কতান্ত্রিক নতুবা মুষ্টিমেয় কয়েকজনের পরিচালিত অভিজাততন্ত্রের জন্ম দেবে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষণ হিসাবে তিনি চারটি বিষয়কে বেছে নেন। যথা—

(১) দেশের সম্পদ যা প্রতিটি ব্যক্তির মাথাপিছু আয়, প্রতি ১০০০ লোক পিছু কতগুলি রেডিও, টেলিফোন, খবরের কাগজ, কতজন ব্যক্তির জন্য একটি গাড়ি বা একজন চিকিৎসক।

(২) শিল্পায়নের প্রকৃতি — কৃষি ও শিল্পে শ্রমিক নিযুক্তির হার।

(৩) নগরায়ণ — ২০,০০০-এর বেশি জনসংখ্যা অধ্যুষিত নগরের সংখ্যা এবং ১,০০,০০০ জনসংখ্যা অধ্যুষিত নগরের সংখ্যা।

(৪) শিক্ষা — প্রতি ১০০০ লোকের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা, উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত লোকের সংখ্যা।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিমাপের উপরোক্ত চারটি বিষয় পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। লিপসেট-এর মতে, নগরায়ণের ফলে শিক্ষিতের হার বাড়ে, ভোগ্যপণ্যের বৃদ্ধি ঘটে, গণমাধ্যমের প্রসার ঘটে এবং এসবের ফলশ্রুতি হিসাবে জনগণের অংশগ্রহণে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্ম হয়। গণতন্ত্র বলতে লিপসেট সেই ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে বুঝিয়েছেন, যেখানে জনগণের পক্ষে নিয়মিতভাবে সরকারি কর্মচারীদের পরিবর্তন করার সাংবিধানিক সুযোগ থাকবে এবং রাজনৈতিক পদাধিকারীদের বাছাই করার মাধ্যমে সরকারের প্রধান সিদ্ধান্তগুলিকে প্রভাবিত করার সুযোগ থাকবে। লিপসেট ইউরোপ এবং লাতিন আমেরিকার দেশগুলিকে চারভাগে ভাগ করেন—

(১) ইউরোপের স্থিতিশীল গণতন্ত্রসমূহ। এখানে ধারাবাহিকভাবে এবং কোনো রাজনৈতিক বিপর্যয় না ঘটিয়ে গণতন্ত্র ক্রিয়াশীল। যেমন— ব্রিটেন।

(২) ইউরোপের অস্থিতিশীল গণতন্ত্রসমূহ এবং একনায়কতন্ত্র। যেমন— স্পেন।

(৩) লাতিন আমেরিকার গণতন্ত্রসমূহ এবং অস্থিতিশীল একনায়কতন্ত্র। যেমন— ব্রাজিল।

(৪) লাতিন আমেরিকার স্থিতিশীল একনায়কতন্ত্র। যেমন— কিউবা।

ইউরোপ এবং লাতিন আমেরিকার গণতন্ত্রের এবং একনায়কতন্ত্রের এই প্রকারভেদের জন্য লিপসেট অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাত্রার প্রকারভেদকে দায়ী করেন। অর্থনৈতিক দিক থেকে উন্নত দেশগুলিতে গণতন্ত্রের ভিত অনেক বেশি মজবুত ও স্থায়ী। বিপরীতদিকে, অর্থনৈতিক দিক থেকে অনুন্নত দেশগুলিতে একনায়কতন্ত্রের প্রবণতা বেশি এবং কোনো কোনো দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলেও তা স্থায়ী হয় না। এর কারণ হিসাবে লিপসেট বলেন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন আয়বৃদ্ধি ঘটায়, আর্থিক নিশ্চয়তা দান করে এবং ব্যাপক শিক্ষার প্রসার ঘটায়, শ্রেণী প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করে এবং গণতন্ত্রের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করে। উন্নত দেশগুলির তুলনায় অর্থনৈতিক দিক থেকে অনগ্রসর দেশগুলিতে দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ ও তাদের মর্যাদাগত হীনমন্যতা বেশি। যে দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাত্রা নিম্নমানের হয় সেখানে দ্রব্যের, সেবার, সম্পদের বন্টন বৈষম্য বেশি। এর ফলে দরিদ্র শ্রেণী যখন আধুনিক যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থার ফলে উন্নত ধরনের জীবনযাপনের প্রত্যাশা করে তখন এক ব্যাপক অসন্তোষের সৃষ্টি হয় যা রাজনৈতিক চরমপন্থার সামাজিক ভিত্তি স্থাপন করে। একারণে দরিদ্র দেশগুলিতে রাজনৈতিক দলগুলি উন্নত দেশগুলির রাজনৈতিক দলের তুলনায় অনেক বেশি চরমপন্থী ও বৈপ্লবিক। বিপরীতভাবে উন্নত দেশগুলিতে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, ভোগ্যদ্রব্যের প্রাচুর্য ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে সামাজিক ব্যবধান কমিয়ে

আনে। দরিদ্র শ্রেণীর পক্ষে ভোগ্যপণ্যের ব্যবহার সহজলভ্য হওয়ায় জীবনধারণের প্রকৃতিও ভিন্ন হয় এবং রাজনৈতিক মনোভাব বৈপ্লবিক হওয়ার পরিবর্তে সংস্কারধর্মী হয়ে ওঠে। সম্পদের বৃদ্ধি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রসার ঘটায়। এই শ্রেণীর মধ্য থেকেই রাজনীতিতে অংশগ্রহণের প্রবণতা এবং সংখ্যায় বেশি থাকে। এরা রাষ্ট্রের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত রাখতে চায় এবং গণমাধ্যমগুলির সাহায্যে জনগণের মধ্যে নাগরিক দায়িত্ব, দক্ষতা, সচেতনতা ও অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তার বিষয় প্রচার করে। তাছাড়া, ধনী ও দরিদ্রের মধ্যস্থতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় রাজনীতিকেও চরম রক্ষণশীল বা বৈপ্লবিক হতে দেয় না। দরিদ্র দেশগুলিতে ধনী শ্রেণী গরীবদের নিকৃষ্ট, অভদ্র বলে মনে করে এবং একারণে গরীবদের রাজনৈতিক অধিকার দিতে অস্বীকার করে এবং এর ফলে গরীবদের মধ্যে অসন্তোষ আরো বাড়ে। বিপরীতভাবে, উন্নত দেশগুলিতে সম্পদের প্রাচুর্য থাকায় ধনী শ্রেণীর পক্ষে গরীবদের কিছু অধিকার দেবার ব্যাপারে আপত্তি থাকে না। এর থেকে লিপসেট সিদ্ধান্তে আসেন যে উন্নত দেশগুলিতেই রাজনৈতিক গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে। অর্থাৎ অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাত্রা কোনো দেশের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি নির্ণয় করে।

৮১.৩.২ ফ্রেড ব্লক-এর তত্ত্ব

অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়টি তুলে ধরেন ফ্রেড ব্লক (Fred Block, 1980) নামে অপর এক তাত্ত্বিক। পুলানৎজাস-এর অন্যতম সমালোচক ফ্রেড ব্লক রাষ্ট্রের পরিচালকমণ্ডলীর সঙ্গে পুঁজিবাদী অর্থনীতির সংগঠনসমূহের পরিচালকমণ্ডলীর পার্থক্য নির্দেশ করেন এবং মনে করেন, পরস্পর ভিন্ন স্বার্থবাহী উপরোক্ত দুই পরিচালকমণ্ডলীর মধ্যে বিরোধ রয়েছে। এমনকি তিনি এমন এক সম্ভাবনার কথা বলেন যে, অদূর ভবিষ্যতে রাষ্ট্রের সঙ্গে পুঁজিপতিদেব সংঘাত সমাজ পরিবর্তনের এক বড় কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

৮১.৩.৩ জেমস ও' কুলার-এর তত্ত্ব

জেমস ও' কুনার (James O' Connor, 1973) নামে অপর এক তাত্ত্বিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অর্থনীতির সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্কটি বিশ্লেষণ করেন। ও' কুনার-এর মতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজ তিন ধরনের সেক্টরে/ক্ষেত্রে বিভক্ত। যথা— (১) একচেটিয়া ক্ষেত্র (Monopoly Sector) (২) প্রতিযোগিতামূলক ক্ষেত্র (Competitive Sector) এবং (৩) রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্র (State Sector)। একচেটিয়া ক্ষেত্রের মধ্যে রয়েছে বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানগুলি যারা অত্যাধুনিক প্রযুক্তি কৌশল ব্যবহার করে সবচেয়ে বেশি লাভজনক দ্রব্য উৎপাদন করে। এই ক্ষেত্রের শ্রমিকবাহিনী তুলনামূলকভাবে সংঘবদ্ধ, উচ্চবেতনভোগী এবং একারণে রাজনৈতিকভাবে তৃপ্ত ও রক্ষণশীল।

প্রতিযোগিতামূলক ক্ষেত্রের মধ্যে রয়েছে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী গোষ্ঠী, যেমন— রেঁস্তোরা, পার্লার জাতীয় ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত বা খুচরা বিক্রেতা, অলাভজনক উৎপাদনের, যেমন— সাবেকী খাদ্য-উৎপাদনের

সঙ্গে যুক্ত অথবা নূতনতর ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশকারী কিন্তু মুনাফা এত বেশি হয়নি যাতে একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে পারে। এই ধরনের ক্ষেত্রগুলিতে শ্রমিকবাহিনী সাধারণত সংঘবদ্ধ হয় না; বেতনও খুব কম; কর্মক্ষেত্রের সুযোগ-সুবিধাও নিম্নমানের এবং যেহেতু শ্রমিকরা বেশির ভাগ হয় মহিলা নতুবা ভিনদেশি পুরুষ, নতুবা বৈষম্যের শিকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষজন সেহেতু এদের পক্ষে অবস্থার পরিবর্তন অসাধ্য হয়ে পড়ে।

রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের মধ্যে রয়েছে সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে যুক্ত সরকারি তহবিল থেকে বেতনপ্রাপ্ত যেমন— শিক্ষা, চিকিৎসার সঙ্গে যুক্ত কর্মীবাহিনী যারা বর্তমানে মোট শ্রমবাহিনীর প্রায় ২০ শতাংশ মানুষ। এই ক্ষেত্রের কর্মীবাহিনী ভদ্রজনোচিত কর্মী (White-collar worker)। সর্বক্ষেত্রে সংঘবদ্ধ না হলেও তুলনামূলকভাবে ভালো বেতন পায়। কারণ, এই কর্মীবাহিনী রাজনৈতিক দিক থেকে সচেতন এবং নিজ স্বার্থ সম্পর্কে সদা সজাগ।

ও' কুনারের মতে, এ পরিস্থিতিতে শ্রেণীসংগ্রাম পুঁজিপতি ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে মার্কস বর্ণিত উপায়ে সংঘটিত হয় না। পরিবর্তে এই তিন ক্ষেত্রের প্রকৃতিকে ঘিরেই সংঘটিত হয়। যেমন— প্রতিযোগিতা মূলক ক্ষেত্রে স্বল্প-বেতনভোগী পশ্চাৎপদ ও সংখ্যালঘু শ্রমিকরা প্রথমোক্ত তথা একচেটিয়া ক্ষেত্রের শ্রমিকদের তুলনায় কম বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে এবং একচেটিয়া ক্ষেত্রের শ্রমিকরাও এই বৈষম্যকে মেনে নেয়। অনুরূপভাবে, রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের শ্রমিকরা অনেক বেশি নিরাপদ অবস্থানে থাকায় অন্যান্য ক্ষেত্রের শ্রমিকদের সঙ্গে একাত্মতা বোধ করে না। শ্রমিকদের মধ্যে এই বিভাজন মার্কস বা লুকাচ বর্ণিত মিথ্যা চেতনা (false consciousness) জনিত কারণে নয়। আসলে তা উপরোক্ত তিন ক্ষেত্রের ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থ ও স্বার্থের সংরক্ষণজনিত কারণে। তাছাড়া, রাষ্ট্র নিজেই এক অর্থনৈতিক ক্ষেত্র এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় তার সুনির্দিষ্ট এক ভূমিকা রয়েছে। রাষ্ট্রীয় বাজেট, সেই বাজেটের প্রকৃতি (উদ্বৃত্ত, ঘাটতি, ইত্যাদি), সরকারি আয়-ব্যয়, কর ও কর-সংগ্রহ-ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক নীতি-নির্ধারণ, স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির আর্থিক অনুদান রাষ্ট্রীয় উৎপাদন ক্ষেত্র প্রভৃতি বিষয়গুলি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রকে নির্দিষ্ট করে। সুতরাং রাষ্ট্রকে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিফলন হিসাবে দেখা ঠিক নয়।

৮১.৪ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংস্থাসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণে নয়া-প্রাতিষ্ঠানিক অর্থনৈতিক তত্ত্ব

অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিশ্লেষণে নয়া-প্রাতিষ্ঠানিক অর্থনীতির (Neo-Institutional Economics) প্রবক্তাগণ রাষ্ট্রের সঙ্গে অর্থনীতির (বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলির অর্থনীতির) নূতন করে মূল্যায়নে অগ্রসর হন। এই নূতন মূল্যায়নের কারণ হিসাবে যে সমস্ত কারণগুলি দেখানো হয় তা হল—

প্রথমত, নয়া-প্রাতিষ্ঠানিক অর্থনীতি বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রশাসনিক বিশেষত আমলা-তান্ত্রিক হস্তক্ষেপের বিষয়টি বিশ্লেষণ করে।

দ্বিতীয়ত, নয়া-প্রাতিষ্ঠানিক অর্থনীতি বিভিন্ন বিষয়ের পারস্পরিক ক্রিয়া প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করে এবং অর্থনীতির বিকাশে তার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে তুলে ধরে। অর্থনীতির বিশ্লেষণে সেই সমাজের সামাজিক ও রাজনৈতিক বিবর্তনের বিশ্লেষণ অত্যন্ত জরুরী।

তৃতীয়ত, রাষ্ট্রগুলির অর্থনৈতিক ভূমিকায় কোনো সুনির্দিষ্ট ছকের হুবহু প্রতিচ্ছবি তুলে না ধরে এ ধরনের বিশ্লেষণ প্রতিটি দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ককে ভিন্ন প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করে।

চতুর্থত, উন্নয়নশীল দেশগুলিতে অর্থনৈতিক উন্নয়নে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের বিষয়টি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আয় ও সম্পদ বন্টনের বিষয়টির ওপর আলোকপাত করা হয়। একদিকে কর-ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্থ-সংগ্রহ, অপরদিকে অনুদান, জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি গ্রহণ প্রভৃতির মাধ্যমে সম্পদের বন্টন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের বিষয়টিকে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

পঞ্চমত, রাষ্ট্রের ভূমিকার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে নয়া-প্রাতিষ্ঠানিক অর্থনীতির বিশ্লেষণ চরম দক্ষিণ (রক্ষণশীল) বা চরম বামপন্থী মতাদর্শের ফাঁদকে যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে।

নয়া-প্রাতিষ্ঠানিক অর্থনীতির অন্যতম প্রবক্তা Heba Handoussa অর্থনীতিতে চার ধরনের বিকল্প রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের কথা বলেন। এর একদিকে রয়েছে সর্বাপেক্ষা কম হস্তক্ষেপের সমৃদ্ধ পুঁজিবাদী মডেল এবং অপরদিকে সর্বাপেক্ষা বেশি হস্তক্ষেপের সমৃদ্ধ সমাজতান্ত্রিক মডেল। বাস্তবে দেখা যায়, অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশসমূহে এই দুই চরম মডেলের পরিবর্তে ভিন্ন ধরনের অবস্থান। Heba Handoussa বিষয়টিকে একটি ছকের মাধ্যমে তুলে ধরেন—

	ন্যূনতম	বেশি	
ন্যূনতম	'ক' দাম-প্রক্রিয়ার প্রাধান্য ব্যক্তি-সম্পত্তির মালিকানা সুনিশ্চিত	'গ' বিকৃত দাম প্রক্রিয়ায় ব্যাপক আমলাতান্ত্রিক প্রাধান্য	বেশি
স্বল্প	'খ' কতকগুলি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সুরক্ষা ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা	'ঘ' কেন্দ্রীয় পরিকল্পনায় প্রাধান্য ব্যাপক রাষ্ট্রীয় মালিকানা	সর্বোচ্চ
	স্বল্প	সর্বোচ্চ	

অর্থনীতিতে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের মাত্রা

উপরোক্ত ছকটিতে অর্থনীতির ওপর চার ধরনের রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এর মধ্যে দুটি চরম অবস্থা হল ন্যূনতম রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের (ক) এবং সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের (ঘ) অবস্থা। ন্যূনতম রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের অবস্থায় রাষ্ট্র ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারকে সুনিশ্চিত করে এবং দাম প্রক্রিয়ার কিছু নিয়মাবলী তৈরি করে। এ ধরনের ন্যূনতম রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের উদাহরণ হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো সমৃদ্ধ পুঁজিবাদী দেশগুলি। অপর প্রান্তে রয়েছে সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের অবস্থা যেখানে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থনীতি পরিচালিত হয় এবং সম্পত্তির সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় মালিকানা স্বীকৃত। এ ধরনের দেশগুলির উদাহরণ হল সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি। কিন্তু অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশগুলিতে 'খ' এবং 'গ' মডেল বর্ণিত অবস্থা দেখা যায়। খ মডেলটিতে মুক্তবাজার ব্যবস্থায় কতকগুলি বিশেষক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ এবং সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানার উপর রাষ্ট্রের স্বল্প নিয়ন্ত্রণ থাকে। এই ধরনের দেশগুলি হল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি। বিকল্প আর একটি মডেল 'গ', যেখানে মুক্তবাজার ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত এবং আমলাতান্ত্রিক হস্তক্ষেপও খুব বেশি। লাতিন আমেরিকা, মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা এবং দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। Heba Handoussa অবশ্য স্বীকার করেন যে, বাস্তবে অর্থনীতির সঙ্গে রাজনৈতিক ব্যবস্থার সম্পর্ক উপরোক্ত বিকল্প মডেলগুলির তুলনায় অনেক জটিল এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ।

অর্থনীতিতে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের আলোচনায় Heba Handoussa রাষ্ট্রের চার ধরনের কাজের উল্লেখ করেন। (১) অর্থনীতি স্থিতিশীল করা (২) বাজার ব্যর্থতার (market failure) মোকাবিলা করা (৩) আয় এবং সম্পদের পুনর্বন্টন করা (৪) পূরণ করে নেওয়া প্রক্রিয়াকে সমৃদ্ধ করা। প্রথম কাজটির প্রয়োজন বর্তমানে খুব বেশি হয়ে পড়েছে বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতার জন্য। এর জন্য প্রয়োজন পরিকল্পনা, শিল্পনীতি এবং কাঠামোগত উন্নয়ন। দ্বিতীয়োক্ত কাজটির অর্থাৎ বাজার ব্যর্থতার মোকাবিলা করার জন্য রাষ্ট্র অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। আয় এবং সম্পদের পুনর্বন্টনের ব্যাপারে রাষ্ট্র একদিকে যেমন এর কাঠামো গড়ে তোলে অপরদিকে বিভিন্ন ধরনের অনুদান, জনকল্যাণমূলক কর্মসূচির মাধ্যমে বন্টন ব্যবস্থাকে সামাজিক ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে। রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের উপরোক্ত ক্ষেত্রসমূহের বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যায় রাষ্ট্র সমগ্র সমাজে বা সমাজের কোনো বিশেষ শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করছে কিনা।

৮১.৫ বিশ্বব্যবস্থায় অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক

কোনো দেশের অর্থনীতি, বিশেষ করে আধুনিকযুগে শুধুমাত্র সেই দেশের ভৌগোলিক কাঠামোর মধ্যেই আবদ্ধ থাকে না; তা সেই দেশের ভৌগোলিক সীমানা অতিক্রম করে বিশ্ব-অর্থনীতির অংশ হয়ে

ওঠে। স্বাভাবিকভাবেই তাত্ত্বিকগণ বিশ্বব্যবস্থায় অর্থনীতির সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক বিশ্লেষণে অগ্রসর হন। বিষয়টিকে আমরা তিনটি তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটে আলোচনা করব— (১) সাম্রাজ্যবাদী তত্ত্ব, (২) অধীনতার তত্ত্ব এবং (৩) বিশ্বব্যবস্থার তত্ত্ব।

সাম্রাজ্যবাদী তত্ত্ব ঃ সাম্রাজ্যবাদী তত্ত্বের প্রবক্তা হলেন মার্কসীয় তাত্ত্বিকগণ। যদিও ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ হবসন (Hobson)-এর রচনায় সাম্রাজ্যবাদের বিষয়টি আলোচিত হয়েছে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার স্বাভাবিক বিকাশ হিসেবে, মার্কসীয় তাত্ত্বিকগণ বিশেষত লেনিন সাম্রাজ্যবাদকে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার বিকাশের রাজনৈতিক অভিব্যক্তি হিসাবে গণ্য করেন। মার্কসীয় তাত্ত্বিকগণ মনে করেন, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিকাশের এক পর্বে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা শুধুমাত্র সেই দেশের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে না। উদ্বৃত্ত উৎপাদিত দ্রব্যের বাজারের প্রসারের জন্য অন্য দেশে দ্রব্যসম্ভার নিয়ে হাজির হয়। ঔপনিবেশিক দেশটি কাঁচামাল সরবরাহকারী দেশ হিসাবে এবং সাম্রাজ্যবাদী দেশটি শিল্পজাত দ্রব্য সরবরাহকারী দেশ হিসাবে গড়ে উঠতে থাকে। শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী দেশটির বাজার হিসাবে ঔপনিবেশিক দেশটি গড়ে ওঠে। এভাবে একটি দেশ (পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সমৃদ্ধ) অন্য দেশকে (অর্থনৈতিক দিক থেকে অনুন্নত) উপনিবেশে পরিণত করে এবং রাজনৈতিক ক্ষমতাদখলের মাধ্যমে রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হয়। লেনিন একারণে সাম্রাজ্যবাদকে পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর হিসাবে গণ্য করেন। সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর এ কারণে যে এই স্তরে পুঁজিবাদের সংকট তীব্র আকার ধারণ করে। পুঁজিবাদী দেশগুলির অন্তর্দ্বন্দ্ব, ঔপনিবেশিক দেশগুলির মুক্তি-সংগ্রাম, সাম্রাজ্যবাদের পতন এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পূর্বশর্ত সৃষ্টি করে।

অধীনতার তত্ত্ব ঃ ১৯৬০-এর দশকে মার্কসীয় তত্ত্বের প্রভাব এবং একই সঙ্গে এই তত্ত্বের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করার প্রবণতা লক্ষ করা যায় লাতিন আমেরিকার তাত্ত্বিকদের মধ্যে বিশেষ করে আন্দ্রে গুনডার ফ্রাঙ্ক (Andre Gundar Frank, 1967)-এর রচনায়। অনুন্নত দেশগুলির উন্নয়নের পথে অন্তরায়ের কারণ অন্বেষণ করতে গিয়ে ফ্রাঙ্ক অধীনতার তত্ত্ব (Dependency Theory) গড়ে তোলেন। পরবর্তীকালে এই তত্ত্বের প্রসার ঘটান আরঘিরি ইমানুয়েল (Arghiri Emmanuel, 1972), সমীর আমিন (Samir Amin, 1976), আরিঘি (Giovanut Arighi, 1978) এবং কারডোসো (Cardoso, 1973, 1977)। সাম্রাজ্যবাদের তাত্ত্বিকগণ সাম্রাজ্যবাদকে ব্যাখ্যা করেছেন ইউরোপীয়/কেন্দ্রীয় দৃষ্টিকোণ থেকে; অধীনতা তত্ত্বের প্রবক্তাগণ সাম্রাজ্যবাদকে ব্যাখ্যা করেন তৃতীয় বিশ্বের/প্রান্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে।

ফ্রাঙ্কের মতে, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির অনুন্নয়নের মূল কারণ এই নয় যে এই সমস্ত দেশগুলি আদিম বা সামন্ততান্ত্রিক বা ঐতিহ্য-অনুসারী। অষ্টাদশ শতকেও এই সমস্ত দেশগুলি (যেমন—ভারত বা চীন) ইউরোপীয় দেশগুলির উপনিবেশ হিসাবে গড়ে ওঠার আগে পর্যন্ত যথেষ্ট সমৃদ্ধ দেশ ছিল। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী শোষণ/শাসন তৃতীয় বিশ্বের এই সমস্ত উন্নত দেশগুলিকে অনুন্নত দেশে পরিণত করে। অর্থাৎ অনুন্নয়নের উন্নয়ন (Development & under development) প্রক্রিয়া শুরু হয়। সুতরাং তৃতীয়

বিশ্বের দেশগুলির অনুন্নয়ন কোনো স্বাভাবিক অবস্থা নয়; এটা সাম্রাজ্যবাদী শাসনের কৃত্রিম সৃষ্টি। অনুন্নয়নের এই প্রক্রিয়া কীভাবে কাজ করে সে বিষয়ে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ফ্রাঙ্ক মূল/কেন্দ্র/মহানগর/গ্রহের সঙ্গে প্রান্তিক/উপনগর/কৃত্রিম উপগ্রহের সম্পর্কের উল্লেখ করেন। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি যখন তৃতীয় বিশ্বে নূতন নগর গড়ে তোলে তখন তা সাম্রাজ্যবাদী দেশের মূল কেন্দ্রের উপগ্রহ/উপনগরী হিসাবে কাজ করতে থাকে। যেমন— লন্ডনের উপনগরী হিসাবে কলকাতা। কিন্তু এই কলকাতাই আবার ঔপনিবেশিক দেশের মূল/কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কলকাতাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতে থাকে অন্যান্য শহরগুলি যেমন—বর্ধমান, হুগলী, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ ইত্যাদি। এই প্রক্রিয়ায় বর্ধমান যেখানে মূল/কেন্দ্র, তাকে ঘিরে আবর্তিত হতে থাকে গ্রামাঞ্চলগুলি। এই প্রক্রিয়ায় উপনগরী/উপগ্রহ/প্রান্তিক অঞ্চলগুলি পুষ্ট করতে থাকে মূল/কেন্দ্রকে, যার সর্বোচ্চ কেন্দ্র হল সাম্রাজ্যবাদী দেশ। অর্থনৈতিক উদ্বৃত্তের নিষ্কাশনের এই প্রক্রিয়ার সাথে ক্ষমতার বিন্যাসও এই ধারাকে অনুসরণ করে আবর্তিত হতে থাকে। ঔপনিবেশিক শাসনের আওতায় নিয়ে এসে ঔপনিবেশিক সরকারকে এই শোষণের যন্ত্র হিসাবেই ব্যবহার করতে থাকে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি। ঔপনিবেশিক দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা (প্রয়োজনে কঠোর দমন-পীড়নের মাধ্যমে) কাঁচামাল দ্রুত এবং সহজমূল্যে সংগ্রহ করা এবং প্রভুত্বকারী সাম্রাজ্যবাদী দেশে নিয়ে আসা ও সাম্রাজ্যবাদী দেশ থেকে উৎপাদিত দ্রব্য নিয়ে এসে ঔপনিবেশিক দেশে (প্রান্তিক এলাকায়) পৌঁছে দেওয়া ঔপনিবেশিক সরকারের মূল দায়িত্ব। ঔপনিবেশিক শাসনকে চূড়ান্তভাবে নিয়ন্ত্রণ করার পর ঔপনিবেশিক দেশকে শাসন করার জন্য ঔপনিবেশিক দেশেরই লোকজনদের (কালা আদমিদের) ওপর দায়িত্ব দেবার ব্যাপারটি বিবেচিত হতে থাকে। সব কালা আদমিদের ওপর এই দায়িত্ব অর্পণ করার চেয়ে বাঞ্ছনীয় হল, এদের মধ্য থেকেই এক মক্কেল শ্রেণী (clientele class) গড়ে তোলা এবং এ ব্যাপারে যোগ্য হল জমিদার শ্রেণী। কারণ কৃষকবিদ্রোহ দমনে জমিদার শ্রেণীকে নির্ভর করতে হবে এই সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রীয় শক্তির ওপর। শিক্ষাব্যবস্থাকেও এর উপযোগী করে ঢেলে সাজাতে হবে। ভারতেও এভাবেই ক্ষমতার হস্তান্তর প্রক্রিয়া শুরু হয়।

ঔপনিবেশিক দেশগুলির স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরেও একই প্রক্রিয়া চলতে থাকে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবশ্য এর ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়। যেমন— একদা ঔপনিবেশিক দেশ আমেরিকা স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে চরম সাম্রাজ্যবাদী দেশে পরিণত হয়। কিন্তু বাকি প্রায় সব ঔপনিবেশিক দেশগুলি স্বাধীনতা-পরবর্তী পর্যায়ে নয়া-ঔপনিবেশিক দেশে রূপান্তরিত হয়। ফ্রাঙ্কের এই অধীনতার তত্ত্বকে এই নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে ব্যাখ্যা করার ব্যাপারে কাজে লাগালেন কারডোসো (Cardoso 1973, 1977)। বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার শিকার স্বাধীনতা-উত্তর ব্রাজিলের রাজনৈতিক ক্ষমতা বিন্যাসের চিত্রটি তুলে ধরেন কারডোসো। কারডোসোর মডেলে তিন ধরনের রাজনৈতিক কারণ (Political Actor)-এর পরিচয় পাই— সামরিক (আমলাতান্ত্রিক-প্রযুক্তিতান্ত্রিক) রাষ্ট্র, বহুজাতিক সংস্থা এবং স্থানীয় বুর্জোয়ার গোষ্ঠী।

কারডোসো ১৯৬৪ পরবর্তী ব্রাজিলের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় এই তিন গোষ্ঠীর রাজনৈতিক জোটবদ্ধতার বিষয়টি তুলে ধরেন। ১৯৬৪ পরবর্তী ব্রাজিলের রাজনৈতিক ব্যবস্থা মূলত সামরিক শাসিত। রাষ্ট্রপতির ভূমিকা, জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের এক্তিয়ার, জাতীয় ইনটেলিজেন্স সার্ভিস প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির মাধ্যমে সামরিক বাহিনী গোটা দেশের শাসন ব্যবস্থাকে কব্জা করে নেয় এবং যে কোনো ধরনের সামাজিক প্রতিবাদকে কঠোর হস্তে দমন করে; শ্রমিক সংগঠনগুলি এবং অবাঞ্ছিত রাজনৈতিক দলগুলিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে; মিশ্র অর্থনীতির (সরকারি ও বেসরকারি রাজনৈতিক সহাবস্থান) মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিকে পরিচালনা করে। জাতীয় পুঁজিপতিদের নিয়ন্ত্রণ করার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। স্বাধীনভাবে জাতীয় পুঁজি বিকাশের পরিবর্তে জাতীয় পুঁজিপতি শ্রেণী বহুজাতিক সংস্থাগুলির সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে অধীনস্থ অংশীদার হিসাবে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে বেশি আগ্রহী। কারডোসোর মতে, বহুজাতিক সংস্থাগুলি যেহেতু বাণিজ্য-পুঁজি, উন্নত প্রযুক্তির অধিকারী সেহেতু বহুজাতিক সংস্থাগুলির পক্ষে ব্রাজিলের রাজনীতি ও অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হয়ে পড়ে।

বিশ্বব্যবস্থা পরিপ্রেক্ষিত ঃ সাম্রাজ্যবাদী তত্ত্ব এবং অধীনতার তত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত ওয়ালারস্টিন (Wallerstein) বিশ্বব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বব্যবস্থার অর্থনীতির সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক বিশ্লেষণে অগ্রসর হন। ওয়ালারস্টিন অবশ্য তাঁর তত্ত্বকে তত্ত্ব বলার পরিবর্তে উনবিংশ শতকে সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার উদ্ভব এবং তাদের স্বতন্ত্র অবস্থানের বিরুদ্ধে এক 'প্রতিবাদ' বলে উল্লেখ করেন। কারণ, ওয়ালারস্টিন-এর মতে, রাজনীতি, অর্থনীতি, নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ইতিহাস ইত্যাদি শাখাসমূহের স্বতন্ত্র অবস্থান কোনো বিষয়কে জানার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

বিশ্বব্যবস্থাকে ওয়ালারস্টিন দু'ভাবে ভাগ করেন— বিশ্ব-সাম্রাজ্য-ব্যবস্থা ও বিশ্ব-অর্থ-ব্যবস্থা। ষোড়শ শতকের পূর্বে বিশ্বসাম্রাজ্য ব্যবস্থা ছিল প্রধান যেখানে সামরিক বলে বলীয়ান একটি রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্র বা রাষ্ট্র সমূহের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে। উদাহরণ হিসাবে রোমান সাম্রাজ্যের উল্লেখ করা যেতে পারে। বিশ্ব-অর্থব্যবস্থায় বিভিন্ন দেশগুলি অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বিশ্ববাজার দখলে তৎপর এবং কখনও কখনও অন্যদেশের ওপর অর্থনৈতিক আধিপত্যের সঙ্গে রাজনৈতিক আধিপত্যও বিস্তার করে। ওয়ালারস্টিনের মতে, উক্ত দুই ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য করা অত্যন্ত জরুরী। কারণ, উক্ত দুই বিশ্ব-ব্যবস্থায় অর্থনীতির সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্কের ধরন ভিন্ন। বিশ্ব-সাম্রাজ্য-ব্যবস্থায় রাজনীতিই প্রধান এবং অনেক সময় অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং পুঁজিবাদের প্রসারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এই ব্যবস্থায় যেহেতু সামরিক এবং রাজনৈতিক ক্ষমতাই প্রধান সেহেতু বণিক গোষ্ঠী/উৎপাদক শ্রেণী খুব একটা প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। বরঞ্চ যে কোনো ধরনের অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত সামরিক/রাজনৈতিক শক্তি দ্বারা অপহৃত হয়। ওয়ালারস্টিনের মতে, এই ধরনের রাষ্ট্রে এক দুষ্টচক্র দেখা যায়। রাষ্ট্রকে তার

সামরিক বাহিনীকে পুষ্ট করার জন্য অর্থসংগ্রহ আবশ্যিক হয়ে পড়ে। এর জন্য প্রয়োজন কর-ব্যবস্থা এবং কর সংগ্রহের জন্য এক বিন্যস্ত কর্মীবাহিনী। এই কর্মীবাহিনী ক্রমশ শক্তিশালী হতে থাকে এবং করের সিংহভাগই আত্মসাৎ করে। শাসক শ্রেণী বাধ্য হয় এই কর্মীবাহিনীর কাছে সরকারি পদগুলি বিক্রি করে দিতে। এভাবেই সামন্ত প্রভু/জমিদার শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। কিন্তু এভাবে ব্যয়ভার মেটানো যায় না। তাছাড়া, অভিজাত/জমিদার বাহিনীও শক্তিশালী হতে থাকে। সামরিক খাতে ব্যয় বাড়ে, কৃষকের ওপর খাজনার পরিমাণ বৃদ্ধি হতে থাকে। কৃষক অসন্তোষ বিদ্রোহের পথ প্রস্তুত করে। জমিদার/সামরিক প্রধানদের ক্ষমতাবৃদ্ধি ঘটে। পরিশেষে, সাম্রাজ্যবাদেরই পতন ঘটে।

কিন্তু ১৪৫০ খ্রিস্টাব্দ-পরবর্তী ইউরোপে দ্বিতীয় আর এক ধরনের বিশ্বব্যবস্থা গড়ে ওঠে এবং এই ব্যবস্থা হল বিশ্ব অর্থব্যবস্থা। এ ধরনের ব্যবস্থায় কোনো রাষ্ট্রের পক্ষেই সামরিক শাসনের মাধ্যমে অন্য রাষ্ট্রগুলিকে পদানত করা সম্ভবপর নয়। ইউরোপের রাষ্ট্রগুলির মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে লড়াই চলে অন্যান্য রাষ্ট্রগুলিকে পদানত করতে। যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহের জন্য শাসককে বণিকগোষ্ঠীর ওপর নির্ভরশীল হতে হয়। বণিকগোষ্ঠীও ব্যবসা বাণিজ্যের অনুকূল শর্তাদি আদায় করতে থাকে। তাছাড়া, শাসকও বণিকগোষ্ঠীকে বিভিন্ন ভাবে উৎসাহিত করতে থাকে দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনয়নের জন্য। এই ধরনের বিশ্ব অর্থনীতি ব্যবস্থায় বিভিন্ন ধরনের রাষ্ট্রের অবস্থান বিভিন্ন রকমের। একদিকে রয়েছে অর্থনৈতিক দিক থেকে সমৃদ্ধ (অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সামরিক প্রাধান্যকেও সুনিশ্চিত করে) বৃহৎ শক্তিধর রাষ্ট্রসমূহ যা মূল বা কেন্দ্র হিসাবে বিবেচিত হয়। অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে সমৃদ্ধ রাষ্ট্রসমূহ সংস্কৃতি, সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, দর্শন ইত্যাদি বিষয়েও সমৃদ্ধ হতে থাকে। ওয়ালারস্টিনের হিসাব অনুযায়ী, বিশ্ব অর্থব্যবস্থায় ১৪৫০ খ্রিঃ থেকে ১৬২০/৪০ খ্রিঃ পর্যন্ত স্পেন, ১৬০০ খ্রিঃ থেকে ১৭৫০ খ্রিঃ পর্যন্ত নেদারল্যান্ড (ফ্রান্স), ১৭৫০ খ্রিঃ থেকে ১৯১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত ব্রিটেন এবং ১৯১৭ খ্রিঃ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মূল বা কেন্দ্র হিসাবে গড়ে ওঠে। বিপরীতদিকে রয়েছে প্রান্তিক রাষ্ট্রসমূহ যা অর্থনৈতিক দিক থেকে পশ্চাৎপদ এবং ঔপনিবেশিক বা অধিকাংশ উত্তর-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রসমূহ। যেমন, স্পেনের লাতিন আমেরিকা, ব্রিটেনের ভারত। যে সমস্ত বিচ্ছিন্ন অঞ্চল, উপজাতি এলাকা, স্বতন্ত্র রাষ্ট্র ছিল সেগুলিও এই ব্যবস্থার প্রান্তিক এলাকা হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হতে থাকে। মূল বা কেন্দ্রের এবং প্রান্তিক এলাকা/রাষ্ট্রের মধ্যবর্তী আর এক ধরনের রাষ্ট্রের কথা ওয়ালারস্টিন উল্লেখ করেন। এগুলি হল প্রায়-প্রান্তিক এলাকা (Semi-Periphery State)। এই সমস্ত রাষ্ট্রগুলি মূল/কেন্দ্র রাষ্ট্রের মতো অর্থনৈতিক দিক থেকে সমৃদ্ধ নয়। আবার প্রান্তিক রাষ্ট্রের মতো দুর্বলও নয়। ইউরোপের দুর্বল রাষ্ট্রগুলি এর উদাহরণ। এই ধরনের রাষ্ট্রগুলি অধিকতর দুর্বল প্রান্তিক রাষ্ট্রগুলিকে অর্থনৈতিকভাবে শোষণ করতে থাকে। ঔপনিবেশিক পর্যায়ে উত্তর আমেরিকা ছিল প্রান্তিক রাষ্ট্র কিন্তু আমেরিকা বিপ্লবের পরবর্তী পর্যায়ে প্রায়-প্রান্তিক রাষ্ট্র এবং বিংশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে মূল/কেন্দ্র রাষ্ট্র।

কেন্দ্র ও প্রান্তিক রাষ্ট্রগুলি শুধুমাত্র অর্থনৈতিক সম্পর্কেই পারস্পরিক আবদ্ধ থাকে না; প্রান্তিক রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক কাঠামোও নিয়ন্ত্রিত হয় কেন্দ্র রাষ্ট্রের দ্বারা। বর্তমানে অধিকাংশ প্রান্তিক রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক কাঠামো নিয়ন্ত্রিত হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বারা। প্রান্তিক রাষ্ট্রগুলি থেকে অর্থনৈতিক সম্পদ প্রবাহিত হতে থাকে কেন্দ্র/মূল রাষ্ট্রের দিকে। উদ্বৃত্ত সমৃদ্ধ কেন্দ্র রাষ্ট্রের শ্রম মজুরী বেশি থাকায় মানুষের ক্রমক্ষমতাও বেশি থাকে। দেশিয় শ্রমকে শোষণ না করে প্রান্তিক রাষ্ট্রের শ্রমকে শোষণের মাধ্যমে কেন্দ্র রাষ্ট্রগুলির অর্থনৈতিক প্রাধান্য বজায় রাখে। প্রান্তিক রাষ্ট্রগুলি কাঁচামাল সরবরাহকারী উৎপাদন কেন্দ্রে পরিণত হয়। কেন্দ্র/মূল রাষ্ট্র ক্রমাগত গোটা বিশ্বকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় আনতে থাকে। যখন গোটা বিশ্ব এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় চলে আসে, আর নতুন কোনো ভূখণ্ড লুণ্ঠনের জন্য উন্মুক্ত থাকে না তখনই পুঁজিবাদের আসল সংকট শুরু হয়। ওয়ালারস্টিন অবশ্য এখানে আশাবাদী। কারণ তিনি বিশ্বাস করেন, বিশ্বপুঁজির সংকট বিশ্ব সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পটভূমি তৈরি করে।

৮১.৬ সারাংশ

অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যেকার সম্পর্কের বিষয়টি কার্ল মার্কস-পূর্ববর্তী তাত্ত্বিকগণের রচনায় আলোচিত হলেও এ ব্যাপারে প্রথম শৃঙ্খলাবদ্ধ বিশ্লেষণ করেন কার্ল মার্কস। কার্ল মার্কস-এর মতে, অর্থনীতির সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। যে কোনো সমাজ কাঠামোয় রাজনৈতিক ব্যবস্থায় তার অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিফলন ঘটে। উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ সমাজে যে উৎপাদন উপকরণের ব্যক্তিগত মালিকানার সৃষ্টি করে; সেই ব্যক্তিগত মালিকানাকে কেন্দ্র করে উৎপাদন সম্পর্ক মানুষকে দুটি মূল শ্রেণীতে বিভক্ত করে। একটি শ্রেণী মালিক বা অন্য উপায়ে উৎপাদন উপকরণ নিয়ন্ত্রণ করে এবং অন্য শ্রেণী তথা শ্রমিকশ্রেণী উৎপাদন উপকরণের মালিকানা ভোগ না করলেও শ্রমশক্তির সাহায্যে উৎপাদনে অংশগ্রহণ করে। এই দুই শ্রেণীর অবস্থান পরস্পরবিরোধী যেহেতু এদের স্বার্থ পরস্পরবিরোধী। এই পরস্পরবিরোধী অবস্থান শ্রেণীদ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। এই শ্রেণীদ্বন্দ্বকে প্রশমিত করে ব্যক্তিগত মালিকানা সুনিশ্চিতকরণের জন্য কতকগুলি নিয়মকানুন ও বলপ্রয়োগকারী সংস্থার প্রয়োজন। রাষ্ট্র হল এরকম এক বলপ্রয়োগকারী সংস্থা বা বলা যায় শ্রেণীশোষণের হাতিয়ার। বস্তুত, যে কোনো সমাজকাঠামোয় উৎপাদন সম্পর্কের এই সামগ্রিক অবস্থা সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো বা ভিত তৈরি করে এবং যার ওপর আইনগত ও রাজনৈতিক উপরিকাঠামো এবং তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ সামাজিক সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। অর্থনীতি রাজনীতির প্রকৃতিকে সুনিশ্চিত করে তিনভাবে— (১) শ্রেণী ও শ্রেণীদ্বন্দ্বের উপস্থিতি (২) মতাদর্শ ও বৌদ্ধিক উৎপাদনের উপায় সমূহ (৩) রাজনৈতিক গতিশীলতার বস্তুগত উপায়সমূহ।

কার্ল মার্কস-এর রচনার এক ভিন্ন পাঠ লক্ষ করা যায় যেখানে রাজনীতির আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্যের বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। এ ব্যাপারে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন পুলানৎজাস। অবশ্য রাষ্ট্র সম্পর্কে কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো (১৮৪৮) বর্ণিত মডেলটিতে রাষ্ট্রের আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্যের বিষয়টি উপেক্ষিত হলেও The Eighteenth Brummair of Louis Bonaparte (1852) এবং Civil War in France (1870) গ্রন্থে কার্ল মার্কস রাষ্ট্রের আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্যের বিষয়টি উল্লেখ করেন। প্রথমোক্ত গ্রন্থে (১৮৫২) কার্ল মার্কস তিনটি পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রের আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার বিষয়ে উল্লেখ করেন। (১) শাসকশ্রেণীর মধ্যেকার বিরোধে যখন শাসকশ্রেণী দুর্বল, এককভাবে আধিপত্য বিস্তারে অক্ষম। (২) যদি সমাজে মূল দুই শ্রেণীর মধ্যেকার দ্বন্দ্ব তীব্রতর হয় তবে কোনো পক্ষই জয়লাভে সক্ষম হয় না, (৩) যদি এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যখন পুঁজিপতি শ্রেণী ক্ষমতা হারিয়েছে কিন্তু শ্রমিকশ্রেণী ক্ষমতা দখল করতে পারছে না — তখন রাষ্ট্র আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়। দ্বিতীয়োক্ত গ্রন্থে (১৮৭০) মার্কস সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতকে ফ্রান্সে রাষ্ট্রের আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্যের বিষয়টি তুলে ধরেন। কার্ল মার্কস-এর এই বিশ্লেষণকে অনুসরণ করে পুলানৎজাস বলেন, বিভিন্ন ধরনের উৎপাদন পদ্ধতি বা অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা এক ধরনের উৎপাদন ব্যবস্থা। আধুনিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পুঁজির মধ্যেকার বিভিন্ন ধরনের সংগ্রামের মধ্য থেকে রাষ্ট্র সমাজকে ধরে রাখার চেষ্টা করে এর ফলে প্রয়োজন অনুযায়ী রাষ্ট্রকে অর্থনৈতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ যেমন করতে হয়। কাঠামোগত দিক থেকেও এক স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হিসাবে নিজেকে গড়ে তোলে।

অ-মার্কসীয় তাত্ত্বিকগণের বিশ্লেষণ ঃ অ-মার্কসীয় তাত্ত্বিকগণের মধ্যে একদল রয়েছেন যাঁরা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের বিশেষত গণতন্ত্রের প্রকৃতি যে অর্থনৈতিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল তার উল্লেখ করেন। যেমন, লিপসেট (Lipset)-এর রচনায় দেখা যায়, কোনো দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি যতবেশি হবে সেই দেশের গণতন্ত্রও ততবেশি সুরক্ষিত হবে। আর একদল তাত্ত্বিক রয়েছেন যাঁরা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানকে স্বাধীন স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হিসাবে ধরে নিয়ে উভয় ধরনের প্রতিষ্ঠানের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ে অগ্রসর হন। এই দলে রয়েছেন ফ্রেড ব্লক, জেমস ও' কুনার।

নয়া-প্রাতিষ্ঠানিক প্রবক্তাদের বক্তব্য ঃ নয়া-প্রাতিষ্ঠানিক অর্থনীতির অন্যতম প্রবক্তা Heba Handoussa অর্থনীতিতে চার ধরনের রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের কথা বলেন। (১) অর্থনীতিকে স্থিতিশীল করা, (২) বাজার ব্যর্থতাকে সঠিক করা, (৩) আয় এবং সম্পদের পুনর্বন্টন করা এবং (৪) পূরণ করে নেওয়া প্রক্রিয়াকে সমৃদ্ধ করা।

৮১.৭ অনুশীলনী

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

১) অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পারস্পরিক সম্পর্কের ধরন বিশ্লেষণ করুন।

২) অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপারে মার্কসীয় তত্ত্ব বিশ্লেষণ করুন।

৩) অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপারে নয়া-প্রাতিষ্ঠানিক অর্থনীতির প্রবক্তাদের বক্তব্য উল্লেখ করুন।

৪) বিশ্বব্যবস্থায় অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন ঃ

১) রাষ্ট্রের আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্যের ধারণাটি ব্যাখ্যা করুন।

২) অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণে জেমস ও কুনারের বক্তব্য উপস্থাপন করুন।

৩) অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্পর্কের ব্যাপারে লিপসেট-এর বক্তব্য বিশ্লেষণ করুন।

৪) বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় প্রান্তিক রাষ্ট্রগুলির অবস্থান সম্পর্কে ওয়ালারস্টিনের বক্তব্য উল্লেখ করুন।

৮১.৮ গ্রন্থপঞ্জী

1. Alvin Y. So (1990) — Social Change and Development. California, Sage Puler.
2. J. Harris, J. Hunter and C.M. Lewis (ed.) (1995) — The New Institutional Economics and Third World Development. London, Routledge.
3. Randall Collins (1997 Indian Edn.) — Theoretical Sociology. Jaipur, Rowat Pub.
4. Warren J. Samuels (1992) — Essays in the History of Heterodox Political Economy. London. Macmillan.

একক ৮২ □ রাজনৈতিক দলসমূহ ঃ রাজনৈতিক দলসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক তাৎপর্য

গঠন

৮২.০ উদ্দেশ্য

৮২.১ প্রস্তাবনা

৮২.২ রাজনৈতিক দলের উদ্ভবের প্রেক্ষাপট

৮২.৩ রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা

৮২.৪ রাজনৈতিক দলের বৈশিষ্ট্য

৮২.৫ রাজনৈতিক দলের শ্রেণীবিভাগ

৮২.৬ রাজনৈতিক দলের কার্যাবলী

৮২.৭ রাজনৈতিক দলের ভূমিকা

৮২.৭.১ রাজনৈতিক ব্যবস্থা নির্বিশেষে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা

৮২.৭.২ রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা

৮২.৭.২.১ প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দল

৮২.৭.২.২. কর্তৃত্বকারী রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাজনৈতিক দল

৮২.৭.২.৩ সদ্য-প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দল

৮২.৮ রাজনৈতিক দলের ভবিষ্যৎ

৮২.৯ সারাংশ

৮২.১০ অনুশীলনী

৮২.১১ গ্রন্থপঞ্জী

৮২.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি রাজনৈতিক দলসমূহের উদ্ভব, শ্রেণীবিভাগ, কার্যাবলী ও ভূমিকা সম্পর্কে পরিচিত করানোর জন্য লিখিত হয়েছে। এই এককটি পাঠের মাধ্যমে আমরা যে বিষয়গুলি সম্পর্কে জানতে পারব তা হল—

- রাজনৈতিক দলের উদ্ভবের প্রেক্ষাপট,
- রাজনৈতিক দল বলত কী বুঝায়,
- রাজনৈতিক দলের শ্রেণীবিভাগ,
- রাজনৈতিক দলের কার্যাবলী,
- রাজনৈতিক দলের ভূমিকা,
- আজকের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব সম্পর্কে যে সংশয় দেখা দিয়েছে সে সম্পর্কে মতামত তৈরি করা।

৮২.১ প্রস্তাবনা

আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হল রাজনৈতিক দল। উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অস্তিত্ব রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব ছাড়া কল্পনাই করা যায় না। কর্তৃত্বমূলক রাজনৈতিক ব্যবস্থাও রাজনৈতিক দলকে নির্মূল করতে সক্ষম হয়নি। কমিউনিস্ট রাষ্ট্রব্যবস্থাতে আবার কমিউনিস্ট দলকে সমাজ পরিবর্তনের মুখ্য দায়িত্ব নিতে হয়। অপরদিকে, দলীয় কোন্দল, দুর্নীতি, উৎকোচগ্রহণ, রাজনৈতিক দলের সঙ্গে অপরাধ-জগতের সম্পর্ক, রাজনৈতিক দলগুলির আমলাতান্ত্রিক চেহারা, মতাদর্শের চেয়ে ক্ষমতার প্রাধান্য প্রভৃতি বিষয়গুলি রাজনৈতিক দল সম্পর্কে মানুষের মনে এক বিরূপতা সৃষ্টি করেছে। অথচ রাজনৈতিক দল নিরপেক্ষ কোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থার কথা আজকের যুগে চিন্তাই করা যায় না। একমাত্র রাজনৈতিক দলই পুরসমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে, ব্যক্তির আশা-আকাঙ্ক্ষাকে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচির মাধ্যমে বাস্তবায়নে সাহায্য করে, সমাজ-পরিবর্তনের আন্দোলনে অনুপ্রেরণা যোগায়। এ কারণে আজকের সমাজজীবনে রাজনৈতিক দলের উপস্থিতি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

৮২.২ রাজনৈতিক দলের উদ্ভবের প্রেক্ষাপট

আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হল রাজনৈতিক দল। বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্রই পরিচালিত হচ্ছে রাজনৈতিক দল কর্তৃক, অথচ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে রাজনৈতিক দলের উদ্ভব মাত্র দু'শো বছর। ইংল্যান্ডেই প্রথম রাজনৈতিক দলের উদ্ভব হয়। অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্বে 'Tory' এবং 'Whig' গোষ্ঠীর মধ্যে জোরালো রাজনৈতিক সংগঠনগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয়। রাজা তৃতীয় জর্জ-এর আমল থেকেই ঐ দলীয় রাজনীতি প্রবল হয়ে ওঠে। তাই ঐ সময়ের বিশিষ্ট রাষ্ট্র-দার্শনিক এডমন্ড বার্ক (Burke)-এর লেখায় রাজনৈতিক দলের প্রসঙ্গ প্রকাশ পেয়েছে। ফ্রান্স বা ইউরোপের অন্যান্য দেশে আইনসভার ছোট ছোট উপগোষ্ঠীগুলি (cliques) ১৮৪৮-এর পর থেকে রাজনৈতিক দল

হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে জাপানে ১৮৬৭ খ্রিঃ আধুনিক অর্থে রাজনৈতিক দলের উদ্ভব। ভারতে জাতীয় কংগ্রেস-এর সৃষ্টি হয় ১৮৮৫ খ্রিঃ।

উনবিংশ শতকের পূর্বে বা বলা যায় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু হবার পূর্বে রাষ্ট্রকর্তৃত্বকে (অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাজতন্ত্র) ঘিরে সভাষদ বা পারিষদ-এর মতো ছোট ছোট গোষ্ঠী/সংস্থার অস্তিত্ব থাকলেও তাকে আধুনিক আর্থ-রাজনৈতিক দল বলা যায় না। রোমান যুগে প্লেবিয়ান বা প্যাট্রিসিয়ান, ইংল্যান্ডে পরবর্তীকালে ক্যাভেলিয়র (Cavalier) গোষ্ঠী ছিল রাষ্ট্রকর্তৃত্বের উপর প্রভাব বা প্রাধান্য বিস্তারের জন্য সক্রিয় গোষ্ঠী; কিন্তু সাংগঠনিক ব্যবস্থা বা সুসংবদ্ধ মতাদর্শের ভিত্তিতে এই গোষ্ঠীগুলি গড়ে ওঠেনি। প্রতিনিধিত্বমূলক রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে নির্বাচন ব্যবস্থাকে ঘিরে গড়ে উঠতে থাকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলসমূহ। মরিস দুভারজার (Maurice Duverger–1954)-এর মতে, রাজনৈতিক দল গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে সংসদীয় গোষ্ঠী, বিভিন্ন ক্লাব, নির্বাচনী কমিটি প্রভৃতি সংস্থাগুলির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুত, রাজনৈতিক দল গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে এক বিবর্তন প্রক্রিয়া লক্ষ করা যায়। যেমন, বিভিন্ন ক্লাব ⟶ সংসদীয় গোষ্ঠী ⟶ নির্বাচনী কমিটি ⟶ রাজনৈতিক দল। এই বিবর্তনের ক্ষেত্রে সব সময় যে মতাদর্শ কাজ করেছে তা নয়। অনেক ক্ষেত্রে ভৌগোলিক নৈকট্য, কোনো ব্যক্তির উচ্চাকাঙ্ক্ষাও দলগঠনে সহায়ক হয়েছে। উদাহরণ হিসাবে দুভারজার ১৭৮৯ খ্রিঃ ফ্রান্সের গণপরিষদে দল ব্যবস্থার উদ্ভবের বিষয়টি উল্লেখ করেন। ১৭৮৯ খ্রিঃ এপ্রিলে বিভিন্ন প্রদেশ থেকে এস্টেট জেনারেল প্রতিনিধিবৃন্দ ভার্সাই-এ সমবেত হতে থাকেন। কিন্তু দেখা গেল সদস্যগণ সমবেতভাবে বৈঠকের পরিবর্তে পৃথক পৃথক প্রদেশের সদস্যগণ পৃথকভাবে বৈঠক করেছেন প্রাদেশিক স্বার্থরক্ষার কারণে বা পৃথক অস্তিত্ব বজায় রাখার তাগিদে। ব্রেটন-এর প্রতিনিধিরা পানশালার (Cafe) একটি কক্ষ ভাড়া করে সেখানেই নিয়মিতভাবে নিজেদের মধ্যে বৈঠক শুরু করেন। কিন্তু অচিরেই তাঁরা উপলব্ধি করলেন যে শুধুমাত্র প্রাদেশিক স্বার্থই নয়, জাতীয় মৌলিক প্রশ্নেও তাঁদের অবহিত হওয়ার প্রয়োজন এবং একারণে তাঁরা অন্যান্য প্রদেশের সমমনোভাবাপন্ন প্রতিনিধিদের আহ্বান জানাতে থাকেন। এভাবেই গড়ে ওঠে 'ব্রেটন ক্লাব'। যখন সংসদ ভার্সাই থেকে প্যারিস-এ স্থানান্তরিত হল তখন প্রয়োজন দেখা দিল এক নতুন আস্তানার। সে সময় যেহেতু পানশালায় কোনো কক্ষ পাওয়া গেল না সেহেতু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা একটি মঠের ভোজনকক্ষ ভাড়া নেন এবং এই মঠের নাম অনুসারে 'ব্রেটন ক্লাব'-এর নাম পরিবর্তিত হয়ে নতুন নামকরণ হয় 'জ্যাকোবিন' (Jacobin)। আমরা অনেকেই 'ব্রেটন ক্লাব'-এর নাম হয়ত শুনিনি কিন্তু 'জ্যাকোবিন' নামটির সঙ্গে আমরা সকলেই কমবেশি পরিচিত। ভারতেও জাতীয় কংগ্রেস গড়ে ওঠার পিছনে ল্যান্ড হোল্ডারস এ্যাসোসিয়েশন, ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন বা এ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম-এর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এবং প্রথমদিকে জাতীয় কংগ্রেস ছিল ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে অর্থাৎ বড়দিনের সময়কালীন এক ক্লাবস্বরূপ। পরবর্তীকালে জাতীয় কংগ্রেস বছরের কয়েকদিনের এক সম্মেলন সংস্থার পরিবর্তে

জাতীয় রাজনৈতিক দলে রূপান্তরিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও রাজনৈতিক দল গড়ে ওঠার পিছনে নির্বাচনী কমিটি (বিশেষ করে রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচিত করার জন্য) ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অবশ্য সংসদীয় এবং নির্বাচনমূলক ব্যবস্থার বাইরেও রাজনৈতিক দলের উদ্ভব ঘটেছে। যেমন, বেশ কিছু সমাজতন্ত্রী দলের উদ্ভব ঘটেছে শ্রমিক সংগঠন থেকে। আবার, শ্রমিক দল (Labour Party) গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে ফেবীয় সমাজতন্ত্রীদের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনেকক্ষেত্রে ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলি এবং আঞ্চলিক গোষ্ঠীগুলি রাজনৈতিক দল গঠনের ক্ষেত্রে সক্রিয় থেকেছে। ক্যাথলিক কনজারভেটিভ পার্টি (Catholic Conservative Party) বা প্রোটেস্টান্টদের দ্বারা গড়ে ওঠা খ্রিস্টান পার্টির (Christian Party) নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। বর্তমানে সুস্থ ও নির্মল পরিবেশ বজায় রাখার উদ্দেশ্যে সৃষ্ট গ্রীণ পার্টিগুলিও রাজনৈতিক দলে রূপান্তরিত হয়েছে। সদ্যস্বাধীন দেশগুলিতে রাজনৈতিক আধুনিকীকরণ বা রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য আদায়ের লড়াই-এ বা সমাজ পরিবর্তনের কারণে রাজনৈতিক দলের উদ্ভব ঘটতে থাকে। সুতরাং বলা যেতে পারে, রাজনৈতিক দলের উদ্ভব ঘটেছে কোনো সংস্থার বিবর্তনের মধ্য দিয়ে অথবা সৃষ্ট হয়েছে কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, কোনো বিশেষ সময়ে কোনো গোষ্ঠী/সম্প্রদায় কর্তৃক।

৮২.৩ রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা

রাজনৈতিক দলের উদ্ভবের পিছনে যেমন কোনো কারণকে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিতকরণ করা যায় না, রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা প্রদানের ক্ষেত্রেও সেরূপ কোনো সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা প্রদান করা সম্ভবপর নয়। বিভিন্ন প্রকার রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের উদ্ভব, প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য এবং ভূমিকা পালনের ভিন্নতা হেতু রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা প্রদানের ক্ষেত্রেও ভিন্নতা দেখা দেয়। তাত্ত্বিকগণ রাজনৈতিক দলকে মূলত এর কাঠামো, লক্ষ্য, আদর্শ ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের পদ্ধতি প্রভৃতি দৃষ্টিকোণ থেকে সংজ্ঞা প্রদানে সচেষ্ট হয়েছেন। প্রথমদিকের তাত্ত্বিকগণ রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা প্রদানের ক্ষেত্রে মতাদর্শ/নীতির ওপর গুরুত্ব দিতেন। ম্যাকাইভার রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে কোনো সংঘবদ্ধ জনসমাজ বৈধ উপায়ে শাসনক্ষমতা দখল করতে চেষ্টা করলে তাকে রাজনৈতিক দল বলে। দুভারজার মনে করেন, এ ধরনের সংজ্ঞা প্রদানের ক্ষেত্রে উদারনৈতিক ধারণাই প্রভাব বিস্তার করেছে। তাছাড়া, এ ধরনের সংজ্ঞায়িত করণের ফলে রাজনৈতিক দলের সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের পরিবর্তে রাজনৈতিক ধারণার ইতিহাস রচনার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। ১৮১৬ খ্রিঃ বেঞ্জামিন কনস্টান্ট রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেন, (রাজনৈতিক) দল হল একই রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী কতিপয় ব্যক্তির এক গোষ্ঠী। অথচ ১৭৬০ খ্রিঃ ডেভিড হিউম দলের আলোচনা প্রসঙ্গে (Essay on Parties) মন্তব্য করেন যে, সূচনাপর্বে অর্থাৎ যখন বিক্ষিপ্ত ব্যক্তিদের সমষ্টিকরণের প্রয়োজন, কর্মসূচি এক অত্যাবশ্যক

ভূমিকা পালন করলেও পরবর্তীকালে সংগঠনই প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। দুভারজারও মনে করেন, বিংশ শতকে রাজনৈতিক দলের বিশেষত্ব হল তার কাঠামো। মতাদর্শ বা শ্রেণী অবস্থানের চেয়েও বর্তমানে রাজনৈতিক দলগুলির পৃথক অবস্থানকে সহজে চেনা যায় তার কাঠামোগত দিক থেকে। দুভারজার-এর কাছে দল হল বিশেষ ধরনের কাঠামো সমন্বিত এক সম্প্রদায়।

রাজনৈতিক মতাদর্শের পরিবর্তে রাজনৈতিক কার্যকারিতার ভিত্তিতে সংজ্ঞা প্রদানের প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায় আর একদল তাত্ত্বিকদের মধ্যে। এই সমস্ত তাত্ত্বিকদের কাছে রাজনৈতিক দল হল সেই গোষ্ঠী যা নির্বাচনী ব্যবস্থার মাধ্যমে বা ভিন্ন উপায়ে ক্ষমতা দখল করে রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশ নেয়। অ্যালান বল (Alan Ball – Modern Politics and Government)-এর মতে, 'রাজনৈতিক দলগুলি হয় এককভাবে অথবা অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির সহযোগিতায় রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করতে চায়।' ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যই রাজনৈতিক দলকে অন্যান্য দল থেকে পৃথক করে। কোলম্যান (Coleman) এবং রসবার্গ (Rosberg)-এর মতে, রাজনৈতিক দলসমূহ হল সেই সমস্ত সংগঠন যা হয় এককভাবে অথবা জোটবদ্ধভাবে অথবা অনুরূপ সংগঠনের সঙ্গে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে কোনো নির্দিষ্ট বা প্রত্যাশিত সার্বভৌম রাষ্ট্রের সরকারি কর্মীবৃন্দের ও নীতিসমূহের উপর আইনগত নিয়ন্ত্রণ দখলের অথবা নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার সুস্পষ্ট এবং ঘোষিত উদ্দেশ্য নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত। সিগমন্ড নিউম্যান-এর মতে, আমরা সাধারণত রাজনৈতিক দল বলতে বুঝি সেই ধরনের সংগঠন যা সরকারি ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণে ইচ্ছুক এবং জনসমর্থন আদায়ের জন্য ভিন্ন মতাদর্শে বিশ্বাসী অন্যান্য গোষ্ঠী বা গোষ্ঠীসমূহের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সমাজের সক্রিয় রাজনৈতিক এজেন্টদের সুসংবদ্ধভাবে আত্মপ্রকাশে সক্ষম।

এডমন্ড বার্ক জাতীয় স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা দেন। তাঁর মতে, কোনো নির্দিষ্ট সম্মত নীতির ভিত্তিতে এবং যৌথ চেষ্টার মাধ্যমে জাতীয় স্বার্থের উন্নতিকল্পে ঐক্যবদ্ধ জনসমষ্টিকে রাজনৈতিক দল নামে অভিহিত করা যায়। "a body of men united, for promoting by their joint endeavours the national interest, upon some particular principle in which they are all agreed." —E. Burke. রাজনৈতিক দলের ধ্রুপদী সংজ্ঞা হিসাবে বার্ক-এর সংজ্ঞাটি গুরুত্ব পেয়ে থাকে। আচরণবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা দেন স্যামুয়েল এন্ডারসভেল্ড – রাজনৈতিক দল হল একটি সামাজিক গোষ্ঠী, এক বৃহত্তর সমাজের মধ্যে এক অর্থপূর্ণ ও বিন্যস্ত ক্রিয়াকর্মের ব্যবস্থা। নির্দিষ্ট ভূমিকা সম্পাদনকারী ব্যক্তিবর্গ নিয়ে এটি গঠিত এবং এদের সনাক্তকরণ করা যায় সামাজিক সংগঠনের ভূমিকা পালনকারী সদস্য হিসাবে।

মার্কসীয় তাত্ত্বিকগণ রাজনৈতিক দলকে মতাদর্শ বা সরকারি কার্য পরিচালনায় অংশগ্রহণকারী সংগঠন হিসাবে না দেখে শ্রেণী প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করেন। ব্যক্তির জীবিকা, উৎপাদন প্রক্রিয়ায়

অংশগ্রহণের ধরন প্রভৃতি বিষয়গুলি রাজনৈতিক দলের বিশ্লেষণে মুখ্য আলোচ্য বিষয়। বৈষম্যমূলক সমাজে রাজনৈতিক দল কোনও বিশেষ শ্রেণীস্বার্থের বাহক হিসাবে কাজ করে।

৮২.৪ রাজনৈতিক দলের বৈশিষ্ট্য

বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের উদ্ভব, কাঠামো, আদর্শ, কর্মসূচি ও কর্মসূচি রূপায়ণের ভিন্নতা হেতু রাজনৈতিক দলের বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতা দেখা যায়। কিন্তু এই ভিন্নতা সত্ত্বেও একটা রাজনৈতিক ব্যবস্থার উপকাঠামো হিসাবে রাজনৈতিক দলের কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা যেতে পারে।

(এক) সাধারণত একই মতাদর্শে অনুপ্রাণিত, ঐক্যবদ্ধ ব্যক্তিদের নিয়ে রাজনৈতিক দল গড়ে ওঠে। কিন্তু এই বৈশিষ্ট্য আবশ্যিক নয়। কারণ, স্বার্থের ভিন্নতা এবং দলে ব্যক্তির প্রাধান্য হেতু কোনো কোনো রাজনৈতিক দলের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত ব্যক্তিসমষ্টির অভাব দেখা যায়। সম্প্রতি ভারতে কংগ্রেস রাজনৈতিক দল এর অন্যতম উদাহরণ।

(দুই) রাজনৈতিক দল যেমন দলীয় সদস্যদের মধ্যে ঐক্যবোধ গড়ে তোলে তেমন এই ঐক্যবোধই অন্য রাজনৈতিক দল থেকে সেই রাজনৈতিক দলের ভিন্নতা সৃষ্টি করে।

(তিন) প্রতিটি রাজনৈতিক দলের কোনো না কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শ থাকে।

(চার) রাজনৈতিক মতাদর্শকে কেন্দ্র করে প্রতিটি রাজনৈতিক দল কয়েকটি কর্মসূচি গ্রহণ করে এবং এই কর্মসূচিকে বাস্তবায়িত করার জন্য নিয়মতান্ত্রিক ও সংবিধান সম্মত পদ্ধতিতে অগ্রসর হয়। পশ্চিমি উদারনৈতিক তাত্ত্বিকগণ যেহেতু বৈপ্লবিক উপায়ে শাসকশ্রেণীর পরিবর্তন ঘটানোর বিরোধী সেহেতু সংবিধান বহির্ভূত উপায়ে শাসকশ্রেণীর উচ্ছেদ ঘটানোর জন্য তৈরি দলগুলিকে তাঁরা রাজনৈতিক দল হিসাবে স্বীকৃতি প্রদানে অনিচ্ছুক।

(পাঁচ) প্রতিটি রাজনৈতিক দলেরই এক অপেক্ষাকৃত স্থায়ী ও সংহত দলীয় সংগঠন থাকে। এই দলীয় সংগঠন পরিচালনার জন্য দলে আভ্যন্তরীণ ক্ষমতার বিন্যাস লক্ষ করা যায়।

(ছয়) বর্তমান রাজনৈতিক ব্যবস্থা গণমুখী হওয়ায় প্রতিটি রাজনৈতিক দলই গণসমর্থনে সচেষ্ট হয়। এবং একারণে প্রচার মাধ্যমের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়।

(সাত) প্রতিটি রাজনৈতিক দল কোনো বিশেষ মতাদর্শ ও স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত হলেও জাতীয় স্বার্থের বিষয়টি সামনে রাখার চেষ্টা করে। কারণ, কোনো রাজনৈতিক দলেরই সদস্য সংখ্যা অপরিবর্তনীয় নয়। সুতরাং অন্যান্যদের আকৃষ্ট করার জন্য জাতীয় স্বার্থের বিষয়টি সামনে রেখে ব্যাপক জনসমর্থন আদায়ে সচেষ্ট হয়।

৮২.৫ রাজনৈতিক দলের শ্রেণীবিভাগ

রাজনৈতিক দল সমাজকাঠামোর এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এর প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য, কার্যাবলী এবং ভূমিকা সমাজ পরিবর্তনের মতোই সদা পরিবর্তনশীল। একারণে রাজনৈতিক দলের শ্রেণী বিভাজনের জন্য কোনো স্থায়ী শাশ্বত মানদণ্ড নির্ধারণ করা সম্ভবপর নয়। ফলে তাত্ত্বিকদের মধ্যে রাজনৈতিক দলের শ্রেণী বিভাজনের প্রশ্নে ভিন্নতা দেখা যায়। রাজনৈতিক দল যেহেতু একদিকে সমাজের/রাষ্ট্রের সঙ্গে অপরদিকে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সঙ্গে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত সেহেতু রাজনৈতিক দলের পরিবর্তে অনেক তাত্ত্বিক রাজনৈতিক দলব্যবস্থার শ্রেণী বিভাজন করেছেন।

মরিস দুভারজার (Maurice Duverger (1954)–Political Parties) রাজনৈতিক দল ও দলব্যবস্থার যে শ্রেণীবিভাগ করেন তা অত্যন্ত ব্যাপক, বহুমুখী ও জটিল। তিনি (ক) রাজনৈতিক দলগুলির শক্তি (খ) দলীয় সদস্যের প্রকৃতি (গ) উপাদান এবং (ঘ) রাজনৈতিক দলের সংখ্যার ভিত্তিতে রাজনৈতিক দলের শ্রেণীবিভাজনে অগ্রসর হন।

(ক) রাজনৈতিক দলগুলির শক্তির ভিত্তিতে বিভাজন ঃ রাজনৈতিক শক্তি বলতে দুভারজার কোনো দলের সংসদে আসনসংখ্যা, সদস্যপদ ও নির্বাচকমণ্ডলীকে বুঝিয়েছেন। উপরোক্ত তিন মানদণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক দলগুলিকে দুভারজার তিনভাগে ভাগ করেন— (১) সংখ্যাগরিষ্ঠপ্রবণ দল (Parties with a Majority Bent), (২) প্রধান দলসমূহ (Major Parties) এবং (৩) ছোটখাটো দল (Minor Parties)। সংখ্যাগরিষ্ঠপ্রবণ দল বলতে দুভারজার সেই সমস্ত দলকে বুঝিয়েছেন যা সংসদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার অধিকারী অথবা প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় কোনো একদিন সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভে নিশ্চিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ডেমোক্রেটিক পার্টি এবং রিপাবলিকান পার্টি হল সংখ্যাগরিষ্ঠপ্রবণ দলের উদাহরণ। ভারতে ১৯৬৭-র পূর্বে জাতীয় কংগ্রেস এবং ১৯৭৭ পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গে সি পি আই (এম) সংখ্যাগরিষ্ঠপ্রবণ দল। প্রধান দলসমূহ হল সেই সমস্ত দল যা এককভাবে ক্ষমতা লাভ করতে পারে না এবং ব্যতিক্রমধর্মী কোনো পরিস্থিতির সুযোগে ক্ষমতাধীন হলেও অন্য কোনো দল বা দলসমূহের সমর্থন নিয়ে শাসন ক্ষমতা দখল করে। দুভারজার-এর মতে, ক্ষমতা লাভের আশায় প্রধান দলসমূহ নির্বাচকমণ্ডলীকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেয়। প্রধান দলের সঙ্গে সংখ্যাগরিষ্ঠপ্রবণ দলের পার্থক্য করা বেশ কঠিন। কারণ, প্রধান দল পরিণত হতে পারে সংখ্যাগরিষ্ঠপ্রবণ দলে। আবার, সংখ্যাগরিষ্ঠপ্রবণ দল পরিণত হতে পারে প্রধান দলে। যেমন, নরওয়ের সমাজতন্ত্রী দলকে ১৯৩৩ খ্রিঃ প্রধান দল হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। কারণ, সে সময়ে সংসদে এই দলের আসন সংখ্যা ছিল ৬৯। অথচ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের জন্য প্রয়োজন ৭৬টি আসনের। কিন্তু ১৯৪৫ খ্রিঃ যখন দলটি সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে তখন দলটি পরিণত হয় সংখ্যাগরিষ্ঠপ্রবণ দলে। ভারতে ১৯৭৭ পরবর্তী

পর্যায়ে জাতীয় কংগ্রেসকে প্রধান দল হিসাবে গণ্য করা যায় অথচ ১৯৬৭-র পূর্বে ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রবণ দল। ছোটখাটো দল বলতে দুভারজার সেই সমস্ত দলগুলিকে বুঝিয়েছেন যা খুবই দুর্বল এবং গুরুত্বহীন। এই সমস্ত দলের আইনসভার আসনসংখ্যা খুবই কম থাকায় সরকারের শরিক হিসাবে অথবা বিরোধী দল হিসাবে উল্লেখযোগ্য কোনো ভূমিকাই পালন করতে পারে না। কখনও কখনও ক্ষমতার শরিক দল হিসাবে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ দু'একটি মন্ত্রীত্ব নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। অথবা বিরোধী দল হিসাবে অর্থহীন ও অবাস্তব সমালোচনা করে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে চেষ্টা করে। এই ধরনের ছোটোখাটো দলগুলিকে আবার দুভারজার দুভাগে ভাগ করেন—ব্যক্তিকেন্দ্রিক দল এবং অপেক্ষাকৃত স্থায়ী রাজনৈতিক দল। পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল কংগ্রেস ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং আর.এস.পি.-কে অপেক্ষাকৃত স্থায়ীদল হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

উপরোক্ত তিন ধরনের দল ছাড়াও দুভারজার মাঝারি ধরনের দলের (Medium Parties) উল্লেখ করেন। মাঝারি ধরনের দল হল প্রধান দল ও ছোটখাটো দলগুলির মাঝখানে অবস্থিত। ছোটখাটো দলগুলির তুলনায় এর গুরুত্ব বেশি কিন্তু কখনই তা প্রধান দলগুলির সমকক্ষ নয়। মাঝারি ধরনের দলের উদাহরণ হিসাবে দুভারজার, ১৯০৯ থেকে ১৯৩৬ খ্রিঃ পর্যন্ত বেলজিয়াম-এর লিবারেল পার্টির উল্লেখ করেন। কারণ, এ সময় ঐ দলের সদস্যসংখ্যা ছিল ১০ শতাংশ থেকে ১৬.৫ শতাংশ। অথচ প্রধান দল হিসাবে সমাজতন্ত্রী ও ক্যাথলিক দলের সদস্য সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৩১ শতাংশ এবং ৪২ শতাংশ-এর কাছাকাছি।

দলীর সদস্যের প্রকৃতির ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাজন ঃ দলীয় সদস্যের প্রকৃতির ভিত্তিতে দুভারজার রাজনৈতিক দলগুলিকে দুভাগে ভাগ করেন— ক্যাডার পার্টি (Cadre Party) এবং ম্যাস পার্টি (Mass Party)। উদ্ভবগত অর্থে ক্যাডার পার্টি বলতে বোঝায় প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, অবিধিবদ্ধ এবং যাদের কোনো ব্যাপক সংগঠন গড়ে তোলার ইচ্ছা নেই এমন এক পার্টি। যখন ভোটাধিকার ছিল সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত তখন সংসদে গোষ্ঠীকেন্দ্রিক দল ছিল এই ক্যাডার পার্টি। কিন্তু বর্তমানে বিশেষ করে কমিউনিস্ট দলের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে ক্যাডার পার্টির অর্থ পরিবর্তিত হতে থাকে। এর অর্থ দাঁড়ায় দক্ষ ও সব সময়ে নিযুক্ত, পার্টি আদর্শে উদ্বুদ্ধ সদস্যের দল। যেমন পূর্বতন সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট পার্টি, জার্মানীর ন্যাৎসি পার্টি। ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি বা শিবসেনাকেও ক্যাডার পার্টি বলা যেতে পারে।

অপরদিকে ম্যাস পার্টি বা গণদল বলতে বোঝায় সেই দলকে যারা জনগণের মধ্যে ব্যাপক জনসমর্থন আদায়ে সদস্যসংখ্যা বাড়াতে আগ্রহী। ব্রিটেনে লেবার পার্টি বা জার্মানীতে গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক দল এই ধরনের দলের উদাহরণ। মতাদর্শের উপর গুরুত্ব আরোপের চেয়ে সদস্যসংখ্যা বাড়ানোই এই দলের বৈশিষ্ট্য। অটো কিরখেইমার (Otto Kirchheimer – 1966) এই ধরনের দলকে Catch all Parties

'সবাইকে ধরো' পার্টি নামে উল্লেখ করেন। দুভারজার-এর মতে, রাজনৈতিক দলের উদ্ভবের প্রথমপর্বে অর্থাৎ উনবিংশ শতকে ভোটাধিকার ছিল সীমিত ও সম্পত্তি কেন্দ্রিক। একারণে দলও ছিল ক্যাডারভিত্তিক। কিন্তু সর্বজনীন ভোটাধিকার ব্যবস্থা চালু হবার সঙ্গে সঙ্গে জনসমর্থনের জন্য নির্বাচনে পুঁজিপতিদের অর্থলগ্নি স্বাভাবিক হতে থাকে। ক্যাডার পার্টিগুলি তাদের কাঠামোকে পরিবর্তন করতে থাকে জনগণের অংশগ্রহণের জন্য। এই পরিবর্তন অবশ্য একদিনে বা নির্বিঘ্নে ঘটেনি। এমনকি, সর্বজনীন ভোটাধিকার চালু হবার পরেও জনগণ যতদিন পর্যন্ত রাজনৈতিকভাবে সচেতন না হয় ততদিন ক্যাডার পার্টির অস্তিত্ব থেকে যায়। পার্টি কাঠামো চক্রভিত্তিক (cancus) হয়ে পড়ে।

দলীয় উপাদানের ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাজন ঃ দলীয় উপাদান বলতে দুভারজার সংগঠনের সেই সমস্ত গঠনকারী এককগুলিকে বুঝিয়েছেন যার দ্বারা রাজনৈতিক দল সৃষ্ট হয়। উপাদানের ভিত্তিতে দুভারজার রাজনৈতিক দলকে চারভাগে ভাগ করেন— চক্রদল (Caucus Party), প্রশাখাদল (Branch Party), কোষদল (Ceil Party) এবং জঙ্গীদল (Militia)। চক্রদল বলতে বোঝায় বিশেষ ক্ষমতা, অর্থ, দক্ষতাসম্পন্ন কতিপয় ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত ঢিলেঢালা, অসংলগ্ন রাজনৈতিক সংগঠন। চক্রদল অনেক সময় কমিটি দল (Committee Party), উপদল (Clique), অন্তরঙ্গদল (Cliquic) নামে অভিহিত করা হয়। এই ধরনের দলের সদস্যসংখ্যা খুব কম এবং তা বৃদ্ধির জন্য দল আগ্রহীও নয়। তাছাড়া এর কার্যাদিও বিশেষ সময় ও ঘটনাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। নির্বাচন বা বিশেষ কোনো বিষয়ে এই দলের কার্যকারিতা হঠাৎ বেড়ে যায়। চক্রদল আবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ হতে পারে। ফ্রান্সের বিপ্লবী সমাজতন্ত্রীদল প্রত্যক্ষ চক্রদলের উদাহরণ। কারণ, এই দলের সদস্যরা ব্যক্তিগত যোগ্যতা বা প্রভাবের ফলে দলের সদস্য হয়েছে। অপরদিকে শ্রমিকদল পরোক্ষ চক্রদলের উদাহরণ। কারণ, এর সদস্যরা কোনো শ্রমিক সংগঠন, সমবায় সংগঠন বা অনুরূপ কোনো সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব করে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দলগুলিকে দুভারজার চক্রদল বলে অভিহিত করেন। এক্ষেত্রে অবশ্য তিনি বিশেষজ্ঞের চক্রদল (Caucus of experts) শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করেন। কারণ, এক্ষেত্রে সদস্যগণ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার পদ্ধতি সম্পর্কেও যথেষ্ট ওয়াকিবহাল।

প্রশাখাদল কোনো দলের শাখাস্বরূপ এবং এক্ষেত্রে এর পৃথক স্বতন্ত্র কোনো অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। কোনো কোনো দলে আবার প্রশাখার অন্তর্গত বিভিন্ন প্রশাখাদল থেকে যায়। চক্রদলের সদস্যসংখ্যা যেখানে সীমিত ও দলের সদস্যভুক্তি নিয়ন্ত্রিত, প্রশাখাদলের সদস্যসংখ্যা বেশি ও সদস্যভুক্তির বিষয়টি উন্মুক্ত। দুভারজার-এর মতে প্রশাখাদল সমাজতন্ত্রীদের উদ্ভাবন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ১৯০০ খ্রিঃ থেকে ১৯১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত প্রশাখাদলের সুবর্ণযুগ। এসময় ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দলগুলি প্রশাখাদলে পরিণত হতে থাকে। তাছাড়া, ক্যাথলিক দলগুলিও প্রশাখাদলের উদাহরণ।

কোষদল ঃ চক্র বা প্রশাখাদলের সঙ্গে কোষদলের পার্থক্য হল চক্র বা প্রশাখাদল কোনো নির্দিষ্ট

এলাকাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। কিন্তু কোষদল জীবিকা বা উৎপাদন প্রক্রিয়ার কোনো বিশেষ কর্মের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের নিয়ে গড়ে ওঠে। একই জায়গায় (দোকান, অফিস, উৎপাদন কেন্দ্র/কারখানা, প্রশাসন ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত) কর্মরত ব্যক্তিদের নিয়ে এক একটি কোষদল গড়ে ওঠে। তাছাড়া, প্রশাখাদলের তুলনায় এর সদস্যসংখ্যাও কম। কমিউনিস্ট পার্টিগুলি কোষদলের অন্যতম উদাহরণ।

জঙ্গীদল ঃ জঙ্গীদল হল এক ধরনের বেসরকারি বাহিনী যার সদস্যরা সামরিক বাহিনীর সদস্যদের ন্যায় শৃঙ্খলাবদ্ধ, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, সুনির্দিষ্ট পোষাক এবং প্রতীকে সুসজ্জিত এবং যে কোনো সময় অস্ত্র- শস্ত্র নিয়ে শত্রুপক্ষের সঙ্গে মোকাবিলায় তৎপর। কিন্তু এর সদস্যরা অসামরিক ব্যক্তি। দল সবসময়ের জন্য সদস্যদের ভরণপোষণের দায় নেয় না। সংগঠনের পরিবর্তে ব্যক্তি নেতৃত্বের প্রতি সদস্যরা বেশি দায়বদ্ধ এবং নেতার আহ্বানে যে কোনো সময়ে সংগ্রামে প্রস্তুত। জার্মানীতে হিটলারের ন্যাৎসি দল বা ইতালিতে মুসোলিনির ফ্যাসিস্ট দল-এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কোষদলকে যদি কমিউনিস্টদের উদ্ভাবন বলা যায় তাহলে জঙ্গীদল হল ফ্যাসিস্টদের উদ্ভাবন। বর্তমানে অবশ্য বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠী বা ধর্মীয় গোষ্ঠী এ ধরনের জঙ্গী দল গঠনের মাধ্যমে স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় আগ্রহী।

দুভারজার কর্তৃক উপরোক্ত শ্রেণীবিভাজন ছাড়াও রাজনৈতিক দলকে সংবিধানসম্মত দল (Constitutional Party) এবং বিপ্লবী দল (Revolutionary Party) — এই দুভাগে ভাগ করা হয়। সংবিধানকে স্বীকার বা অস্বীকার করার প্রেক্ষিতে রাজনৈতিক দলের এই শ্রেণীবিভাজন। সংবিধান সম্মত দল হল সেই সমস্ত রাজনৈতিক দল যারা সংবিধানের চৌহদ্দির মধ্যে থেকে এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির অধিকারকে স্বীকার করে নির্বাচনী গণতন্ত্রের প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধাশীল থাকে। বিপরীতভাবে, বিপ্লবী রাজনৈতিক দল বিদ্যমান সংবিধান ব্যবস্থার বিরোধী। এই সমস্ত দলগুলি বিদ্যমান সংবিধান ব্যবস্থার পতন ঘটিয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করতে চায়। অগণতান্ত্রিক বা চরমপন্থী বলে এ ধরনের রাজনৈতিক দলকে অনেক সময় রাজনৈতিক দল বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয় না বা অনেক সময় রাষ্ট্র-কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়ে থাকে।

রাজনৈতিক দলগুলিকে আবার মতাদর্শের ভিত্তিতে বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থী হিসাবে ভাগ করা হয়। বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থী হিসাবে কোনো গোষ্ঠীকে চিহ্নিতকরণের বিষয়টি ফ্রান্সে ১৭৮৯ খ্রিঃ এস্টেট জেনারেল (I state General)-এর সভাকক্ষে সদস্যদের অবস্থান থেকে উদ্ভূত হয়। বর্তমানে সমাজ-তান্ত্রিক কমিউনিস্ট দলগুলিকে বামপন্থীদল হিসাবে চিহ্নিতকরণ করা হয়। কারণ, এ সমস্ত দলগুলি আমূল পরিবর্তনের পক্ষপাতী। দক্ষিণপন্থী দলগুলি (বিশেষ করে রক্ষণশীল এবং ফ্যাসিস্ট দল) বর্তমান অর্থ সামাজিক অবস্থা টিকিয়ে রাখার পক্ষপাতী। সাধারণত দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষেরা বামপন্থী দলগুলির এবং অবস্থাপন্ন ব্যবসায়ী, জমির মালিক, শিল্পপতি রক্ষণশীল দলের সমর্থক। সময়বিশেষে মধ্যবর্তী শ্রেণীরা কখনও বামপন্থী কখনও দক্ষিণপন্থী হয়ে ওঠে। অবশ্য এ ধরনের বিভাজন স্থান কাল ও পাত্র

ভেদে ভিন্ন হয়ে ওঠে। অনেক সময় দরিদ্র যাজক রক্ষণশীল দলের সমর্থক হয়ে ওঠে। আবার এঙ্গেলস শিল্পপতি হয়েও ছিলেন বামপন্থী।

কোনো রাজনৈতিক দলই স্বয়ংসম্পূর্ণ একক প্রতিষ্ঠান নয়। কোনো না কোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যেই রাজনৈতিক দলগুলি ক্রিয়াশীল থাকে। সুতরাং রাজনৈতিক ব্যবস্থা, অন্য রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক দলগুলির শ্রেণীবিভাজন করা হয়ে থাকে। এই ধরনের শ্রেণীবিভাজনকে দলীয় ব্যবস্থার শ্রেণী বিভাজন বলা হয়ে থাকে। দুভারজার দলের সংখ্যা অনুযায়ী রাজনৈতিক দল ব্যবস্থাকে একদলীয় (একটি মাত্র দলের উপস্থিতি— যেমন, পূর্বতন সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে), দ্বিদলীয় (দুইটি মাত্র দলের উপস্থিতি— যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, ব্রিটেনে) এবং বহুদলীয় (বহু দলের উপস্থিতি— যেমন, ভারতে) এই তিনভাগে ভাগ করেন। একদলীয় ব্যবস্থাকে আবার প্রকৃতিগত ভাবে কমিউনিস্ট একদলীয় এবং ফ্যাসিস্ট এক দলীয় — এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। বহুদলীয় ব্যবস্থাকে ত্রিদলীয় (তিনটি দলের উপস্থিতি — অস্ট্রেলিয়া পঞ্চাশের দশকে) চতুর্দলীয় (চারটি দলের উপস্থিতি - — সুইজারল্যান্ড, কানাডা, এবং বহুদলীয় (তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি) — এই তিনভাগে ভাগ করেন।

জাপ (Jupp) রাজনৈতিক দলব্যবস্থাকে সাত ভাগে ভাগ করেন। যথা— (১) অস্পষ্ট দ্বিদলীয় ব্যবস্থা (২) স্পষ্ট দ্বিদলীয় ব্যবস্থা (৩) বহুদলীয় ব্যবস্থা (৪) প্রাধান্যপ্রবণ দলব্যবস্থা (৫) অ-সংকীর্ণ একদলীয় ব্যবস্থা (৬) সংকীর্ণ একদলীয় ব্যবস্থা এবং সামগ্রিকতাবাদী ব্যবস্থা। অ্যালান বল (Alan Ball)ও দলব্যবস্থাকে সাত ভাগে ভাগ করেন। যেমন— (১) অস্পষ্ট দ্বিদলীয় ব্যবস্থা (২) স্পষ্ট দ্বিদলীয় ব্যবস্থা (৩) কার্যকরী বহুদলীয় ব্যবস্থা (৪) অস্থায়ী বহুদলীয় ব্যবস্থা (৫) প্রাধান্যকারী দলব্যবস্থা (৬) একদলীয় ব্যবস্থা এবং (৭) সামগ্রিকতাবাদী একদলীয় ব্যবস্থা।

পরিশেষে বলা যায়, রাজনৈতিক দলগুলির উপরোক্ত শ্রেণীবিভাজন সম্পূর্ণ নয়। তাছাড়া, বর্তমানে বেশ কিছু নতুন বিষয় যেমন— পরিবেশ, নারীবাদ, মানবাধিকার, অন্যান্য জীবজন্তুর অধিকার সংরক্ষণ প্রভৃতি বিষয়গুলি রাজনৈতিক বিষয় হিসাবে গুরুত্ব লাভ করায় রাজনৈতিক দলের শ্রেণীবিভাজনও জটিল রূপ নিয়েছে।

৮২.৬ রাজনৈতিক দলের কার্যাবলী

রাজনৈতিক দলের কোনো সুনির্দিষ্ট কার্যাবলীর তালিকা পেশ করা সম্ভবপর নয়। কারণ, রাজনৈতিক দলগুলি কোনো না কোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে কাজ সম্পাদন করে থাকে। রাজনৈতিক ব্যবস্থার ভিন্নতা হেতু রাজনৈতিক দলের কার্যাবলীরও ভিন্নতা দেখা দেয়। যেমন, কমিউনিস্ট রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের কার্যাবলীর সঙ্গে উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উদারনৈতিক/রক্ষণশীল দলগুলির কার্যাবলীর সাদৃশ্য কল্পনা করা কষ্টকর। এমনকি, উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কমিউনিস্ট পার্টি যে

ধরনের কাজ করে থাকে তা কমিউনিস্ট রাজনৈতিক ব্যবস্থায় কমিউনিস্ট পার্টির কাজের সমরূপ নয়। এতদসত্ত্বেও তাত্ত্বিকগণ রাজনৈতিক দলের কতকগুলি কার্যের তালিকা পেশ করতে প্রয়াসী হয়েছেন। আলমন্ড এবং পাওয়েল রাজনৈতিক দলের তিন ধরনের কাজের কথা বলেন। যেমন, রাজনৈতিক বাছাইকরণ, রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ এবং স্বার্থের সমষ্টিবদ্ধকরণ ও গ্রন্থিকরণ। রড হেগ, মার্টিন হ্যারপ এবং ব্রেসলি (১৯৮২/১৯৯২) রাজনৈতিক দলের পাঁচ ধরনের কাজের কথা বলেন। যেমন, প্রকাশের মাধ্যম, স্বার্থের সমষ্টিবদ্ধকরণ, যৌথ লক্ষ্যের বাস্তবায়ন, এলিট বাছাইকরণ এবং সামাজিকীকরণ, আবেশজনিত বন্ধন। এন্ড্রু হেউড এবং বিশ্লেষণে ছয় ধরনের কাজের উল্লেখ রয়েছে। যথা— প্রতিনিধিত্বকরণ, এলিট গঠন ও বাছাইকরণ, লক্ষ্য নির্ধারণ, স্বার্থের সমষ্টিবদ্ধকরণ ও গ্রন্থিকরণ, সামাজিকীকরণ এবং সচলন, সরকার গঠন।

বিভিন্ন তাত্ত্বিকদের বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক দলের কতকগুলি সাধারণ কাজের উল্লেখ করা হল—

(এক) প্রতিনিধিত্বকরণ ঃ প্রতিনিধিত্বকরণ রাজনৈতিক দলের অন্যতম কাজ। প্রতিনিধিত্বকরণ বলতে রাজনৈতিক দলভুক্ত ব্যক্তিদের এবং প্রতিনিধিত্ব মূলক গণতন্ত্রে ভোটদানকারীদের মতামত ব্যক্ত করাকে বোঝায়। ব্যবস্থাপক তত্ত্বের (System Theory) আলোকে বলা যায়, রাজনৈতিক দল রাজনৈতিক ব্যবস্থার যোগান (input) প্রক্রিয়ায় সহায়তা করে। অবশ্য এই প্রতিনিধিত্বমূলক কাজ একমাত্র প্রতিযোগিতামূলক মুক্ত নির্বাচনী ব্যবস্থার মধ্যেই সার্থক হয়ে উঠতে পারে। যুক্তিসিদ্ধ পছন্দ তত্ত্বের (Rational Choice Theory) প্রবক্তাগণ, যেমন– Anthony Downs (1957), রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে তুলনা করে অর্থনৈতিক বাজারের সঙ্গে রাজনৈতিক বাজারের তুলনায় অগ্রসর হন। রাজনৈতিক বাজারে রাজনৈতিক নেতারা হলেন উদ্যোক্তা যারা ভোট পেতে চায়, রাজনৈতিক দলগুলি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানেরই সমরূপ। এখানে নাগরিকগণ হলেন ভোক্তা (Consumer) যারা ভোটদান/ রাজনৈতিক ক্ষমতার হস্তান্তর (যা বাজারী ব্যবস্থায় মুদ্রা হস্তান্তর)-এর মাধ্যমে অধিকার ও নিরাপত্তা ভোগ করে। কারণ, প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে ক্ষমতা ভোটদানকারীদের হাতেই থাকে। সুতরাং এটা প্রত্যাশিত যে ভোটদানকারীগণ কোনো রাজনৈতিক দলের নেতাকে প্রতিনিধি হিসাবে প্রেরণের ক্ষেত্রে তার সুপ্রসিদ্ধ পছন্দের প্রয়োগ ঘটাবে।

(দুই) রাজনৈতিক বাছাইকরণ ঃ রাজনৈতিক বাছাইকরণকে অধিকাংশ তাত্ত্বিকই যেমন, আলমন্ড, পাওয়েল, হেউড, রাজনৈতিক দলের প্রধান কাজ বলে উল্লেখ করেন। রাজনৈতিক নিয়োগ বা বাছাইকরণ (Recruitment) বলতে আলমন্ড এবং পাওয়েল রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ভূমিকা সম্পাদনকারী ব্যক্তিদের বাছাইকরণকে বুঝিয়েছেন। নির্বাচনমূলক উদারনৈতিক গণতন্ত্র ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা নির্বিশেষে সকল রাজনৈতিক ব্যবস্থাতেই নেতৃবৃন্দের বাছাই করে এবং দলের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের নিয়োগ করে। অবশ্য

রাজনৈতিক পদাধিকারীদের তথা এলিটদের কীভাবে এবং কোন পদ্ধতিতে রাজনৈতিক দলগুলি বাছাই করবে তা নির্ভর করে প্রতিটি রাজনৈতিক দলের নিজস্ব গঠনতন্ত্রের উপর। সাধারণত দেখা যায়, মন্ত্রীপরিষদচালিত শাসনব্যবস্থায় ক্যাবিনেটের সদস্যপদগুলি শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দই দখল করে থাকে। আবার, ১৯৪৪ খ্রিঃ ফ্রান্সে জেনারেল দ্য গ্যল নিজেই তার সৃষ্ট দলের (Union for the New Republic) প্রধান হিসাবে নিজের নাম ঘোষণা করেন।

(তিন) স্বার্থের সমষ্টিকরণ ও গ্রন্থিকরণ ঃ সাধারণভাবে বলা যায়, শ্রেণীবিভক্ত ও গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজ ব্যবস্থায় প্রতিটি রাজনৈতিক দলই কোনো না কোনো শ্রেণী বা গোষ্ঠীর স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে। কিন্তু নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যেহেতু অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলিকে পরাস্ত করতে হয় সেহেতু নিজ শ্রেণী/গোষ্ঠী স্বার্থের বাইরে জাতীয়/সামগ্রিক স্বার্থের প্রতিনিধিত্বও করতে হয়। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর/গোষ্ঠীর স্বার্থকে একত্র ও সমন্বিত করে দাবী ও নীতিতে রূপান্তরিত করাকে স্বার্থের সমষ্টিকরণ (Interest aggregation) বলে। বিভিন্ন রাজনৈতিক সভাসমিতি, সম্মেলনের মাধ্যমে বিভিন্ন গোষ্ঠী/পেশাজীবীদের সংগঠনের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলি এই স্বার্থ সমষ্টিকরণের কাজ করে থাকে। এছাড়া, রাজনৈতিক দলগুলি ব্যক্তি বা গোষ্ঠীসমূহের দাবীদাওয়া গ্রহণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের কাছে কার্যকরভাবে উপস্থাপিত করে থাকে। একে বলা হয় স্বার্থের গ্রন্থিকরণ (Interest articulation)।

(চার) রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ ঃ কোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংস্কৃতির সঙ্গে জনগণের পরিচিতিকরণ / দীক্ষিতকরণ ও আত্মীকরণ ঘটানোকে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ (Political Socialization) বলে। রাজনৈতিক সংস্কৃতির মধ্যে রয়েছে রাজনৈতিক ব্যবস্থার আদর্শ, মূল্যবোধ, আচরণবিধি, প্রভৃতি। এছাড়া, প্রতিটি রাজনৈতিক দলেরও নিজস্ব আদর্শ, মূল্যবোধ ইত্যাদি রয়েছে। সামাজিকীকরণ হল এক শিক্ষণপদ্ধতি যা বিভিন্ন মাধ্যম (যেমন, পরিবার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, গণমাধ্যম ইত্যাদি) দ্বারা জনগণের কাছে প্রবিষ্ট করানো হয়। এই সমস্ত মাধ্যমগুলির মধ্যে রাজনৈতিক দল হল অন্যতম মাধ্যম। রাজনৈতিক দলগুলি শুধুমাত্র দলীয় সদস্যদের মতাদর্শে দীক্ষিত করায় না; অন্যান্যদেরও রাজনৈতিক ব্যবস্থা, মতাদর্শের সঙ্গে পরিচিতি ঘটাতে সচেষ্ট হয়। বস্তুত, এই সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার দ্বারা কোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা বজায় থাকে। আবার কাঙ্ক্ষিত পথে পরিবর্তনের জন্যও সামাজিকীকরণ প্রয়োজন। একদলীয় ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের মতাদর্শ ও রাষ্ট্রীয় মতাদর্শ অনেকাংশে অভিন্ন থাকায় রাজনৈতিক দলের পক্ষে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের ব্যবহার করা যতটা সহজ প্রতিযোগিতামূলক বহুদলীয় ব্যবস্থায় ততটা সহজ নয়। বস্তুত, রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক দলগুলি রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যক্তির অংশগ্রহণকে সুনিশ্চিত করে।

(পাঁচ) লক্ষ্য নির্ধারণ ঃ রাজনৈতিক দলগুলির লক্ষ্য যেহেতু নিজ দলীয় স্বার্থের গণ্ডী অতিক্রম করে সমগ্র সমাজের স্বার্থের সমষ্টিকরণ করা, সেহেতু সমাজের সামগ্রিক লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা রাজনৈতিক

দলগুলির অন্যতম কাজ হয়ে দাঁড়ায়। মন্ত্রীপরিষদচালিত শাসনব্যবস্থা যেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের (একক বা জোটবদ্ধভাবে) শাসনব্যবস্থা, সেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের দায়িত্ব হল গোটা দেশের অর্থনৈতিক রাজনৈতিক লক্ষ্য স্থির করা এবং তা সংসদে অনুমোদনের মাধ্যমে বাস্তবায়নের চেষ্টা করা। দলীয় কর্মসূচি অবশ্য বিভিন্ন চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলির (আমলাতন্ত্র, শ্রমিক সংগঠন ইত্যাদি) দ্বারা অনেক সময় নিয়ন্ত্রিত/প্রভাবিত হয়ে থাকে। সেকারণে রাজনৈতিক দলগুলিকে এই লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে যথেষ্ট সতর্ক থাকতে হয়। কমিউনিস্ট দলগুলি যেহেতু সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার মাধ্যমে সাম্যবাদী সমাজগঠনে সচেষ্ট হয় সেহেতু এই উৎক্রমণশীল পর্যায়ে রাষ্ট্র কী ব্যবস্থা নেবে তা ধার্য করার দায়িত্ব এসে পড়ে কমিউনিস্ট দলের উপর।

(ছয়) সরকার গঠন : রাজনৈতিক ক্ষমতাদখল রাজনৈতিক দলগুলির প্রধান লক্ষ্য। একমাত্র রাষ্ট্রক্ষমতা দখল তথা সরকার গঠনের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলি তার কর্মসূচিগুলি বাস্তবে রূপ দিতে পারে। নির্বাচনে প্রার্থী দেওয়া থেকে শুরু করে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রার্থীকে বিজয়ী করে তোলা এবং সর্বাধিক সংখ্যক প্রতিনিধি যেহেতু মন্ত্রীপরিষদচালিত শাসনব্যবস্থায় সরকার গঠন করে সেহেতু সংসদে সর্বাধিক সংখ্যক প্রতিনিধিকে নির্বাচিত করানোর দায়িত্ব রাজনৈতিক দলগুলির। যে ক্ষেত্রে কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করা সম্ভবপর হয় না সেক্ষেত্রে অন্যান্য দলগুলির সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে সরকার গঠন করার সবরকম প্রচেষ্টাই রাজনৈতিক দলগুলিকে চালিয়ে যেতে হয়। যে সমস্ত দলগুলি সরকার গঠনে সক্ষম হয় না অর্থাৎ সরকার বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি সরকারি দলগুলির দোষত্রুটি সমালোচনার মাধ্যমে তুলে ধরে জনমত গঠনে সক্রিয় হয়ে ওঠে। অনেক সময় জোটবদ্ধ সরকার ভাঙাগড়ার খেলায় ছোটখাটো দলগুলিও সক্রিয় হয়ে ওঠে।

(সাত) সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধন : সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় শাসনবিভাগ তথা সংসদের নিম্নকক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আইনসভা সংসদের কাছে দায়িত্বশীল থাকে। এ কারণে রাজনৈতিক দলগুলি শাসনবিভাগের সঙ্গে আইনবিভাগের সেতুবন্ধ হিসাবে কাজ করে। রাষ্ট্রপতিচালিত শাসনব্যবস্থাতেও রাষ্ট্রপতি ও তার দল চেষ্টা করে সাংসদদের (নিজদলভুক্ত/অন্যদলভুক্ত) স্ববশে রাখতে।

(আট) মনস্তাত্ত্বিক : রাজনৈতিক দলগুলি নিষ্ক্রিয় নাগরিককে সক্রিয় নাগরিকে পরিণত করে। দেখা গেছে মানসিক অবসাদগ্রস্ত বা একক বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি রাজনৈতিক দলে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে স্বাভাবিক ও সামাজিক সম্পর্কের স্রোতে ফিরে এসেছে।

(নয়) দলকে সংগঠিত করা ও সঠিক নেতৃত্ব প্রদান করা : প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে প্রতিটি রাজনৈতিক দলকেই যেহেতু নির্বাচনী অগ্নিপরীক্ষায় দাঁড়াতে হয় সেহেতু রাজনৈতিক দলগুলি দলীয় সংগঠনকে মজবুত করা, দলীয় সংহতি বজায় রাখা ও সঠিক নেতৃত্ব প্রদানের মাধ্যমে দলকে জনগণের সমর্থন ও নির্বাচনী সাফল্য আদায়ে তৎপর হতে হয়। 'দলত্যাগ বিরোধী আইন' দলীয় সংহতিকেই

জোরদার করতে সাহায্য করেছে। অনেক সময় 'চীপ হুইপ'-এর মাধ্যমে দলীয় সদস্যদের সংযত করার চেষ্টা করা হয়।

(দশ) অর্থসংগ্রহ করা ঃ দলীয় সংগঠনকে পরিচালনা করা, দলের কাজগুলিকে বাস্তবায়িত করার জন্য বিশেষ করে নির্বাচনী ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য রাজনৈতিক দলগুলিকে অর্থসংগ্রহের ব্যাপারে বিশেষ নজর দিতে হয়। দলীয় সদস্যদের কাছ থেকে অর্থসংগ্রহ ছাড়াও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে ব্যবসায়ী, শিল্পগোষ্ঠীর কাছ থেকে অর্থসংগ্রহ করতে হয়। এর ফলে রাজনৈতিক দলগুলিকে বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠীর চাপ সহ্য করতে হয়।

(একাদশ) অন্যান্য কার্যাবলী ঃ উপরোক্ত কাজগুলি ছাড়াও রাজনৈতিক দলগুলি দলের অভ্যন্তরে সদস্যদের মধ্যে অথবা বাইরে বিভিন্ন ধরনের ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত সমস্যা বা বিরোধের মোকাবিলা করে। এভাবে ব্যক্তির একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়েও দলগুলির হস্তক্ষেপের ফলে ব্যক্তিগত ক্ষেত্র এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের মধ্যে ব্যবধান ঘুচে যায়। যে সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলি (যেমন কিছু কিছু ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট দল, ক্যাথলিক বা অন্য ধর্মীয় দল, গ্রীন দল এবং হয়ত আগামীদিনে নারীবাদী দল) নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকা বিশিষ্ট, জাতীয় রাষ্ট্রের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে না। সেই সমস্ত দলগুলির পক্ষে দেশের বাইরে অনুরূপ দলগুলির সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করা অন্যতম কাজ হয়ে দাঁড়ায়।

পরিশেষে বলা যায়, রাজনৈতিক দলকে এক স্বীকৃত ও কাঙ্ক্ষিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে ধরে নিয়ে রাজনৈতিক দলের কার্যাবলীর উপরোক্ত বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সমাজের মধ্যে পারস্পরিক বিভেদ সৃষ্টি করা, হিংসা বা ঘৃণার পরিবেশ সৃষ্টি করা, জনগণের ক্ষমতার নামে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত করা, অর্থনৈতিক ক্ষমতা যাদের হাতে রয়েছে তাদের সঙ্গে গোপনে আঁতাত তৈরি করা প্রভৃতি কাজগুলিও রাজনৈতিক দলগুলি করে থাকে। একারণে রাজনৈতিক দলের প্রতি ক্রমবর্ধমান অনাস্থা রাজনৈতিক দলব্যবস্থার ভবিষ্যৎকেই অনিশ্চিত করে তুলেছে।

৮২.৭ রাজনৈতিক দলের ভূমিকা

রাজনৈতিক দলের ভূমিকা আলোচনা প্রসঙ্গে কয়েকটি বিষয় প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রথমত, রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠার শুরু থেকেই রাজনৈতিক দলের ইতিবাচক ভূমিকার পরিবর্তে নেতিবাচক ভূমিকার প্রতি একদল তাত্ত্বিক দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সমাজের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, সমাজের মূল সমস্যাগুলির (যথা— বেকারত্ব, দারিদ্র্য, অস্বাস্থ্য, বাসস্থানের অভাব ইত্যাদি) সমাধানের প্রতি আন্তরিকতার অভাব (যদিও দলীয় কর্মসূচিতে বা ভাষণে বিষয়গুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ), উৎকোচ গ্রহণ, নেপথ্যে সমাজের অশুভ শক্তিগুলির সঙ্গে আঁতাত প্রভৃতি বিষয়গুলি রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মনে এক বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। শুধু ভারতবর্ষেই নয়, পৃথিবীর

অন্যান্য প্রান্তেও আজ প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের প্রতি মানুষের আস্থা যে ক্রমহ্রাসমান তা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে ভোটদানে জনগণের অংশগ্রহণের ক্রমহ্রাসমান চেহারা থেকে। তথাপি সামরিকতন্ত্র বা অন্য যে কোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থার তুলনায় দলনির্ভর প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র যে অধিকতর কাম্য সে বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই। প্রশ্ন হল, প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রকে কীভাবে আরো বেশি গণমুখী করা যায়। বলা বাহুল্য, এ ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক দলের এই ভূমিকাকে আমরা দুভাবে আলোচনা করব। প্রথমে আমরা রাজনৈতিক ব্যবস্থা নির্বিশেষে রাজনৈতিক দলের ভূমিকার মূল্যায়ন করব। যে কোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থাতেই রাজনৈতিক দলগুলি এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তারপরে আমরা বিশেষ রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকার বিশ্লেষণে অগ্রসর হব।

৮২.৭.১ রাজনৈতিক ব্যবস্থা নির্বিশেষে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা

যে কোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থাতেই রাজনৈতিক দলগুলি কতকগুলি ভূমিকা পালন করে থাকে। যেমন—

(এক) পুরসমাজ (Civil Society) এবং সরকারের মধ্যে যোগাযোগ বজায় রাখার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাটি পালন করে রাজনৈতিক দল। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা উদ্ভবের পূর্বে অধিকাংশে রাষ্ট্রক্ষমতা পরিচালিত হত রাজা/রানী/সামরিক শাসক/গোষ্ঠীপতি কর্তৃক। কিন্তু গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী তথা যোগানদার জনগণ। অবশ্য গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরেও সকলের ভোটাধিকার লাভ করতে সময় লেগেছে আরো দেড়শো বছর। সার্বজনীন ভোটাধিকার ব্যবস্থার মাধ্যমে জনপ্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে জনগণ, বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠী সরকারের মধ্যে যোগাযোগের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে রাজনৈতিক দলগুলি। রাষ্ট্রব্যবস্থায় কর্তৃত্বের অধিকারী তথা সরকার-এর বাছাইকরণ, জনগণের দাবিদাওয়া সরকারের কাছে উপস্থাপন, সরকারের সিদ্ধান্তসমূহ পুনরায় জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়া বা জনগণকে ওয়াকিবহাল করানোর দায়িত্ব রাজনৈতিক দলের।

(দুই) রাজনৈতিক ক্ষমতার বৈধতাসাধন ঃ শাসন কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা প্রয়োগের বৈধতার বিষয়টি রাজনীতিচর্চার এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যে সমস্ত দেশে রাজতন্ত্র, সামরিকতন্ত্র বা গোষ্ঠীতন্ত্র ছিল বা আছে সেখানে ক্ষমতা প্রয়োগের বৈধতার বিষয়ে প্রায়শই বিদ্রোহ বা সামরিক অভ্যুত্থান দেখা যায়। কারণ, এক্ষেত্রে ক্ষমতা প্রয়োগের বৈধতার বিষয়টি ব্যক্তিগত যোগ্যতা, বাহুবল প্রভৃতি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। কিন্তু গণতন্ত্রের সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে নির্বাচনমূলক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে সরকারকে জনগণের সমর্থনের উপর নির্ভর করতে হয়। আধুনিক যুগের দলীয় শাসনব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে জনগণের সমর্থনের উপরই ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনার শুরুতেই তাই ঘোষণা করা হয়েছে, 'আমরা ভারতের জনগণ ... এই সংবিধান গ্রহণ, গ্রন্থন ও চালু করছি'। জনগণের স্বার্থের

গোষ্ঠীবদ্ধ রূপই হল রাজনৈতিক দল। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সৃষ্টি ও দলীয় সমর্থনের মধ্য দিয়েই জনগণ নির্বাচিত সরকারের ক্ষমতা প্রয়োগের বৈধতা দান করে। এর ফলে রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতাও বজায় থাকে। যে সমস্ত দেশে, বিশেষ করে সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত উন্নয়নশীল দেশগুলিতে স্থিতিশীল সরকার গড়ে উঠতে পারছে না তার জন্য রাজনৈতিক দলগুলি বহুলাংশে দায়ী। এটা স্বীকৃত যে কোনো ব্যক্তিবিশেষ বা সেনাবাহিনী বা আমলাতন্ত্রের তুলনায় রাষ্ট্রীয়ক্ষমতার তথা সরকারের বৈধতাদানের ব্যাপারে রাজনৈতিক দল অনেক বেশি সদর্থক ভূমিকা নিতে পারে।

(তিন) সমাজ পরিবর্তন ঃ রাজনৈতিক ক্ষমতার বৈধতাদানের ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও এই বৈধতাদান কিন্তু স্থায়ী নয়। কারণ, নির্বাচিত সদস্যগণ এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য (যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চার বৎসর, ভারতে পাঁচ বৎসর) সরকার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। এই সময় শেষ হবার পূর্বে বা অব্যবহিত পরেই পুনরায় নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন সরকার গঠন করতে হয়। এর ফলে সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে উদারনৈতিক তত্ত্বে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দলগুলিকেও তার কর্মসূচি ও লক্ষ্যমাত্রা স্থির করতে হয়। নতুবা জনগণের পরিবর্তিত আকাঙ্ক্ষার যথাযথ গুরুত্ব না দেবার জন্য রাজনৈতিক দলগুলি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে না। সামগ্রিকভাবে রাজনৈতিক দলগুলির প্রতি ভোটদাতাদের আস্থা নষ্ট হতে পারে। যে সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলি আমূল পরিবর্তনের পক্ষপাতী সেই সমস্ত দলগুলিকে কাঙ্ক্ষিত রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের মাধ্যমে সমাজ গঠনের লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে হয়। রাজনৈতিক দলগুলি এভাবে সমাজ পরিবর্তনের এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসাবে কাজ করে।

(চার) উপকরণ ও উৎপাদ সরবরাহকারী হিসাবে ভূমিকা ঃ যে কোনো উদারনৈতিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলগুলি সমাজে উপকরণ (input) এবং উৎপাদ (output) সরবরাহকারী সংস্থা হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা/দাবিদাওয়াকে চিহ্নিতকরণ করে এক সুনির্দিষ্টরূপে গ্রন্থিকরণ করে সরকারের কাছে হাজির করা এবং এর ফলে গৃহীত সরকারি সিদ্ধান্ত জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং সিদ্ধান্তগুলি বাস্তবায়িতকরণের ব্যাপারে সরকারকে সাহায্য করা রাজনৈতিক দলগুলির অন্যতম দায়িত্ব। যে সমস্ত দাবিগুলি পূরিত হল না বা নূতনতর পরিস্থিতিতে নূতনতর দাবি বা চাহিদা উত্থাপিত হল সেগুলিকে উপকরণ হিসাবে সরকারের কাছে পুনরায় হাজির করার মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক দলগুলি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

(পাঁচ) উন্নয়নের এজেন্ট হিসাবে রাজনৈতিক দল ঃ যে কোনো দেশের উন্নয়নে রাজনৈতিক দল এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই উন্নয়নের বিষয়টি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে পরিব্যাপ্ত। রাজনৈতিক উন্নয়ন বলতে একদিকে যেমন পরাধীন দেশগুলির স্বাধীনতা প্রাপ্তিকে বোঝায়, অপরদিকে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর রাজনীতিতে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ, সরকারি ক্ষমতা

প্রয়োগের বৈধতাসাধন, বিভিন্ন ব্যক্তি/গোষ্ঠী স্বার্থের সংহতিকরণ এবং তদনুযায়ী সরকারি সিদ্ধান্তগ্রহণ, জাতীয় সংহতিসাধন প্রভৃতি বিষয়কে বোঝায়। অধিকাংশ ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে রাজনৈতিক দলের উদ্ভব ঘটেছে স্বাধীনতা লাভের আন্দোলনকে নেতৃত্ব দেবার জন্য এবং এ ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকা প্রশংসনীয়। এ প্রসঙ্গে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে জাতীয় কংগ্রেসের ভূমিকার উল্লেখ করা যেতে পারে। সাম্রাজ্যবাদী শাসনমুক্ত দেশগুলিতে আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য আদায়ের লড়াই-এ রাজনৈতিক দলগুলি বিশেষ করে আঞ্চলিক দলগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুগে আওয়ামী লীগের ভূমিকা প্রশংসনীয়।

কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিকাঠামো কী হবে সে বিষয়ে প্রতিটি রাজনৈতিক দলেরই সুনির্দিষ্ট মতাদর্শ থাকে। রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের পর ক্ষমতা দখলকারী রাজনৈতিক দল/দলগুলির দায়িত্ব এসে যায় অর্থনৈতিক উন্নয়নে সক্রিয় অংশগ্রহণের। অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলায় ব্যর্থ সরকার গঠনকারী কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষে বেশিদিন রাষ্ট্রক্ষমতায় টিকে থাকা সম্ভবপর নয়। ভারতে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরবর্তী পর্যায়ে নেহেরু নেতৃত্বাধীন সরকারের মিশ্র অর্থনীতির ঘোষণা। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ, বিদেশি পুঁজির অনুপ্রবেশ নিয়ন্ত্রণ, ইন্দিরা গান্ধী শাসনের শেষপর্বে ও রাজীব গান্ধীর সময় থেকে ক্রমাগত বেসরকারিকরণের প্রবণতা, বিদেশি পুঁজির অনুপ্রবেশে উৎসাহদান প্রভৃতি সিদ্ধান্তসমূহ বস্তুত জাতীয় কংগ্রেস ও পরবর্তীকালে কংগ্রেস (ই) দলের মতাদর্শের বহিঃপ্রকাশ। অন্যদিকে, পশ্চিমবঙ্গে ভূমিসংস্কার, পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতির পুনর্গঠন সংক্রান্ত আইনসমূহ কংগ্রেস রাজনৈতিক দলের মস্তিষ্ক প্রসূত হলেও তা বাস্তবায়িত করার কৃতিত্ব সি.পি.আই.(এম) নেতৃত্বে পরিচালিত বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলির। জনগণের মনে রাজনৈতিক সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটানো তথা রাজনৈতিক দীক্ষাদান এর বিষয়টি ব্যাপকভাবে নির্ভর করে রাজনৈতিক দলের উপর। রাজনৈতিক দলগুলি যদি তাদের সদস্য/সমর্থকদের এমনকি অনাদলভুক্ত ব্যক্তিদের মনোভাব এবং দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রভাবিত করতে না পারে তাহলে রাজনৈতিক দলের পক্ষে স্থায়িত্ব লাভ করা সম্ভবপর হয় না। বস্তুত, রাজনৈতিক দলগুলি সমাজের সদস্যদের দৃষ্টিভঙ্গিগত ও আচরণগত পরিবর্তন ঘটিয়ে আঞ্চলিক ও জাতীয় রাজনীতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে সাহায্য করে। সম্প্রতি কয়েকটি রাজনৈতিক দল সমাজের সদস্যদের শুধুমাত্র রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণকেই প্রভাবিত করে না — সামগ্রিক জীবনধারাকে প্রভাবিত ও পরিচালিত করতে চায়। ধর্মীয় মৌলবাদী দলগুলি, গ্রীন (পরিবেশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত) দলগুলি, কমিউনিস্ট দলগুলি শুধুমাত্র রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, সমাজের সকলক্ষেত্রে ব্যক্তির আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। পরিবারের আয়তন কেমন হবে, কী ধরনের পোষাক ব্যবহার করতে হবে, ভোগ্যপণ্য ব্যবহারের ধরন কীরকম হবে ইত্যাদি এতদিন যা ব্যক্তির একান্ত ব্যক্তিগত ক্ষেত্র হিসাবে চিহ্নিত ছিল তাও সম্প্রতি কোনো কোনো সমাজে রাজনৈতিক দলের নিয়ন্ত্রণাধীন।

৮২.৭.২ রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা

রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব যথাযথভাবে অনুধাবনের জন্য কোনো রাজনৈতিক দলকে এককভাবে বিশ্লেষণ না করে যে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সেই রাজনৈতিক দল ক্রিয়াশীল সেই রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই আলোচনা বাঞ্ছনীয়। উদাহরণস্বরূপ, পশ্চিম ইউরোপে রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকা যতটা গুরুত্বপূর্ণ, লাতিন আমেরিকায় রাজনৈতিক দল সেরূপ গুরুত্বপূর্ণ নয়। গণপ্রজাতন্ত্রী চীন-এ কমিউনিস্ট পার্টির যে ভূমিকা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কাছে সে ভূমিকা কল্পনাতীত। বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমরা তিন ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তা আলোচনা করব। যথা— (১) প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দল, (২) কর্তৃত্বমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাজনৈতিক দল এবং (৩) সদ্য-প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দল।

৮২.৭.২.১ প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দল ঃ

প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার ধরন একইরকম নয়। রাজনৈতিক দলের অবস্থান অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থাকে আমরা তিনভাগ ভাগ করতে পারি। যথা— সেই সমস্ত রাষ্ট্র যেখানে অন্যান্য রাজনৈতিক দল থাকলেও একটি রাজনৈতিক দলই প্রাধান্য বিস্তার করে। (২) সরকার দখলের জন্য যে সমস্ত দেশে মূলত দুইটি রাজনৈতিক দল প্রতিযোগিতা করে, (৩) বহু রাজনৈতিক দলের অবস্থিতি এবং কোনো একটি রাজনৈতিক দলের পক্ষে নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করা সম্ভব না হওয়ায় একাধিক রাজনৈতিক দল জোটবদ্ধ হয়ে সরকার গঠন করে।

(এক) দক্ষিণ আফ্রিকায় একাধিক রাজনৈতিক দল থাকলেও আফ্রিকা জাতীয় কংগ্রেস (African National Congress) দক্ষিণ আফ্রিকার রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই দলটির বর্ণবিদ্বেষবিরোধী অবস্থানের ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষ্ণকায়দের ব্যাপক সমর্থন লাভও সহজ হয়। ভারতে বহু রাজনৈতিক দল থাকলেও স্বাধীনতার পরবর্তী পর্যায়ে এবং সত্তর দশকের আগে পর্যন্ত জাতীয় কংগ্রেস ছিল ভারতীয় রাজনীতির চালিকাশক্তি। স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকার ইতিহাস, সম্পত্তির অধিকারকে সুনিশ্চিত করার ফলে জমিদারদের সমর্থন, মিশ্র অর্থনীতির প্রবক্তা হিসাবে পুঁজিপতিদের সমর্থন, একই সঙ্গে মিশ্র অর্থনীতি ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ, দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচি গ্রহণের ফলে সাধারণ মানুষের সমর্থন জাতীয় কংগ্রেসকে সত্তরের দশকের আগে পর্যন্ত ভারতে অপ্রতিদ্বন্দ্বীদল হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষেও সরকারি ক্ষমতার ব্যবহারের মধ্য দিয়ে দলীয় কর্মসূচিকে জাতীয় কর্মসূচি হিসাবে গ্রহণ করা কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠেনি। সত্তরের পরবর্তী দশকগুলিতে কংগ্রেসের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব, সরকারি ক্ষমতায় থেকেও অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যাগুলি মোকাবিলার ব্যর্থতার ফলে কংগ্রেস রাজনৈতিক দল বৃহত্তর দল হিসাবে অস্তিত্ব বজায় রাখলেও ভারতীয়

রাজনীতিতে প্রাধান্যকারী দলের গুরুত্ব হারিয়েছে। পরিবর্তে ভূমিসংস্কার কর্মসূচির বাস্তবায়ন, খেতমজুরদের বেতনবৃদ্ধি, পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে ক্ষমতা ও উন্নয়নের বিকেন্দ্রীকরণ, সাংগঠনিক দক্ষতা, পশ্চিমবঙ্গে সি.পি.আই.(এম)-কে এক প্রাধান্যকারী দলে পরিণত করেছে।

(দুই) ব্রিটেনে বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মূলত দুটি রাজনৈতিক দল ক্রমান্বয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে সরকার গঠন করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রিপাবলিকান এবং ডেমোক্রাট দল রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এককভাবে প্রাধান্য বিস্তার না করে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে চলেছে। ব্রিটেনেও রক্ষণশীল এবং শ্রমিকদল রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেছে। ব্রিটেনে অবশ্য ১৯৯৭ খ্রিঃ উদারনৈতিক গণতন্ত্রীরা (Liberal Democrats) ৪৬টি আসন (৭ শতাংশ) দখল করে গত পঞ্চাশ বছরের ইতিহাসে তৃতীয় দল হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এই ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় উভয় দলই সতর্ক থাকে জনসমর্থন আদায়ে। কারণ, তৃতীয় কোনো বৃহত্তর দল না থাকায় দুইটি দলের পারস্পরিক প্রতিযোগিতা এতই তীব্র যে, নির্বাচনে যে কোনো সময়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হারানোর ভয় থাকে। মতাদর্শগত ভিন্নতা (বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে) তীব্রতর না হওয়ায় রাজনৈতিক বিতর্ক ইস্যুভিত্তিক হয়ে থাকে।

(তিন) বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ড, স্কানডিনেভীয় দেশগুলি বা সত্তর দশকের পরবর্তী ভারতীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থায় কোনো দলের পক্ষেই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করা সম্ভবপর নয়। একারণে এসমস্ত দেশগুলিতে একাধিক রাজনৈতিক দল জোটবদ্ধ হয়ে সরকার গঠন করে। এর ফলে ছোট ছোট রাজনৈতিক দলগুলি প্রাধান্য বিস্তারের সুযোগ পায়। কারণ, মোর্চা গঠন করার তথা সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করার সময় অনেক ক্ষেত্রেই ছোট ছোট রাজনৈতিক দলগুলির সমর্থন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। ১৯৯৯ পরবর্তী ভারতে কেন্দ্রে সরকার গঠন করার ব্যাপারে বি.জে.পি.-কে এমন কিছু ছোট ছোট দলের আব্দার মেনে নিতে হয়েছে যা অন্য রাজনৈতিক ব্যবস্থায় কল্পনাও করা যায় না। এই ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সরকারের স্থায়িত্ব স্বল্পকালীন ও দুর্বল হয়ে পড়ে, কারণ, সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারাবার ভয়ে বৃহৎ রাজনৈতিক দলের পক্ষে ছোট ছোট রাজনৈতিক দলগুলিকে উপেক্ষা করা সম্ভবপর হয় না। রাজনৈতিক দলগুলিও কাম্য নীতিনির্ধারণ বা মতাদর্শের চেয়ে কার সঙ্গে জোটবদ্ধ হলে রাজনৈতিক মুনাফা অর্জিত হতে পারে সে ব্যাপারে বেশি আগ্রহী হয়ে ওঠে। জাতীয় রাজনীতির পরিবর্তে আঞ্চলিক গোষ্ঠীকেন্দ্রিক রাজনীতির প্রসার ঘটতে থাকে। কারণ, রাজনৈতিক দলগুলি নিজ নিজ গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের কাছ থেকে সমর্থক সংগ্রহের চেষ্টা করে।

৮২.৭.২.২. কর্তৃত্বকারী রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাজনৈতিক দল ঃ

কর্তৃত্বকারী রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের দু'ধরনের ভূমিকা লক্ষ করা যায়। উদারনৈতিক রাজনৈতিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী কর্তৃত্বমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা বলতে স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে বুঝায় — যদিও যে কোনো

রাষ্ট্রব্যবস্থাই কর্তৃত্বমূলক। সাধারণত স্বৈরতান্ত্রিক বা কর্তৃত্বমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা বলতে সেই সমস্ত রাষ্ট্রব্যবস্থাকে বুঝায় যেখানে একাধিক রাজনৈতিক দলের মধ্যে নির্বাচনী প্রতিযোগিতার মাধ্যমে প্রতিনিধিমূলক সরকার গড়ে ওঠে না। এদিক থেকে দু'ধরনের কর্তৃত্বমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা লক্ষ করা যায় — (এক) অ-কমিউনিস্ট ব্যবস্থা এবং (দুই) কমিউনিস্ট ব্যবস্থা (উদারনৈতিক তাত্ত্বিকগণ কমিউনিস্ট ব্যবস্থাকে স্বৈরতান্ত্রিক, সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রব্যবস্থা বলে অভিহিত করেন। যদিও কমিউনিস্ট মতাদর্শ অনুযায়ী যে কোনো রাষ্ট্রব্যবস্থাই কর্তৃত্বমূলক। বরঞ্চ কমিউনিস্ট ব্যবস্থা স্বৈরতান্ত্রিক/কর্তৃত্বমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থার পতন ঘটিয়ে প্রকৃত গণতান্ত্রিক/সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠা করে)। রাজনৈতিক দলের অবস্থান অনুযায়ী কর্তৃত্বমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থাকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন—

কর্তৃত্বমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা ও রাজনৈতিক দল

দলপূর্ব কর্তৃত্বমূলক রাষ্ট্র	দলবিরোধী কর্তৃত্বমূলক রাষ্ট্র	নেতৃত্ব অনুযায়ী দলীয় কর্তৃত্বমূলক রাষ্ট্র	সক্রিয় দলচালিত কর্তৃত্বমূলক রাষ্ট্র	কমিউনিস্ট দলচালিত কর্তৃত্বমূলক রাষ্ট্র
↓	↓	↓	↓	↓
সৌদি আরব, কুয়েত, জর্ডন— রাজতন্ত্রই প্রধান।	সামরিক শাসক আফ্রিকার দেশগুলি	বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে	সিঙ্গাপুর পি.এ.পি ১৯৫৯-এর পরে।	প্রজাতন্ত্রী চীন পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন।

কর্তৃত্বমূলক রাজনৈতিক ব্যবস্থায়, যেখানে রাজনৈতিক দলের হাতে ক্ষমতা রয়েছে, রাজনৈতিক দলগুলি রাষ্ট্রীয় ও সমাজজীবনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। যেখানে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটিয়ে সামরিক শাসক ক্ষমতা দখল করে সেখানে সামরিক শাসককে যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে ও চাপের মধ্যে থাকতে হয়। কারণ, প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র গড়ে তোলার জন্য আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক চাপ (এমনকি, বিশ্বব্যাঙ্ক থেকে ঋণ দেওয়া হবে কিনা সে সম্পর্কেও) থেকে যায়। কোনো কোনো কর্তৃত্বমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাজনৈতিক দল কোনো ব্যক্তিবিশেষকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। জার্মানীতে ন্যাৎসি পার্টি অত্যন্ত ক্ষমতাসম্পন্ন হলেও বাস্তবে তা ছিল হিটলারের ক্ষমতা এবং পার্টির প্রতি আনুগত্য আসলে হিটলারের প্রতি আনুগত্য। ইতালিতে ফ্যাসি পার্টির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। অপরদিকে কমিউনিস্ট দলগুলি গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতায় বিশ্বাসী থাকলেও বাস্তবে দলের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে এক ধরনের অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা যায়। কমিউনিস্ট পার্টি সমাজ ও রাষ্ট্রের ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী। তত্ত্বগতভাবে, কমিউনিস্ট পার্টি হল শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রণী বাহিনী। সুতরাং পুঁজিবাদী সমাজ থেকে সাম্যবাদী সমাজের রূপান্তরের দায়িত্ব থাকে কমিউনিস্ট পার্টির হাতে। এর ফলে কমিউনিস্ট পার্টি সমাজ রূপান্তরের তথা রাষ্ট্রের বিলোপ ঘটিয়ে সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার নামে রাষ্ট্রকে আরো শক্তিশালী করে তোলে।

বলাবাহুল্য, রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করা আসলে দলকে, নেতৃত্বকে শক্তিশালী করা। দায়িত্বশীল পদগুলিতে দলীয় সদস্যদের নিয়োগ করে, প্রচার মাধ্যমগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে, যে কোনো বিরোধীকে শ্রেণীশত্রু তথা সমাজতন্ত্রের শত্রু নামে চিহ্নিত করে ব্যাপক ক্ষমতা প্রয়োগে উদ্যত হয়। কমিউনিস্ট বা ফ্যাসিস্ট দলগুলি ছাড়াও কোনো কোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দল রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতা ভোগ করে। উদাহরণ-স্বরূপ সিঙ্গাপুরে গণসংগ্রাম দল (People's Action Party)-এর উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯৫৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত গণসংগ্রাম দল-এর কর্তৃত্ব সিঙ্গাপুরের রাজনৈতিক ব্যবস্থার সকল ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত।

৮২.৭.২.৩ সদ্য-প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দল ঃ

প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে সদ্য-প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার পার্থক্য হল উভয় ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলেও প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত কিন্তু শেষোক্ত ক্ষেত্রে তা অত্যন্ত দুর্বল এবং স্থায়ী হবে কিনা সে সম্পর্কেও যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। শেষোক্ত ক্ষেত্রের উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যায় (ক) ১৯৯০ পরবর্তী পর্যায়ে উত্তর-কমিউনিস্ট (কমিউনিস্ট ব্যবস্থা ভাঙনের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে) দেশগুলিতে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা (খ) সামরিক শাসনের অবসান ঘটিয়ে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, এবং (গ) উত্তর-ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। এক্ষেত্রে বেশ কিছু দেশ, যেমন, ভারত, পঞ্চাশ বছরের উপর গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার পর বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে গণতন্ত্রকে টিকিয়ে রেখেছে। সদ্য-প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে এই সমস্ত দেশগুলিকে রাখা হয়নি। পরিবর্তে যে সমস্ত দেশগুলিতে যেমন, জিম্বাবুয়ে, ঘানা গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা এখনও সুদৃঢ় হতে পারে নি সেই সমস্ত দেশগুলিকে এই তালিকায় রাখা হয়েছে।

সদ্য-প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এই সমস্ত দেশগুলিতে গণতন্ত্রের গণভিত্ত অত্যন্ত দুর্বল। দলীয় সংহতির অভাব, ব্যাপক সদস্যসংখ্যার অনুপস্থিতি, এমনকি, সুস্পষ্ট মতাদর্শের অভাবও দেখা যায়। অর্থাৎ, কোনাঘানকে (Conaghan - 1995) অনুসরণ করে বলা যায়, এই ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক নেতা ও রাজনৈতিক সদস্য/ভোটদাতা – উভয়েই ভাসমান তথা স্থিরতাহীন। বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী বা স্বার্থগোষ্ঠীর প্রতীক বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের উপস্থিতি এই ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য। এর ফলে রাজনৈতিক দলগুলির পক্ষে স্থায়ীভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভবপর হয় না। উত্তর-কমিউনিস্ট দেশগুলিতেও দেখা যায় বিভিন্ন স্থানীয় নেতৃত্ব/এলিটগোষ্ঠীকে ঘিরে এক একটি রাজনৈতিক দল গড়ে উঠেছে। এ ধরনের রাজনৈতিক দলগুলির ব্যাপক জনসমর্থন না থাকায় দলগুলির পক্ষে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যাপক প্রভাব বিস্তার সম্ভবপর হয় না। চেক প্রজাতন্ত্র, পোলান্ড, হাঙ্গেরি, শ্লোভাকিয়ার রাজনৈতিক দলগুলির উল্লেখ এখানে করা যেতে পারে।

সামরিক শাসনযুক্ত দেশগুলিতে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে দুভাবে— (১) সামরিক শাসক সামরিক প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণাধীন নির্বাচনের মাধ্যমে জয়যুক্ত হয়ে নিজ ক্ষমতার বৈধতাদানে সচেষ্ট হয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। এক্ষেত্রে, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলেও সামরিক শাসকই রাষ্ট্রপ্রধান (রাষ্ট্রপতি/প্রধানমন্ত্রী) হিসেবে মূল ক্ষমতার অধিকারী। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলিকে বিভিন্নভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয় বা দলগুলি শাসকের তাবেদার গোষ্ঠীতে পরিণত হয়। (২) নির্বাচনে সামরিক শাসক পরাজিত হওয়ায় বা গণঅভ্যুত্থান-এর মাধ্যমে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। এক্ষেত্রে মুক্তিসংগ্রামে ও তৎপরবর্তী সংকট মোকাবিলায় নেতৃত্বদানকারী রাজনৈতিক দল রাজনৈতিক উন্নয়ন ও তার সঙ্গে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে মূল ভূমিকা পালন করে। কিন্তু পরাজিত দল/দলগুলি চেষ্টা করে শাসকদল তথা সরকারের বিরুদ্ধে পুনরায় সামরিক বা গণঅভ্যুত্থান ঘটানোর। বাংলাদেশে মুজিব প্রতিষ্ঠিত আওয়ামী লীগ বা বেগম খালেদা জিয়া অনুসারী দলের ভূমিকার উল্লেখ করা যেতে পারে। আবার, উত্তর-ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে (যেমন, জিম্বাবুয়ে, ঘানা) দেখা যায়, বহুদলীয় ব্যবস্থার পতন ঘটিয়ে একটি মাত্র রাজনৈতিক দল গণতন্ত্রের সার্থক রূপদানে সচেষ্ট হয়েছে।

৮২.৮ রাজনৈতিক দলের ভবিষ্যৎ

রাজনৈতিক দলের প্রায় শুরু থেকেই রাজনৈতিক দলের কার্যকারিতা ও ভূমিকার প্রতি অবিশ্বাস ও সন্দেহ লক্ষ করা যায়। আমেরিকায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অন্যতম টমাস জেফারসন ছিলেন দলব্যবস্থার প্রতি আস্থাশীল। কারণ, তাঁর বিশ্বাস ছিল দলব্যবস্থা সমাজের সংহতি ও শান্তির পরিপন্থী। অন্যতম উদারনীতিবাদী তাত্ত্বিক জন স্টুয়ার্ট মিলও চিন্তিত ছিলেন, যাতে রাজনৈতিক দলের উপস্থিতি ব্যক্তির স্বাধীনতা ও স্বকীয়তাকে বিনষ্ট না করে। সম্প্রতি অবশ্য রাজনৈতিক দলের প্রতি অনাস্থার কারণ কিছুটা ভিন্ন। গণতন্ত্রের পীঠস্থান বলে পরিচিত দেশগুলিতে যেমন— ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে রাজনৈতিক দলগুলির প্রতি সাধারণ মানুষের নেতিবাচক মনোভাব, রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণে অনীহা, রাজনৈতিক দলগুলিতে সদস্যসংখ্যা হ্রাস, ভোটদাতাদের ভোটদান থেকে বিরত থাকা প্রভৃতি বিষয়গুলি রাজনৈতিক দলগুলির প্রতি জনগণের বিরূপতাই প্রমাণ করে। রাজনৈতিক দলগুলির প্রতি জনগণের এই ক্রমবর্ধমান বীতরাগের কয়েকটি কারণকে চিহ্নিতকরণ করা যেতে পারে।

প্রথমত, সম্প্রতি রাজনৈতিক দলের গঠন ও কার্যকলাপের ধরনের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। অধিকাংশ রাজনৈতিক দলই প্রকৃতিগতভাবে মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যক্তিদ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং প্রকৃতিগতভাবে আমলাতান্ত্রিক। এর ফলে সাধারণ মানুষের সঙ্গে রাজনৈতিক দলের সম্পর্কের মধ্যে এক ব্যাপক ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে। রাজনৈতিক সমাবেশে হাজির থাকা, কমিটিতে ঊর্ধ্বতন নেতৃবৃন্দের বক্তব্য শোনা ছাড়া অন্য কোনো সক্রিয় ভূমিকা লক্ষ করা যায় না।

দ্বিতীয়ত, সরকার গঠনের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকারী হয়ে রাজনৈতিক দলের প্রকৃতিগত পরিবর্তন ঘটতে থাকে। নেতৃবৃন্দের মনে এক ধরনের 'প্রভু' মানসিকতা তৈরি হতে থাকে। রাজনৈতিক দলে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সমাজসেবার পরিবর্তে এই অংশগ্রহণ এক জীবিকা বা পেশা হিসাবে বিবেচিত হতে থাকে। কর্তৃত্বের প্রতি আসক্তি, প্রলোভন, উৎকোচগ্রহণ, ক্ষমতার অপব্যবহার, নির্বাচনযুদ্ধে পরিত্রাতা হিসাবে দুর্বৃত্তদের উপর নির্ভরশীলতা প্রভৃতি বিষয়গুলি রাজনৈতিক দলকে জনগণের এক সহযোগী সংগঠন হিসাবে প্রতিষ্ঠিত না করে ঊর্ধ্বতন এক সংস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

তৃতীয়ত, বিদ্যমান সমাজকাঠামোর মধ্যে বিশেষ করে অনুন্নত ও বৈষম্যমূলক সমাজে সামাজিক সমস্যাগুলির মোকাবিলা করা প্রায় দুরূহ ব্যাপার। অথচ, রাজনৈতিক দলগুলি বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে জনগণকে ক্রমাগত এক আশ্বাসবাণী তথা সমস্যামুক্ত সমাজ-প্রতিষ্ঠার কথা শুনিয়ে যায়। ফলস্বরূপ, যখন ক্রমাগতভাবে জনগণ রাজনৈতিক দলপুষ্ট সরকারের সমস্যা সমাধানের ব্যর্থতার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে থাকে, তখন সামগ্রিকভাবেই রাজনৈতিক দলের প্রতি এক বীতশ্রদ্ধভাব গড়ে ওঠে।

চতুর্থত, প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের নির্বাচনী প্রক্রিয়ার যৌক্তিকতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়। দাবি করা হয়, সার্বজনীন ভোটাধিকারের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ তথা ভোটদাতাগণ তাদের পছন্দমতো প্রার্থীদের নির্বাচিত করেন। আসলে, প্রার্থী মনোনয়নের বিষয়ে ভোটদাতাদের কোনো পছন্দের অধিকারই থাকে না। প্রার্থীদের বাছাই করে নেতৃবৃন্দ। ভোটদাতাগণ শুধুমাত্র দলীয় নেতৃবৃন্দ কর্তৃক বাছাইকরা প্রার্থীদের মধ্যেই তাদের পছন্দ/অপছন্দকে প্রকাশ করতে পারে। তাছাড়া, কোনো দলীয় সমর্থক যদি দেখে তার দলের (ধরা যাক X) যে প্রার্থী (ধরা যাক A) দলীয় নেতৃবৃন্দ কর্তৃক মনোনীত হয়েছে তার তুলনায় অন্যদলের (Y) প্রার্থী (B) অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন সেক্ষেত্রে ভোটদাতার পক্ষে প্রার্থী নির্বাচনে এক সমস্যা দেখা দেয়। পছন্দ দলের অপছন্দ প্রার্থী বনাম অপছন্দ দলের পছন্দের প্রার্থী — কে অধিকতর কাম্য, বর্তমান নির্বাচনী ব্যবস্থায় এই প্রশ্নের কোনো সদুত্তর নেই।

পঞ্চমত, দলত্যাগবিরোধী আইন অনুযায়ী দলীয় ভিত্তিতে নির্বাচিত সদস্যগণ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সিদ্ধান্ত দ্বারা কাজ করতে বাধ্য। এক্ষেত্রে, দলীয় শৃঙ্খলার অজুহাতে নির্বাচিত সদস্যদের বিবেকের স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে দলের তথা কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের 'দাস'-এ পরিণত করেছে।

ষষ্ঠত, বর্তমান শিল্পোত্তর (Post-Industrial) সমাজব্যবস্থায় কর্মী নাগরিক বর্তমানে মিডিয়া নাগরিকে পরিণত হয়েছে। উত্তর আধুনিক/উত্তর-শিল্পোত্তর সমাজে সামাজিক মানুষ বস্তুত পণ্যভোগী মানুষ। এ ধরনের মানুষের পক্ষে গণতন্ত্রকে সফল করার জন্য যে ধরনের দায়িত্ব পালন করা প্রয়োজন তা সম্ভবপর হয় না।

সর্বোপরি, বিংশ শতকের আশির দশক পর্যন্ত প্রতিটি রাজনৈতিক দলেরই কোনো না কোনো

শ্রেণী সমর্থন থাকত। যেমন, কমিউনিস্ট দলগুলির পিছনে শ্রমিক শ্রেণীর সমর্থন বা রক্ষণশীল/উদারনৈতিক দলগুলির পিছনে ভূস্বামী/পুঁজিপতিদের সমর্থন। কিন্তু বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার গুণগত পরিবর্তন, প্রযুক্তির প্রসার, কায়িক শ্রমনির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থার ক্রমহ্রাসমান চেহারা, অফিস, আদালত, শিক্ষা, স্বাস্থ্যবিভাগে উচ্চবেতনভোগী কর্মচারীর সংখ্যাবৃদ্ধি, জনকল্যাণমূলক কর্মসূচির প্রসার প্রভৃতি বিষয়গুলি সাবেকি শ্রেণীগুলির প্রকৃতি ও পারস্পরিক সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটিয়েছে। ফলে, রাজনৈতিক দলগুলির পক্ষে স্থায়ী সমর্থক হিসাবে কোনো দলকে সুস্পষ্টভাবে পাওয়া যাচ্ছে না। তাছাড়া, নতুন প্রজন্মের কাছে অন্যান্য বিষয়গুলি যেমন— নারী-পুরুষের বৈষম্য, ধর্মীয়/নৃকুল বৈষম্য, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বৈষম্য, পরিবেশ সংরক্ষণ, মানবাধিকার রক্ষা প্রভৃতি বিষয়গুলি অধিকতর গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হচ্ছে। এর ফলে উপরোক্ত বিষয়গুলি নিয়ে রাজনৈতিক আন্দোলন ক্রমশ সম্প্রসারিত হচ্ছে। সাবেকি রাজনৈতিক দলবিরোধী রাজনীতি (antiparty politics) ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। এই নতুন সামাজিক আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী একক ইস্যুভিত্তিক গোষ্ঠীগুলি সাবেকি রাজনৈতিক দলের পরিপূরক অথবা বিকল্প হয়ে উঠবে — এ সম্পর্কে এই মুহূর্তে সুনিশ্চিতভাবে কিছু বলা সম্ভবপর নয়।

৮২.৯ সারাংশ

আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হল রাজনৈতিক দল। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উদ্ভব ও প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে গণপ্রতিনিধিত্বের দাবিতে রাজনৈতিক দলেরও উদ্ভব ঘটতে থাকে।

রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা প্রদানের ক্ষেত্রে রাজনীতিবিদদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। প্রথমদিকের তাত্ত্বিকগণ রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে মতাদর্শের উপর অত্যধিক গুরুত্ব দেন। যেমন— ১৮৬১ খ্রিঃ বেঞ্জামিন কন্সটান্ট রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, রাজনৈতিক দল হল একই রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী কতিপয় ব্যক্তির সমষ্টি। আর এক দল তাত্ত্বিক রাজনৈতিক মতাদর্শের পরিবর্তে রাজনৈতিক কার্যকারিতার ভিত্তিতে রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা দেন। যেমন— কোলম্যান এবং রসবার্গ মনে করেন, রাজনৈতিক দল হল সেই সমস্ত সংগঠন যা হয় এককভাবে অথবা জোটবদ্ধভাবে অথবা অনুরূপ সংগঠনের সঙ্গে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে কোনো নির্দিষ্ট বা প্রত্যাশিত সার্বভৌম রাষ্ট্রের সরকারি কর্মীবৃন্দের ও নীতিসমূহের উপর আইনগত নিয়ন্ত্রণ দখলের অথবা বজায় রাখার সুস্পষ্ট এবং ঘোষিত উদ্দেশ্য নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত। মার্কসীয় তাত্ত্বিকগণ রাজনৈতিক দলকে শ্রেণী প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করেন। বস্তুত, রাজনৈতিক দলের বিষয়টি এতই জটিল এবং পরিবর্তনশীল যে রাজনৈতিক দলের কোনো সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা প্রদান সম্ভবপর নয়।

রাজনৈতিক দলের শ্রেণীবিভাগ ঃ মরিস দুভারজার রাজনৈতিক দলের যে শ্রেণীবিভাগ করেন, তা অত্যন্ত ব্যাপক, বহুমুখী ও জটিল। তিনি রাজনৈতিক দলের শ্রেণীবিভাজনের ক্ষেত্রে যে

বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব দিয়েছেন তা হল— (১) রাজনৈতিক দলগুলির শক্তি, (২) দলীয় সদস্যের প্রকৃতি, (৩) উপাদান, এবং (৪) রাজনৈতিক দলের সংখ্যা। রাজনৈতিক দলের শক্তির পরিপ্রেক্ষিতে তিনি রাজনৈতিক দলকে মূলত (১) সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রবণ দল, (২) প্রধান দলসমূহ এবং (৩) ছোটখাটো দল— এই তিনভাগে ভাগ করেন। দলীয় সদস্যের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দলগুলিকে তিনি দুভাগে ভাগ করেন। যথা— (১) ক্যাডার দল এবং (২) মাস (mass) দল। উপাদানের ভিত্তিতে গঠিত বিভিন্ন দলগুলি হল (১) চক্রদল (২) প্রশাখাদল (৩) কোষদল এবং (৪) জঙ্গীদল। দলের সংখ্যার ভিত্তিতে যে শ্রেণীবিভাজন তা আসলে দলীয় ব্যবস্থার শ্রেণীবিভাজন। দলের সংখ্যানুযায়ী রাজনৈতিক দলব্যবস্থাকে দুভারজার (১) একদলীয়, (২) দ্বিদলীয় এবং (৩) বহুদলীয়— এই তিনভাগে ভাগ করেন। দুভারজার ছাড়াও জাপ, অ্যালান বল প্রমুখ তাত্ত্বিকগণও রাজনৈতিক দলের শ্রেণীবিভাগ করেন।

রাজনৈতিক দলের কাজ ঃ বিভিন্ন তাত্ত্বিকদের বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক দলের কতকগুলি সাধারণ কাজের উল্লেখ করা যেতে পারে। (১) প্রতিনিধিত্বকরণ, (২) রাজনৈতিক নিয়োগ ও বাছাইকরণ, (৩) স্বার্থের সমষ্টিবদ্ধকরণ ও গ্রন্থিকরণ, (৪) রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ, (৫) লক্ষ্য নির্ধারণ, (৬) সরকার গঠন। (৭) সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধন, (৮) মনস্তাত্ত্বিক, (৯) দলকে সংগঠিত করা ও সঠিক নেতৃত্ব প্রদান, (১০) অর্থসংগ্রহ ইত্যাদি।

রাজনৈতিক দলের ভূমিকা ঃ যে কোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলগুলি যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তা নিম্নরূপ— (১) পুরসমাজ ও সরকারের মধ্যে যোগসূত্র বজায় রাখা, (২) রাজনৈতিক ক্ষমতার বৈধতাসাধন, (৩) সমাজ পরিবর্তনে সহায়তা দান, (৪) সমাজের উপকরণ ও উৎপাদন সরবরাহকারী সংস্থা হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন, (৫) দেশের উন্নয়নে অংশগ্রহণ (৬) সাংস্কৃতিক তথা সমাজের সদস্যদের মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গিগত ও আচরণগত পরিবর্তন ঘটানো ইত্যাদি।

রাজনৈতিক দলের ভূমিকা বহুলাংশে নির্ভর করে যে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দল ক্রিয়াশীল সেই ব্যবস্থার প্রকৃতির উপর। একারণে রাজনৈতিক দলের ভূমিকার আলোচনা রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটেই হওয়া বাঞ্ছনীয়। বস্তুত তিন ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক দলের ভূমিকার আলোচনা করা যেতে পারে— (১) প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দল (২) কর্তৃত্বমূলক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দল, এবং (৩) সদ্য-প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা।

প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের অবস্থান তিন ধরনের হতে পারে। (১) অন্যান্য দলের উপস্থিতি থাকলেও একটি রাজনৈতিক দলই প্রাধান্য বিস্তার করে (যেমন— দক্ষিণ আফ্রিকা)। (২) রাজনৈতিক নির্বাচনে মূলত দুইটি রাজনৈতিক দল প্রতিযোগিতা করে (যেমন— মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন)। (৩) বহু রাজনৈতিক দলের উপস্থিতি এবং কোনো একক রাজনৈতিক দলের পক্ষে

সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন সম্ভবপর না হওয়ায় জোটবদ্ধ সরকার গঠন (যেমন— বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ড প্রভৃতি দেশগুলি)।

স্বৈরতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায়ও রাজনৈতিক দলের ভূমিকা বিভিন্ন হতে পারে। যেমন— সৌদি আরব, কুয়েত প্রভৃতি দেশে রাজনৈতিক দল গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বাধা দেওয়া হয়। সামরিক শাসননির্ভর স্বৈরতান্ত্রিক দেশেও রাজনৈতিক দলগুলির প্রসার সেরকম ঘটে না (যেমন— আফ্রিকার স্বৈরতান্ত্রিক দেশগুলি)। আবার কোনো কোনো দেশে (যেমন— হিটলার শাসিত জার্মানীতে) রাজনৈতিক দল অত্যন্ত ক্ষমতাসম্পন্ন হলেও আসলে তা সামরিক শাসকের ক্ষমতা। দলের প্রতি আনুগত্য আসলে নেতার প্রতি আনুগত্য। কমিউনিস্ট ব্যবস্থায় দায়িত্বশীল পদগুলি দলীয় সদস্যদের হাতে থাকে। বিরোধীদের শ্রেণীশত্রু তথা সমাজতন্ত্রের শত্রু বলে অভিহিত করে শাস্তিদানে উদ্যত হয় শ্রেণী শোষণের অবসানের নামে রাষ্ট্রের বিলুপ্তির পরিবর্তে রাষ্ট্রকে আরো শক্তিশালী করে।

সদ্য-প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় গণতন্ত্রের গণভিত অত্যন্ত দুর্বল থাকায় দলীয় সংহতির অভাব, ব্যাপক সদস্যসংখ্যার অনুপস্থিতি, রাজনৈতিক চেতনার অভাব এমনকি সুস্পষ্ট মতাদর্শের অভাবও দেখা যায়।

৮২.১০ অনুশীলনী

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

১) রাজনৈতিক দলের উদ্ভবের প্রেক্ষাপট উল্লেখ করুন।

২) রাজনৈতিক দলের কার্যাবলী আলোচনা করুন।

৩) রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের ভূমিকা বিশ্লেষণ করুন।

৪) রাজনৈতিক দলের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আপনার মতামত ব্যক্ত করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন ঃ

১) রাজনৈতিক দল বলতে কী বুঝায় ?

২) সদ্য-প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক কাঠামোয় রাজনৈতিক দলের ভূমিকার বিশ্লেষণ করুন।

৩) কর্তৃত্বমূলক রাষ্ট্রকাঠামোয় রাজনৈতিক দলের ভূমিকার মূল্যায়ন করুন।

৪) উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের ভূমিকার বিশ্লেষণ করুন।

৫) দলীয় উপাদানের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দলের শ্রেণীবিভাগ করুন।

৬) দলীয় সদস্যের প্রকৃতির ভিত্তিতে রাজনৈতিক দলের শ্রেণীবিভাগ করুন।

৮২.১১ গ্রন্থপঞ্জী

1. Almond G. A. and Powell G. B. (Jr.) (1966) — Comparative Politics - A Developmental Approach, Oxford.
2. Almond G. A., Powell G. B. (Jr.) and Dalton R. J. (2000/2001 Indian Reprint) — Comparative Politics Today – A World View, Delhi, Replika Press Ltd.
3. Ball R. Alan (1973) — Modern Politics and Government.
4. Blondel J. (1985) — Comparative Government – A Reader.
5. Duverger Maurice (1954/1979 Indian Edn.) — Political Parties – New Delhi, B. I. Pub.
6. Eckstein H. and Apter D. E. (1989 Indian Reprint) — Comparative Politics – A Reader, Delhi, Surjeet Pub.
7. Rod Hague and Martin Harrop (2001 5th Edn.) — Comparative Government and Politics - An Introduction, New York, Palgrave.
8. ফিরোজা বেগম (২০০০/২০০১) — সামাজিক পরিবর্তন ও রাজনৈতিক উন্নয়ন, ঢাকা, কাকলি প্রকাশন।
9. মোঃ নজরুল ইসলাম (১৯৮১/১৯৮৭) — রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ব, ঢাকা, পুঁথিঘর লিমিটেড।

একক ৮৩ □ মানব সমাজে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলির ভূমিকা

গঠন

৮৩.০ উদ্দেশ্য

৮৩.১ প্রস্তাবনা

৮৩.২ চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর সংজ্ঞা

৮৩.৩ চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী ও রাজনৈতিক দলের মধ্যে পার্থক্য

৮৩.৪ চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর শ্রেণীবিভাগ

৮৩.৫ চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর কার্যাবলী ও কার্যসম্পাদনের ধরন

৮৩.৬ রাজনৈতিক ব্যবস্থায় চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ভূমিকা

৮৩.৬.১ উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ভূমিকা

৮৩.৬.২ কর্তৃত্বমূলক রাষ্ট্রে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ভূমিকা

৮৩.৬.৩ সদ্য-প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক কাঠামোর চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ভূমিকা

৮৩.৭ সারাংশ

৮৩.৮ অনুশীলনী

৮৩.৯ গ্রন্থপঞ্জী

৮৩.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর প্রকৃতি, কার্যকারিতা ও ভূমিকার সঙ্গে পরিচিত করানোর উদ্দেশ্যে লিখিত হয়েছে। এই এককটি পাঠ করে আমরা যে সমস্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারব তা হল—

- চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর প্রকৃতি,
- চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর সঙ্গে রাজনৈতিক দলের পার্থক্য,
- চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর কার্যাবলী ও কার্যসম্পাদনের ধরন,
- বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ভূমিকা।

৮৩.১ প্রস্তাবনা

যে কোনো দেশের রাজনীতির প্রকৃতি জানার জন্য সেই দেশের শুধুমাত্র রাষ্ট্রকাঠামো ও তার কার্যকারিতার বিশ্লেষণ যে যথেষ্ট নয়, সে সম্পর্কে বিংশ শতকের গোড়ার দিকেই সমাজতাত্ত্বিক/রাষ্ট্রদার্শনিকগণ সচেতন হতে থাকেন। ১৯০৮ সালে প্রকাশিত আর্থার বেন্টলের (Arther F. Bentley) The Process of Government এবং গ্রাহাম ওয়ালেসের (Graham Wallace) Human Nature in Politics গ্রন্থদুটি রাজনীতির স্বরূপ উদ্ঘাটনে সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলির ভূমিকার বিশ্লেষণ করেন। এরপর থেকেই শুরু হয় রাজনীতির বিশ্লেষণে সামাজিক গোষ্ঠী ও সামাজিক প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণ। মার্কসীয় তাত্ত্বিকগণ রাজনীতির বিশ্লেষণে সামাজিক গোষ্ঠী বিশেষত সামাজিক শ্রেণীর প্রকৃতি উদ্ঘাটন করেন। বিংশ শতকের প্রথমদিকের বহুত্ববাদী তাত্ত্বিকগণ এবং শেষের দিকের নব্য বহুত্ববাদী তাত্ত্বিকগণ শুধুমাত্র শ্রেণীর ভূমিকার উপর নজর না রেখে সমাজের অন্যান্য গোষ্ঠীগুলির পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার উপর আলোকপাত করতে থাকেন। সমাজ শুধুমাত্র অর্থনৈতিক অবস্থানগত অর্থাৎ উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের দিক থেকেই শ্রেণীবিভক্ত নয়; ধর্ম, বয়স, নৃকুল (Ethnic), ভাষা, নারী-পুরুষ ভেদেও বিভক্ত। নব্য বহুত্ববাদী তাত্ত্বিকদের মতে, উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সার্থক হয়ে উঠতে পারে যদি সমাজের ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থবাহক গোষ্ঠীগুলির পারস্পরিক কার্যকলাপের অবাধ স্বাধীনতা থাকে। এই গোষ্ঠীগুলি কোনো কোনো ক্ষেত্রে চাপসৃষ্টির মাধ্যমে অপরের সিদ্ধান্তকে বিশেষত রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কার্যপ্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে। শুরু হয় সমাজের বিভিন্ন চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলির গঠন, প্রকৃতি, কার্যকারিতার ধরন ও গুরুত্বের বিশ্লেষণ। এই এককে আমরা এই বিষয়টির উপর আলোকপাত করব।

৮৩.২ চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর সংজ্ঞা

চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর প্রকৃতি ও কার্যকারিতার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রথমেই যে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তা হল এর নামকরণগত সমস্যা। বিভিন্ন তাত্ত্বিকগণ চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর পরিবর্তে বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করেন— যেমন, স্বার্থগোষ্ঠী (Interest group), লবি (Lobby), রাজনৈতিক গোষ্ঠী (Political group), মনোবৃত্তিবাহক গোষ্ঠী (Attitude group) ইত্যাদি। বেশ কিছু তাত্ত্বিক রয়েছেন যাঁরা এই শব্দগুলির ব্যবহার করেছেন কোনোরূপ পার্থক্য না করেই। অপরদিকে, অনেকে রয়েছেন যাঁরা এই শব্দগুলির ব্যবহারের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সতর্ক থেকেছেন এবং একটির সঙ্গে অপরটির পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। যেমন— আলমন্ড, পাওয়েল, পিয়ার্স, হল্টজম্যান, উটন প্রমুখ তাত্ত্বিকগণ Pressure group (চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী)-এর পরিবর্তে Interest group (স্বার্থগোষ্ঠী) শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করেছেন। আলফ্রেড গ্রাজিয়া (Alfred Grazia) Pressure group এবং Lobby শব্দদুটিকে সমার্থক হিসাবে ব্যবহার করেছেন। অপরদিকে জর্জ ব্লাঙ্কস্টেন (George I Blanksten) Interest group-এর পরিবর্তে Political group

ব্যবহার করেন। অ্যালান বল-এর মতে Pressure group হচ্ছে এমন এক গোষ্ঠী যার সদস্যগণ অংশীদারি মনোবৃত্তির (Shared attitude) ধারক ও বাহক। অথচ এই অংশীদারি মনোবৃত্তি না থাকলে Interest group গড়েই উঠতে পারে না। লাথাম (Earl Lathan)-এর মতে, স্বার্থগোষ্ঠীগুলি তখনই রাজনৈতিক কারক (Political actor) হয়ে ওঠে, যখন তারা সক্রিয়ভাবে সরকারি নীতিকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে; যখন তারা নিজেদের পছন্দ মতো নিয়মাবলীকে আইনে পরিণত করতে বা গোষ্ঠীস্বার্থে সরকারি কর্মীদের ক্ষমতার ব্যবহারকে প্রভাবিত করতে সচেষ্ট হয় তখন স্বার্থগোষ্ঠী প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক তাৎপর্য লাভ করে। এই ধরনের কাজের জন্য স্বার্থগোষ্ঠী যখন তৎপর হয় তখন স্বার্থগোষ্ঠীকে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী বলা হয়।

বস্তুত যে কোনো সামাজিক গোষ্ঠীর উদ্ভবের পিছনে কোনো না কোনো ব্যক্তি/গোষ্ঠী স্বার্থ কাজ করে। এদিক থেকে যে কোনো সামাজিক গোষ্ঠীই হল স্বার্থগোষ্ঠী। কিন্তু যে কোনো স্বার্থগোষ্ঠীই চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী নয়। একমাত্র সেইসমস্ত স্বার্থগোষ্ঠীকেই চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী বলা যাবে যারা চাপসৃষ্টির মাধ্যমে সরকারি/বেসরকারি সিদ্ধান্তগ্রহণ/কার্যকলাপকে প্রভাবিত করে। এদিক থেকে বলা যায় রাজনৈতিক দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ স্বার্থগোষ্ঠীই হল চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী। আমাদের আলোচনায় চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী শব্দগুচ্ছকে ব্যবহার করা হলেও আলমন্ড এবং পাওয়েল-এর মতো তাত্ত্বিকগণ যেহেতু Pressure group এবং Interest group-এর মধ্যে কোনোরূপ পার্থক্য করেননি সেহেতু আলোচনায় স্বার্থগোষ্ঠী (Interest group)-এর ব্যবহারও মাঝে মাঝে এসে যাবে।

সব সামাজিক গোষ্ঠীকেই চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী মনে করলে তাদের দু ভাগে ভাগ করা যাবে। অধিকাংশ গোষ্ঠীই হল স্বার্থবাহী গোষ্ঠী এবং কোনো কোনো গোষ্ঠী হল বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি বা মনোবৃত্তি সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী। যেমন— Amnesty International, এরা বিভিন্ন দেশের মানুষ ও সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে থাকে একটি বিশেষ মনোভাব গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে—বন্দী ও অপরাধীদের সম্পর্কে সহানুভূতিশীল ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারের জন্য।

৮৩.৩ চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী ও রাজনৈতিক দলের মধ্যে পার্থক্য

চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী ও রাজনৈতিক দল-এর মধ্যে গঠনগত, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগত এবং কার্যগত দিক থেকে যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষ করা যায়। প্রথমত, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী সংকীর্ণ স্বার্থের ভিত্তিতে গঠিত। অপরদিকে, রাজনৈতিক দল সাধারণত বৃহত্তর স্বার্থের ভিত্তিতে গঠিত। এর ফলে রাজনৈতিক দলে জাতীয় স্বার্থের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয় কিন্তু চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর কাছে সাধারণত জাতীয় স্বার্থের পরিবর্তে সংকীর্ণ গোষ্ঠীস্বার্থই প্রাধান্য লাভ করে। অবশ্য কোনো কোনো রাজনৈতিক দলের যেমন, আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে জাতীয় স্বার্থের প্রাধান্য দেখা যায় না। দ্বিতীয়ত রাজনৈতিক দল

সুনির্দিষ্ট আদর্শ ও কর্মসূচির ভিত্তিতে গঠিত এক বৃহৎ প্রতিষ্ঠান। অপরদিকে, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর কাছে সুনির্দিষ্ট আদর্শ ও কর্মসূচির পরিবর্তে তাৎক্ষণিক সুবিধালাভই অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

তৃতীয়ত, রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল রাজনৈতিক দলের আসল লক্ষ্য এবং একারণে রাজনৈতিক দলগুলি প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। প্রার্থী মনোনয়ন এবং মনোনীত প্রার্থীকে নির্বাচিত করানোর ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলি ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। বিপরীতভাবে, রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর আসল লক্ষ্য নয়। পরিবর্তে, সরকার/সরকারি সংস্থাগুলির উপর চাপ সৃষ্টি করে সুযোগসুবিধা আদায় করাই তার প্রধান লক্ষ্য। একারণে ক্ষমতা দখলের জন্য নির্বাচনের মতো আনুষ্ঠানিক/প্রাতিষ্ঠানিক কোনো প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে হয় না। অবশ্য কখনও কখনও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলি কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের বা কোনো প্রার্থীর হয়ে নির্বাচনী প্রচারে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে কিন্তু নিজে প্রার্থী দেয় না।

চতুর্থত, অ্যালান বল-এর মতে, রাজনৈতিক দলের কাজ হচ্ছে স্বার্থের সমষ্টিকরণ (Interest aggregation). অপরদিকে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর কাজ হল স্বার্থের গ্রন্থিকরণ (Interest articulation)। চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী কোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে নিজেদের দাবি ও মনোবৃত্তিকে প্রকাশ করে। রাজনৈতিক দলের কাজ হল এই ধরনের বিভিন্ন দাবি ও কর্মসূচিকে ঐক্যবদ্ধ ও আরো ব্যাপক করে তোলা। বস্তুত, রাজনৈতিক দল বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী স্বার্থ, নীতি ও আদর্শের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে তা সার্বজনীন করার চেষ্টা করে।

পঞ্চমত, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর সদস্যসংখ্যা তুলনামূলকভাবে রাজনৈতিক দলের সদস্যসংখ্যার চেয়ে কম। দলীয় শৃঙ্খলা রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রে অধিকতর কঠোর, সাংগঠনিক কাঠামো আরো দৃঢ়।

ষষ্ঠত, রাজনৈতিক দল দলীয় নীতি, আদর্শ ও কর্মসূচির মাধ্যমে জনমত আদায়ে সচেষ্ট হয়। ব্যাপক জনসমর্থনই রাজনৈতিক দলের অস্তিত্বের ভিত্তি। অপরদিকে, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর কাছে জনসমর্থনের বিষয়টি সবসময় যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে বিবেচিত হয় না।

সপ্তমত, রাজনৈতিক দল যেহেতু বিভিন্ন স্বার্থের সমষ্টিকরণ করে থাকে সেহেতু স্বার্থের ভিন্নতার কারণে রাজনৈতিক দলের মধ্যেকার কোন্দল দেখা যায়। চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মধ্যেকার কোন্দল তুলনায় অনেক কম।

পরিশেষে বলা যায়, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী ও রাজনৈতিক দলের মধ্যে উপরোক্ত পার্থক্য সত্ত্বেও অনেক সময় এই পার্থক্য নিধারণ কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। আধুনিককালে যে কোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিশেষ করে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী ও রাজনৈতিক দল বিভিন্ন গোষ্ঠীস্বার্থকে সংবদ্ধকরণ ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উভয়েরই কাজ হল গোষ্ঠীস্বার্থকে সুনির্দিষ্টকরণ করা এবং তা পূরণের জন্য যথাযথ স্থানে উপস্থাপন করা। তাছাড়া, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী

ও রাজনৈতিক দল — উভয়েই সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে এক যোগসূত্র হিসাবে কাজ করে। একারণে উভয়ের কার্যকারিতা ও ভূমিকার মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। সর্বোপরি, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী পরবর্তীকালে রাজনৈতিক দলে রূপান্তরিত হতে পারে। ইউরোপে বিশেষ করে জার্মানীতে গ্রীন সংগঠনগুলির উদ্ভব চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হিসাবে, কিন্তু পরবর্তীকালে ঐ সমস্ত চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলি রাজনৈতিক দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে।

৮৩.৪ চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর শ্রেণীবিভাগ

চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর প্রকৃতি ও কার্যকারিতার বৈচিত্র্য এতই ব্যাপক যে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর শ্রেণীবিভাগ করা এক দুরূহ ব্যাপার। আলমন্ড এবং পাওয়েল রাজনৈতিক ব্যবস্থায় চার ধরনের স্বার্থগোষ্ঠীর (পূর্বেই বলা হয়েছে, উপরোক্ত তাত্ত্বিকগণ চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর পরিবর্তে স্বার্থগোষ্ঠী শব্দ ব্যবহার করেন) উল্লেখ করেন — (এক) প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থগোষ্ঠী (Institutional Interest group); (দুই) সংঘমূলক স্বার্থগোষ্ঠী (Associational Interest group); (তিন) অ-সংঘমূলক স্বার্থগোষ্ঠী (Non-Associational Interest group) এবং (চার) স্বতঃস্ফূর্ত স্বার্থগোষ্ঠী (Spontaneous/Anomic Interest group)।

(১) প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থগোষ্ঠী ঃ উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দল, আইনসভা, বিচারবিভাগ, সৈন্যবাহিনী, আমলাতন্ত্র প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক সংগঠন গড়ে ওঠে। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সদস্যপদ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বৃত্তি বা পেশামূলক। এই সমস্ত প্রাতিষ্ঠানিক গোষ্ঠীগুলি নিজেদের স্বার্থ-সংরক্ষণের জন্য সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ব্যক্তিদের/রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগে কার্যসম্পাদনকারী পদাধিকারীদের উপর চাপসৃষ্টি করে থাকে।

(২) সংঘমূলক স্বার্থগোষ্ঠী ঃ শ্রমিক সংগঠন, কৃষক সংগঠন ব্যবসায়ী বা শিল্পপতিদের সংগঠন ইত্যাদি হল সংঘমূলক স্বার্থগোষ্ঠীর উদাহরণ। এই ধরনের স্বার্থগোষ্ঠীর প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে— (১) নিজগোষ্ঠী স্বার্থের প্রকাশ্যে প্রতিনিধিত্ব করা; (২) স্বার্থ ও দাবির পক্ষে সুবিন্যস্তভাবে নিয়মনীতি বা পদ্ধতি প্রণয়ন করা; (৩) এই সমস্ত কাজকর্ম পরিচালনার জন্য সবসময়ের পেশাদার কর্মীসহ সংগঠন গড়ে তোলা; (৪) গোষ্ঠীর দাবিদাওয়া অন্যান্য রাজনৈতিক কাঠামো যেমন, রাজনৈতিক দল, আমলা-তন্ত্র, আইনসভা প্রভৃতির নিকট উপস্থাপিত করা।

(৩) অ-সংঘমূলক স্বার্থগোষ্ঠী ঃ আত্মীয় সম্পর্ক গোষ্ঠী (Kinship group), রক্তসম্পর্ক গোষ্ঠী (Lineage group), নৃ-কুল গোষ্ঠী (Ethnic group), আঞ্চলিক গোষ্ঠী (Regional group), ধর্মীয় গোষ্ঠী (Religious group), মর্যাদা গোষ্ঠী (Status group), জাতগোষ্ঠী (Caste group)— প্রভৃতি গোষ্ঠীগুলি অ-সংঘমূলক স্বার্থগোষ্ঠী। এই ধরনের গোষ্ঠীগুলির আনুষ্ঠানিক কোনো সংগঠন সাধারণত থাকে না

এবং স্বার্থের গ্রন্থিকরণের জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থাও নেই। এই সমস্ত গোষ্ঠীগুলি ধীরে ধীরে সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং সংগঠনও গড়ে তোলে। কিন্তু এই সক্রিয়তার কোনো ধারাবাহিকতা থাকে না। একারণে এই ধরনের স্বার্থগোষ্ঠীগুলি রাজনৈতিক ব্যবস্থায় খুব একটা প্রভাব ফেলতে পারে না। অবশ্য অ-সংঘমূলক স্বার্থগোষ্ঠীগুলি যে কোনো সময় সংঘমূলক স্বার্থগোষ্ঠীতে পরিণত হতে পারে। যেমন, বর্তমান ভারতে ধর্মীয় ও জাত সংগঠনগুলিকে প্রকৃত অর্থে অ-সংঘমূলক গোষ্ঠী বলা কতদূর সঙ্গত সে সম্পর্কে প্রশ্ন উঠতে পারে।

(৩) স্বতঃস্ফূর্ত স্বার্থগোষ্ঠী ঃ অনেকসময় কোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অনেকটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে হঠাৎ করে ঘটনাকে কেন্দ্র করে এক ধরনের স্বার্থগোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটে। দাঙ্গার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন, বাস দুর্ঘটনা, অবরোধ, রাজনৈতিক হত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রভৃতি ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বার্থগোষ্ঠী গড়ে ওঠে। এই ধরনের গোষ্ঠীগুলির উদ্ভব যেমন— স্বতঃস্ফূর্ত, স্থায়িত্ব ও স্বল্পকালীন। অবশ্য কখনও কখনও এই ধরনের গোষ্ঠী সংগঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে সংঘমূলক গোষ্ঠীতে পরিণত হতে পারে। হরিজন সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে ওঠা স্বার্থগোষ্ঠী পরবর্তীকালে সংঘমূলক স্বার্থগোষ্ঠীতে রূপান্তরিত হবার ঘটনাটি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

টি ম্যাথুস (T. Mathews - 1989) গোষ্ঠীর লক্ষ্য (Aims), সমর্থন (Support), মর্যাদা (Status), উপকৃত ব্যক্তি (Beneficiaries) এবং অর্থনৈতিক কাজকর্মের (Economic activities) ভিত্তিতে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর যে শ্রেণীবিভাগ করেন তা হেগ (Rod Hogue), হ্যারপ (Martin Harrop) এবং ব্রেসলিন (Shaun Breslin) Comparative Politics (1952-3rd ed.) গ্রন্থে নিম্নরূপ উপস্থাপিত করেছেন।

লক্ষ্য (Aims)

রক্ষণাবেক্ষণ গোষ্ঠী (Protective group)	ঃ সেই সমস্ত গোষ্ঠী যা তার সদস্যভুক্ত ব্যক্তিদের স্বার্থ সংরক্ষণ করে। যেমন— শ্রমিক গোষ্ঠী।
উৎকর্ষবৃদ্ধিকারী গোষ্ঠী (Promotional group)	ঃ সেই সমস্ত গোষ্ঠী বা কোনো এক ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষার পরিবর্তে সাধারণ বিষয়ের উন্নয়নে সচেষ্ট হয়। যেমন— পরিবেশ বাঁচাও কমিটি।

সমর্থন (Support)

রুদ্ধ গোষ্ঠী (Closed group)	এই ধরনের গোষ্ঠীর সদস্যপদ সবার জন্য উন্মুক্ত নয়। একমাত্র কোনো পেশা/বৃত্তির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরাই এর সদস্য হতে পারে। যেমন— শিক্ষক সংগঠন, চিকিৎসক সংগঠন ইত্যাদি।

মুক্ত গোষ্ঠী (Open group) : মুক্ত গোষ্ঠীর সদস্যপদ সবার জন্য উন্মুক্ত। অর্থাৎ যে কোনো ব্যক্তি এর সদস্য হতে পারে। যেমন— মানবাধিকার রক্ষণ সমিতি।

মর্যাদা (Status)

অন্তঃগোষ্ঠী (Insider group) : যখন সরকার বা কর্তৃপক্ষ কোনো গোষ্ঠীর সঙ্গে প্রায়শই পরামর্শ করে এবং সরকারও সক্রিয় ভূমিকা পালনের জন্য আহ্বান জানায় সেই সমস্ত গোষ্ঠীকে অন্তঃগোষ্ঠী বলে। যেমন— কানাডায় ব্যাঙ্কার এসোসিয়েশন, ব্রিটিশ জাতীয় কৃষক সংঘ।

বহিঃগোষ্ঠী (Outside group) : সরকার সাধারণত এই ধরনের স্বার্থগোষ্ঠীর সঙ্গে পরামর্শ করে না বা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানায় না। অথবা, সরকার একরকম এড়িয়েই চলে। যেমন— পরমাণু অস্ত্র-নিষিদ্ধকরণ প্রচারকারী সংগঠন।

উপকৃত ব্যক্তির ধরন (Beneficiaries)

যৌথগোষ্ঠী (Collective group) : গোষ্ঠীর কার্যকলাপের সুবিধা শুধুমাত্র গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে না। যারা এই গোষ্ঠীর সদস্য নয় অথচ একই বৃত্তি/পেশার সঙ্গে জড়িত তারাও এর সুফল ভোগ করে। যেমন— কোনো শ্রমিক সংগঠন যখন বেতনবৃদ্ধির দাবি আদায়ে সমর্থ হয় তখন সেই শ্রমিক সংগঠনের সদস্য নয় কিন্তু একই বৃত্তি/পেশার সঙ্গে যুক্ত, তারাও এর সুফল ভোগ করে।

বাছাইকরা গোষ্ঠী (Selective group) : শুধুমাত্র সেই গোষ্ঠীভুক্ত সদস্যরাই সুফল ভোগ করে থাকে। যেমন— সহজবীমা প্রকল্প।

অর্থনৈতিক কার্যাবলী (Economic activities)

করপোরেট (Corporate group) : সেই সমস্ত গোষ্ঠী যা দ্রব্য/সেবা উৎপাদকের স্বার্থ রক্ষা করে। যেমন— উৎপাদক সংস্থা।

মনোবৃত্তি গোষ্ঠী (Attitude group) : সেই সমস্ত গোষ্ঠী যা মানুষের মনোবৃত্তি এবং পছন্দকে গুরুত্ব দেয়। যেমন— SPCA (Society for the Prevention of Cruelty against Animals)

Comparative Politics গ্রন্থের পঞ্চম সংস্করণ (২০০১) অবশ্য হেগ এবং হ্যারপ (অন্যান্য সংস্করণের অপর লেখক ব্রিসলে এই পঞ্চম সংস্করণে অনুপস্থিত) চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলিকে দুভাগে ভাগ করেন— (এক) রক্ষণাত্মক গোষ্ঠী (Protective group) এবং (দুই) উৎকর্ষবৃদ্ধিকারী গোষ্ঠী (Promotional group)। হেগ এবং হ্যারপ মনে করেন, আমরা যখন চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর কথা ভাবি তখন আমাদের মনে প্রথমে যে ধারণাটা গড়ে ওঠে তা মূলত রক্ষণাত্মক গোষ্ঠী যা তার সদস্যদের বস্তুগত স্বার্থরক্ষা করার জন্য গড়ে ওঠে ও সে ব্যাপারে তৎপর হয়। যেমন— শ্রমিক সংঘ, বিভিন্ন বৃত্তিভোগী গোষ্ঠী, মালিক সংঘ ইত্যাদি। এই সমস্ত গোষ্ঠী, যা আবার কার্যকরী গোষ্ঠী (Action group) নামেও পরিচিত, গড়ে ওঠে মূলত সরকারকে প্রভাবিত করে নিজ স্বার্থের অনুকূলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করানোর জন্য। অনেক সময় ভৌগোলিক বা স্থানিক কারণেও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী গড়ে উঠতে পারে। যেমন— কোনো রাস্তার সম্প্রসারণে, জলাধার বা সেতু নির্মাণের প্রয়োজনে কোনো অঞ্চল অধিগ্রহণের ব্যাপারে সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী গড়ে তোলা। এ ধরনের গোষ্ঠীকে নিম্বি (Nimbi–Not In My Backyard) গোষ্ঠী বলা হয়।

(৪) উৎকর্ষ বৃদ্ধিকারী গোষ্ঠী : আর এক ধরনের চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী দেখা যায় যা গোষ্ঠী সদস্যদের স্বার্থরক্ষার চেয়ে মতাদর্শ, মূল্যবোধ, রুচি, আচরণবিধি গড়ে তোলার দিকেই বেশি নজর দেয়। মূলত ৬০-এর দশক থেকে গড়ে উঠতে থাকা এ ধরনের গোষ্ঠীগুলিকে উৎকর্ষ বৃদ্ধিকারী গোষ্ঠী বলে অভিহিত করা হয়। এই সমস্ত গোষ্ঠীগুলি আবার মনোবৃত্তি গোষ্ঠী (Attitude group), কারণ গোষ্ঠী (Cause group), প্রচার গোষ্ঠী (Campaign group) নামেও পরিচিত। উদাহরণস্বরূপ, মানবাধিকার রক্ষা সমিতি বা পরিবেশ বাঁচাও কমিটি ইত্যাদি গোষ্ঠীগুলির উল্লেখ করা যেতে পারে। সব সময় অবশ্য এ ধরনের বিভাজন সুস্পষ্টভাবে করা যায় না। যেমন— নারীর অধিকার-সংক্রান্ত গোষ্ঠীগুলি সমাজের নারী এবং পুরুষের সম্পর্ক, মূল্যবোধ এবং আচরণবিধিকে বিনির্মাণ করতে চায়। এদিক থেকে এই গোষ্ঠী উৎকর্ষ বৃদ্ধিকারী গোষ্ঠী। কিন্তু একইসঙ্গে এই গোষ্ঠীকে রক্ষণাত্মক গোষ্ঠীও বলা চলে। কারণ নারীর অধিকার তথা স্বার্থরক্ষাই এই গোষ্ঠীর প্রধান বিবেচ্য বিষয়।

৮৩.৫ চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর কার্যাবলী ও কার্যসম্পাদনের ধরন

চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীসমূহের অন্যতম প্রধান কাজ হল নিজ নিজ গোষ্ঠীর স্বার্থ আদায় ও সংরক্ষণ করা এবং এর জন্য প্রয়োজনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সরকারের সিদ্ধান্তকে এবং পরবর্তীকালে সিদ্ধান্ত প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহকে নিজ স্বার্থের অনুকূলে প্রভাবিত করা। অর্থাৎ চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীসমূহের কর্মকাণ্ডের লক্ষ্য হল সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ও প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহ। কখনও কোনো গোষ্ঠীসদস্যের একক প্রচেষ্টায় (যেমন— কোনো শিল্পপতি এককভাবে সরকারি সিদ্ধান্তকে

প্রভাবিত করার চেষ্টা করে) কখনও গোষ্ঠীবদ্ধভাবে (শিল্পগোষ্ঠী সংঘবদ্ধভাবে) আবার কখনও অন্য গোষ্ঠীর সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে (শিল্প ও ব্যবসায়ী গোষ্ঠী যৌথভাবে) সরকারি সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে।

যেহেতু সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে শাসনবিভাগ (মন্ত্রীপরিষদ চালিত শাসন ব্যবস্থায় মন্ত্রীগণ, রাষ্ট্রপতিচালিত শাসন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি), আইনসভা (কমিটিসহ), বিচারবিভাগ, আমলাতন্ত্র, রাজনৈতিক দল জড়িত থাকে সেহেতু এই সমস্ত সংস্থার সাথে জড়িত পদাধিকারীদের প্রভাবিত করার মাধ্যমেই চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী নিজেদের স্বার্থ ও দাবিদাওয়ার অনুকূলে সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে চায়। রড হেগ ও মার্টিন হ্যারপ-এর মতে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলি তিনভাবে একাজ সম্পাদন করে। (এক) সরকারের সঙ্গে (আইনসভা, শাসনবিভাগ, বিচারবিভাগ, আমলাতন্ত্র) সরাসরি যোগস্থাপনের মাধ্যমে, (দুই) রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে পরোক্ষ প্রভাব দ্বারা এবং (তিন) জনমতের মাধ্যমে পরোক্ষ প্রভাব দ্বারা। রড হেগ এবং মার্টিন হ্যারপ প্রদত্ত ছকটিকে এখানে ব্যবহার করা যেতে পারে।

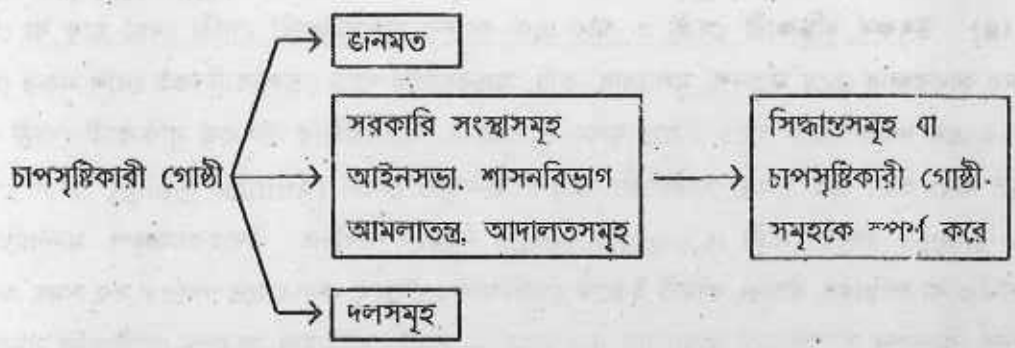

সরকারি সংস্থাসমূহ : প্রতিনিধিত্বমূলক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সাধারণত আইনসভাই তুলনামূলকভাবে অধিকতর ক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে আইনসভা বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কংগ্রেস-এর মতো আইনসভা বিভিন্ন কমিটি স্থাপনের মাধ্যমে কাজকর্ম সম্পাদন করে থাকে। চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলির অন্যতম লক্ষ্য হল এই সমস্ত কমিটির সদস্যগণকে প্রভাবিত করে স্বার্থসিদ্ধি করা। তাছাড়া, গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ে আইন প্রণয়নের ব্যাপারে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলি তথ্য পরিসংখ্যান ইত্যাদি সরবরাহ করে আইনসভাকে সাহায্য করে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আইনসভা কংগ্রেস-এ প্রভাব বিস্তারের জন্য লবিং ব্যবস্থা অত্যন্ত চালু ব্যবস্থা। লবিং-এর মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারীরা ব্যক্তিগতভাবে আবেদন, আর্থিক সাহায্যদান এবং বিভিন্ন কমিটির কাছে উপস্থিত হয়ে বক্তব্য পেশ করার মাধ্যমে স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করে। সর্বোপরি, ইদানীং চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলি আইনসভার নির্বাচনে নির্দিষ্ট প্রার্থীকে বিভিন্ন রকমের সাহায্য করে নির্বাচিত করার ব্যাপারে তৎপর হয়ে ওঠে।

চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীসমূহ প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে। বর্তমান যুগের অধিকাংশ রাষ্ট্রেই প্রশাসন বিভাগের প্রাধান্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলিও প্রশাসনিক বিভাগকে প্রভাবিত করতে তৎপর হয়ে ওঠে। এই প্রশাসনিক বিভাগ একদিকে রাজনৈতিক কার্যনির্বাহী বিভাগ যেমন— রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রীসভার সদস্যগণ, অপরদিকে আমলাতন্ত্র নিয়ে গড়ে ওঠে। মন্ত্রীপরিষদ-চালিত শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রীগণ যেহেতু আইনসভার নিম্নকক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের / জোটের প্রতিনিধিত্ব করে, সেহেতু আইনসভা ও মন্ত্রীমণ্ডলীর সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। এ কারণে, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর পক্ষে একই সঙ্গে শাসনবিভাগ ও আইনবিভাগকে প্রভাবিত করা সহজ হয়। যে কোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থাতেই বিশেষ করে মন্ত্রীপরিষদচালিত শাসনব্যবস্থায় আমলাতন্ত্রই শাসনকার্যের প্রকৃত পরিচালক। আইন তৈরির ব্যাপারে মন্ত্রীসভাকে তথ্য সরবরাহ, পরামর্শ প্রদান করা থেকে শুরু করে আইনকে বাস্তবে প্রয়োগ করা পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমলাতন্ত্র সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা। আমলাতন্ত্রকে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীসমূহ অর্থ বা অন্যান্য দ্রব্য ও সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে গোষ্ঠীর স্বার্থে কাজ করার জন্য রাজী করায়।

চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলির শেষ ভরসাস্থল বিচারবিভাগ। অবশ্য, এ ব্যাপারে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলির সাফল্য নির্ভর করে বিচারবিভাগের গঠন ও ক্ষমতার প্রকৃতির উপর। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিচারবিভাগের তথা সুপ্রীমকোর্টের যেহেতু সংবিধানের ব্যাখ্যাদানের ক্ষমতা এবং আইনবিভাগ প্রণীত আইন বা শাসনবিভাগের যে কোনো আদেশ/চুক্তিকে সংবিধানবিরোধী বলে ঘোষণা করে বাতিল করার ক্ষমতা রয়েছে। সেহেতু চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলি বিচারপতিদের নিয়োগ ও সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে সচেষ্ট হয়।

রাজনৈতিক দল ঃ চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলি অনেকসময় রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে পরোক্ষ প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে। সমাজ বস্তুত রাজনৈতিক দল ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মাধ্যমে সরকারের উপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করার ফলে উভয় গোষ্ঠীর পরস্পরের মধ্যে অধিক্রমণ (Over-lapping) দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ, শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির সম্পর্কের উল্লেখ করা যেতে পারে। কোনো শ্রমিক সংগঠন কমিউনিস্ট পার্টির মাধ্যমে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে। আবার কমিউনিস্ট পার্টিকেও দলীয় সংগঠনের জন্য শ্রমিক সংগঠনগুলির উপর নির্ভর করতে হয়। একইভাবে, 'পরিবেশ বাঁচাও' সংগঠনগুলি গ্রীন রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, বিশেষত মন্ত্রীপরিষদচালিত শাসনব্যবস্থায় চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলি কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করে। রাজনৈতিক দলগুলিকে অর্থ দিয়ে, নির্বাচনী প্রচারে অংশগ্রহণ করে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলি দলীয় ছত্রছায়ায় সমৃদ্ধ হতে সচেষ্ট হয়।

প্রচার-মাধ্যম সমূহ ঃ প্রচার-মাধ্যম সমূহের সাহায্যেও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলি পরোক্ষ প্রভাব বিস্তারে সচেষ্ট হয়। সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদির মাধ্যমে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলি জনমতকে

প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। উৎকর্ষ বৃদ্ধিকারী চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলির ক্ষেত্রে প্রচার মাধ্যম হল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। জনমত সৃষ্টির মাধ্যমে গোষ্ঠীগুলি সরকারের উপর প্রভাব বিস্তারে অগ্রসর হয়; সরকারকে কোনো কাজ থেকে বিরত থাকার পরিবেশ তৈরি করে। যেমন, পরমাণু-যুদ্ধবিরোধী মঞ্চ পরমাণু-যুদ্ধের বিভীষিকা বিষয়ে প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে জনগণকে সতর্ক করে সরকারের উপর পরোক্ষ চাপ রাখে যাতে সরকার পরমাণু অস্ত্র উৎপাদন বা আমদানি/রপ্তানি থেকে বিরত থাকে। বিভিন্ন জেলবন্দিদের দুর্দশার বিষয়টি উত্থাপনের মাধ্যমে মানবাধিকার কমিশন সরকারকে বাধ্য করে জেলবন্দিদের মানবিক সুযোগ-সুবিধা প্রদানে।

অবশ্য, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলি সরকারি নীতি-নির্ধারণ ও প্রয়োগকে কতদূর প্রভাবিত করে স্বার্থসিদ্ধি করতে সক্ষম হবে তা নির্ভর করে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলির শাস্তিমূলক ব্যবস্থাদি গ্রহণের ক্ষমতা, বৈধতার মাত্রা, সদস্যের ধরন এবং সম্পদের উপর। যদি চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর পক্ষে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থাদি গ্রহণের ক্ষমতা থাকে, সরকার যদি চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর উপর বিভিন্নভাবে নির্ভরশীল হয়ে থাকে তাহলে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলির পক্ষে প্রভাব বিস্তার করা সহজ হয়। উদাহরণস্বরূপ, শাসকদলকে যেহেতু পরবর্তী নির্বাচনের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হয় এবং নির্বাচনী ব্যবস্থায় অর্থের যোগান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেহেতু অর্থনৈতিক দিক থেকে সবল গোষ্ঠীগুলির পক্ষে চাপসৃষ্টি সহজ হয়। বর্তমানে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা যেহেতু বহুজাতিক সংস্থাগুলির উপর নির্ভরশীল সেহেতু বহুজাতিক সংস্থাগুলির পক্ষে কোনো দেশের নীতি নির্ধারণকে প্রভাবিত করা সহজ হয়। দ্বিতীয়ত, কোনো চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী যদি সমাজব্যবস্থায় অত্যন্ত মর্যাদার অধিকারী বা প্রভাবশালী হয় তাহলে সেই চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর দাবিদাওয়াকে অস্বীকার করা অনেক সময় সম্ভবপর হয় না। উদাহরণস্বরূপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যেহেতু জেনারেল মোটর কোম্পানীর সুনামের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুনামকে অভিন্ন করে দেখা হয় সেহেতু জেনারেল মোটর কোম্পানীর পক্ষে সরকারের উপর চাপসৃষ্টি করা সহজ। তৃতীয়ত, কোনো চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর সক্রিয় সদস্যসংখ্যা যদি খুব বেশি হয় তাহলে সেই গোষ্ঠীকে অমান্য করাও কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। চতুর্থত, কোনো গোষ্ঠীর সাংগঠনিক দক্ষতা, সম্পদ প্রভৃতি বিষয়গুলি সরকারকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে কাজ করে। উদাহরণ হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জাতীয় রাইফেল এসোসিয়েশন (National Rifle Association)-এর ভূমিকার উল্লেখ করা যেতে পারে।

৮৩.৬ রাজনৈতিক ব্যবস্থায় চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ভূমিকা

ইউরোপের দেশগুলিতে শিল্পায়ন ও রাষ্ট্রীয় কর্মক্ষেত্রের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় চাপসৃষ্টিকারী দেশগুলির উদ্ভব ও প্রসার ঘটতে থাকে। শিল্পায়ন ও গণতন্ত্রের (বিশেষ করে জনকল্যাণমুখী কর্মসূচির) প্রসার সমাজজীবনে একদিকে যেমন নতুন ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করে, অপরদিকে জনগণের

মধ্যে সরকারি কাজকে প্রভাবিত করার এক আকাঙ্ক্ষা গড়ে উঠতে থাকে। সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলি নিজ নিজ স্বার্থকে সুরক্ষিত করা ও নতুনতর দাবিদাওয়া পূরণের জন্য সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। উনবিংশ শতকের শেষের দুই দশক থেকে বিংশ শতকের প্রথম দুই দশকের মধ্যে এ ধরনের বেশ কিছু চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী রাজনৈতিক ব্যবস্থায় প্রাধান্য বিস্তারে অগ্রসর হয়। শিল্পমালিক গোষ্ঠী, ব্যবসায়ী গোষ্ঠী, শ্রমিক সংঘ প্রভৃতি গোষ্ঠীগুলি রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অত্যন্ত সক্রিয় হতে থাকে। আবার, ১৯৬০-এর পরবর্তী দশকগুলিতে 'পরিবেশ বাঁচাও' সংগঠন, নারী অধিকার রক্ষা সমিতি, মানবাধিকার রক্ষা সংগঠন, পরমাণু-যুদ্ধবিরোধী সংগঠন গড়ে উঠতে থাকে। একদিকে সমাজজীবনের উপর প্রভাব বিস্তার, অপরদিকে সরকারি নীতি-নির্ধারণও কর্মসূচিকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করতে থাকে। রাজনৈতিক ব্যবস্থায় চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলির এই ভূমিকার বিষয়টি আমরা এখন আলোচনা করব।

চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলি মূলত প্রতিনিধিত্বমূলক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সমাজ ও রাষ্ট্রের তথা সরকারের মধ্যে যোগসূত্র বজায় রাখার এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু কর্তৃত্বমূলক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলির ভূমিকা অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত ও দমিত। একারণে, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলির ভূমিকাকে আমরা তিন ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় যথা— গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা, কর্তৃত্বমূলক রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং সদ্যপ্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণে করতে পারি।

৮৩.৬.১ উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ভূমিকা ঃ

উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ দু'ধরনের ব্যবস্থার উল্লেখ করেন। এক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদাহরণ সহযোগে বহুত্ববাদী ব্যবস্থা এবং দুই, ইউরোপীয় বিশেষত অস্ট্রিয়ার উদাহরণ সহযোগে করপোরেট ব্যবস্থা। বহুত্ববাদী ব্যবস্থা বলতে সেই ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে বোঝায় যেখানে বহু প্রতিযোগী চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী সরকারের উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলি প্রতিটি বিষয়ের পরিবর্তে এক একটি বিষয়ে (যেমন— শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি) উপর নজরদারি করে। এর ফলে কোনো এক গোষ্ঠীর পক্ষে প্রতিটি বিষয়ের উপর নজরদারি সম্ভবপর হয় না এবং চরম ক্ষমতাসম্পন্ন হয়ে উঠতে পারে না। এই ধরনের ব্যবস্থায় ধরে নেওয়া হয়, সমাজ রাষ্ট্রের উপর প্রাধান্য বিস্তার করবে এবং একারণে রাষ্ট্রের কাজ হল সমাজের বিভিন্ন স্বার্থের প্রকাশস্বরূপ বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলির বক্তব্যকে যথাযথ মর্যাদা দেওয়া।

বিপরীতভাবে, করপোরেট ব্যবস্থা বলতে বোঝায় সেই ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ সরকার এবং কতিপয় প্রভাবশালী গোষ্ঠীর মধ্যে (যেমন— শিল্পপতি, শ্রমিক সংগঠন ও রাজনৈতিক দল) পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে গৃহীত হয়। বহুত্ববাদী ব্যবস্থায় যেখানে গোষ্ঠীগুলি পারস্পরিক প্রতিযোগিতার সম্পর্কে আবদ্ধ, করপোরেট ব্যবস্থায় কতিপয় গোষ্ঠীই চরম ক্ষমতাসম্পন্ন

এবং এই গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে সরকারের পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। করপোরেট ব্যবস্থায় গোষ্ঠীগুলির এক ধরনের স্তরবিন্যাস দেখা যায় যেখানে সরকার উচ্চস্তরে অবস্থিত গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে আলোচনা করে এবং তা পরবর্তীস্তরে অবস্থিত গোষ্ঠীগুলি/গোষ্ঠীসদস্যের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। বহুত্ববাদী ব্যবস্থায় যেখানে সদস্য থেকে নেতৃত্ব এবং নেতৃত্ব থেকে সরকারের দিকে অর্থাৎ পছন্দের স্রোত উর্ধ্বমুখী হয়ে প্রবাহিত হয়, করপোরেট ব্যবস্থায় এই স্রোত নিম্নমুখী তথা সরকার থেকে নেতৃত্ব, নেতৃত্ব থেকে সদস্যের দিকে প্রবাহিত হয়। এজন্য করপোরেট ব্যবস্থায় গোষ্ঠীগুলির অত্যন্ত দক্ষ সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠন এমনকি বাধ্যতামূলক সদস্যপদ (মালিকপক্ষের সংগঠনে প্রতিটি মালিককে এবং শ্রমিক সংগঠনে শ্রমিকদের)-এর প্রয়োজন হয়। রাষ্ট্র এখানে নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করে।

৮৩.৬.২ কর্তৃত্বমূলক রাষ্ট্রে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ভূমিকা ঃ

কর্তৃত্বমূলক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীসমূহের ভূমিকা গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীসমূহের ভূমিকা থেকে ভিন্ন। কর্তৃত্বমূলক রাষ্ট্রে শাসক যে কোনো ধরনের ক্ষমতার গোষ্ঠীকরণকে/কেন্দ্রীভবনকে শাসকশ্রেণীর অস্তিত্বের পক্ষে বিপজ্জনক বলে মনে করে। স্বাভাবিকভাবেই শাসকশ্রেণী সেই ক্ষমতার গোষ্ঠীকরণকে দমন করে নিজ অস্তিত্বকে নিরাপদ রাখতে অথবা সেই সমস্ত গোষ্ঠীগুলিকে নিজ ক্ষমতা বিন্যাসের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে আত্তীকরণ করতে চায়। বিংশ শতকের শেষার্ধে কর্তৃত্বমূলক ব্যবস্থাগুলি শিল্পায়ন, নগরায়ন, কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ, শিক্ষার প্রসার, প্রচার মাধ্যম-এর প্রসারের ফলে নবোদ্ভূত সংগঠিত চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর সম্মুখীন হয়। সামরিক শাসকগণ দমনপীড়নের মাধ্যমে এই সমস্ত গোষ্ঠীগুলির দাবিদাওয়াকে অস্বীকার করে। অনেক সময় এই বিঘ্ন (?) সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলির দমনে পূর্বতন এলিট গোষ্ঠীগুলিও শাসকের পাশে এসে দাঁড়ায়। কৃষক/শ্রমিক-এর দাবিদাওয়া দমনে জমিদার-শিল্পমালিক স্বাভাবিকভাবেই রাষ্ট্রশাসকের সহায়ক গোষ্ঠী। অপরদিকে, বেশ কিছু শাসক সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মধ্য দিয়ে এই সমস্ত গোষ্ঠীগুলিকে/গোষ্ঠীর নেতৃবৃন্দকে শাসনব্যবস্থারই অংশীদার করে বিক্ষোভ প্রশমনে অগ্রসর হয়। ভারতে জাতীয় কংগ্রেস গড়ে ওঠার পছনে ছিল এই নীতিরই প্রয়োগ। লাতিন আমেরিকায় এই নীতির প্রয়োগ ব্যাপকভাবে দেখা যায়। ১৯৮০ থেকে ১৯৯০-এর মধ্যে মেক্সিকো এই ধারাকেই অনুসরণ করে। কমিউনিস্ট রাষ্ট্রব্যবস্থায় চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ভূমিকা আরো করুণ। কমিউনিস্ট ব্যবস্থা যেহেতু শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং কমিউনিস্ট পার্টি হল শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রণীবাহিনী, সেহেতু কমিউনিস্ট রাষ্ট্রব্যবস্থা কমিউনিস্ট পার্টি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রব্যবস্থা। কমিউনিস্ট পার্টি শুধুমাত্র রাষ্ট্রকেই নিয়ন্ত্রণ করে না; সমগ্র সমাজজীবনকেও নিয়ন্ত্রণ করে। কারণ কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচির মধ্য দিয়েই শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এক শোষণহীন সাম্যবাদী সমাজে রূপান্তরিত হয়। সমাজের প্রতিটি গোষ্ঠী পার্টির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। এমতাবস্থায়, কোনো মুক্ত সমাজগোষ্ঠীর দ্বারা স্বার্থের গ্রন্থিকরণ সম্ভবপর হয় না। শ্রমিক সংগঠন, ছাত্র-যুব গোষ্ঠী, বৃত্তিমূলক গোষ্ঠীসমূহ, নারী সংগঠন—

সমস্ত সংগঠনই স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে পৃথক স্বার্থের গ্রন্থিকরণের পরিবর্তে পার্টির শাখা হিসাবে কাজ করে। অবশ্য কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলিতে ১৯৭০ পরবর্তী দশক থেকে পার্টি প্রাধান্য হ্রাস পেতে থাকে এবং বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠীর প্রাধান্য ক্রমশ মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে থাকে। ১৯৮০-র দশকে পোলান্ডে সদ্য গড়ে ওঠা শ্রমিক সংগঠন 'সলিডারিটি' (Solidarity) পরে পোলান্ডের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়।

৮৩.৬.৩ সদ্য-প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক কাঠামোর চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ভূমিকা ঃ

সদ্য-প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলির অবস্থান অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এখানে সদ্য-প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলতে কমিউনিস্ট (পূর্ব-ইউরোপের বেশ কিছু দেশ এবং রাশিয়া) এবং সামরিক শাসন (লাতিন আমেরিকার বেশ কিছু দেশ)-এর অবসান ঘটিয়ে যে সমস্ত দেশগুলিতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেই সমস্ত দেশগুলিকে উল্লেখ করা হয়েছে। সদ্য-প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলির ভূমিকা কি হবে সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলা অসম্ভব; কারণ, এই ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলির ভূমিকা অনেকাংশে নির্ভর করে কীভাবে এই ধরনের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার উপর। বলাবাহুল্য, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলির স্বাধীন ও স্বাভাবিক ভাবে কাজ করার সুযোগ কর্তৃত্বমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিপন্থী। একারণে কর্তৃত্বমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থার পতনের সঙ্গে সঙ্গে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলি প্রাধান্য বিস্তারে সক্রিয় হয়ে ওঠে। উদাহরণস্বরূপ, পোলান্ডে রোমান ক্যাথলিক চার্চ সমর্থন-পুষ্ট শ্রমিক সংগঠন 'Solidarity' পোলান্ডে পশ্চিমি অর্থে শুধুমাত্র চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হিসাবে কাজ করেনি; পরিবর্তে কর্তৃত্বমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থার পতন ঘটিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। এভাবে, বেশ কিছু কর্তৃত্বমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থায় গ্রীনগোষ্ঠী, নারীগোষ্ঠী, ধর্মীয় গোষ্ঠী নৃ-কুল গোষ্ঠী সমাজ (ethnic group) তথা রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। রড হেগ ও মার্টিন হ্যারপ-এর মতে, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরবর্তী পর্যায়ে এই ধরনের জনপ্রিয় সংগঠনগুলি ক্রমশ অন্তর্হিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সাবেকি চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলি গণতন্ত্রের মুক্ত মাটিতে শিকড় খুঁজে নেবে। আগ (Agah - 1998) মনে করেন, গণতন্ত্রের উৎক্রমণে রাজনৈতিক দলগুলি মুখ্য কারক (actor) হলেও গণতন্ত্রের সংরক্ষণে/গণতন্ত্রায়নে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলিই প্রধান। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, এই সমস্ত সদ্য-প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী পশ্চিমি গণতন্ত্রের চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ধাঁচে গড়ে ওঠেনি। পরিবর্তে, বেশ কিছু রাষ্ট্রে ঐতিহ্যানুসারী সামাজিক গোষ্ঠীগুলি নৃ-কুল ভাবে (Ethnic) গড়ে উঠতে থাকে। বৃত্তিকেন্দ্রিক স্বার্থগোষ্ঠীর পরিবর্তে নৃ-কুল গোষ্ঠীকেন্দ্রিক সামাজিক গোষ্ঠীগুলি রাজনৈতিক ব্যবস্থার এক নূতন কারক হিসাবে আবির্ভূত হয়। চেকোশ্লোভাকিয়া, রাশিয়ার বাইনোরাশিয়ার দেশগুলি, আফ্রিকার বেশ কিছু সামরিক শাসনযুক্ত দেশ এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

৮৩.৭ সারাংশ

রাজনীতির বিশেষত বিংশ শতকের রাজনীতির প্রকৃতি বিশ্লেষণে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ভূমিকার বিশ্লেষণ অপরিহার্য। চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী বলতে সেই সমস্ত সংগঠিত সামাজিক গোষ্ঠীকে বোঝায় যা সরকারকে আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচালিত না করে রাজনৈতিক কর্মকর্তাদের আচরণ, সিদ্ধান্ত ইত্যাদিকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে।

চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর শ্রেণীবিভাগ ঃ চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর উৎস, প্রকৃতি ও কার্যকারিতার বৈচিত্র্য এতই ব্যাপক যে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর শ্রেণীবিভাগ করা এক দুরূহ ব্যাপার। আলমন্ড এবং পাওয়েল চার ধরনের চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর উল্লেখ করেন। (১) প্রাতিষ্ঠানিক চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী, (২) সংঘমূলক চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী, (৩) অ-সংঘমূলক চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী এবং (৪) স্বতস্ফূর্ত চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী। গোষ্ঠীর লক্ষ্য, সমর্থন, মর্যাদা, উপকৃত ব্যক্তি এবং অর্থনৈতিক কাজকর্মের ভিত্তিতে টি. ম্যাথুস চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর যে শ্রেণীবিভাগ করেন তা অত্যন্ত জটিল এবং ব্যাপক লক্ষ্যের ভিত্তিতে গঠিত। দুরকমের চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হল রক্ষণাত্মক গোষ্ঠী এবং উৎকর্ষ বৃদ্ধিকারী গোষ্ঠী। সমর্থনের ভিত্তিতে গঠিত বদ্ধ গোষ্ঠী ও মুক্ত গোষ্ঠী; মর্যাদার ভিত্তিতে অন্তঃগোষ্ঠী ও বহিঃগোষ্ঠী; উপকৃত ব্যক্তির ধরন অনুযায়ী যৌথ গোষ্ঠী ও বাছাই গোষ্ঠী; অর্থনৈতিক কার্যাবলীর ভিত্তিতে করপোরেট ও মনোবৃত্তি গোষ্ঠী। রাজনৈতিক দল ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্য— চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী ও রাজনৈতিক দলের মধ্যে গঠনগত, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগত এবং কার্যক্রমগত দিক থেকে যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষ করা যায়। প্রথমত, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী সংকীর্ণ স্বার্থের ভিত্তিতে গঠিত; রাজনৈতিক দল বৃহত্তর স্বার্থের ভিত্তিতে গঠিত। দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক দল সুনির্দিষ্ট আদর্শ ও কর্মসূচির ভিত্তিতে এক বৃহৎ প্রতিষ্ঠান; চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর কাছে তাৎক্ষণিক সুবিধালাভই অধিকতর বিবেচ্য। তৃতীয়ত, রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল রাজনৈতিক দলের লক্ষ্য কিন্তু চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের পরিবর্তে সরকার/সরকারি সংস্থাগুলির উপর চাপসৃষ্টি করে সুযোগ-সুবিধা আদায়ের লক্ষ্যে অগ্রসর হয়। চতুর্থত, রাজনৈতিক দলের কাজ হল স্বার্থের সমষ্টিকরণ; অপরদিকে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর কাজ হল স্বার্থের গ্রন্থিকরণ। পঞ্চমত, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর সদস্যসংখ্যা তুলনামূলক ভাবে কম। ষষ্ঠত, জনসমর্থন রাজনৈতিক দলের অস্তিত্বের ভিত্তি। অপরদিকে, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর কাছে জনসমর্থনের বিষয়টি সাধারণত যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয় না। সপ্তমত, রাজনৈতিক দলের তুলনায় চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মধ্যেকার দ্বন্দ্ব তুলনায় অনেক কম।

চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর কার্যাবলী ও কার্য সম্পাদনের ধরন ঃ রড হেগ এবং মার্টিন হ্যারপ-এর মতে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী তিনভাবে কার্য সম্পাদন করে থাকে। (এক) সরকারের সঙ্গে (আইনবিভাগ, শাসনবিভাগ, বিচারবিভাগ, আমলাতন্ত্র) সরাসরি যোগস্থাপনের মাধ্যমে।

(দুই) রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে পরোক্ষ প্রভাবের দ্বারা। (তিন) জনমতের মাধ্যমে পরোক্ষ প্রভাব দ্বারা। অবশ্য, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলি সরকারি নীতিনির্ধারণ ও প্রয়োগকে কতদূর প্রভাবিত করে স্বার্থসিদ্ধি করতে সক্ষম হবে তা নির্ভর করে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলির শাস্তিমূলক ব্যবস্থাদি গ্রহণের ক্ষমতা, বৈধতার মাত্রা, সদস্যের ধরন এবং সম্পদের উপর।

চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ভূমিকা ঃ চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ভূমিকাকে আমরা তিনধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থা যথা— গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা, কর্তৃত্বমূলক রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং সদ্য-প্রতিষ্ঠিত গণ-তান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করতে পারি।

উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা মূলত দু'ধরনের— বহুত্ববাদী ব্যবস্থা (যেমন—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) এবং করপোরেট ব্যবস্থা (যেমন—অস্ট্রিয়া)। বহুত্ববাদী ব্যবস্থায় বহু প্রতিযোগী চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী সরকারের উপর প্রভাব বিস্তারে সচেষ্ট হয়। করপোরেট ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ সরকার এবং কতিপয় প্রভাবশালী গোষ্ঠীর (যেমন— শিল্পপতি, শ্রমিক সংগঠন ইত্যাদি) মধ্যে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে গৃহীত হয়। এই ব্যবস্থায় কতিপয় গোষ্ঠীই চরম ক্ষমতাসম্পন্ন।

কর্তৃত্বমূলক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় শাসক যেহেতু যে কোনো ধরনের ক্ষমতার গোষ্ঠীকরণকে শাসকশ্রেণীর অস্তিত্বের পক্ষে বিপজ্জনক বলে মনে করে সেহেতু ক্ষমতার গোষ্ঠীকরণকে দমন করে নিজের অস্তিত্বকে নিরাপদ রাখতে চায়। অথবা, সেই সমস্ত গোষ্ঠীগুলিকে নিজক্ষমতা কাঠামোর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করে আত্তীকরণ করতে চায়।

সদ্য-প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলির ভূমিকা অনেকাংশে নির্ভর করে কীভাবে এই ধরনের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার উপর। যেহেতু কর্তৃত্বমূলক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলি স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে না, এ কারণে কর্তৃত্বমূলক রাজনৈতিক ব্যবস্থার পতনের সঙ্গে সঙ্গে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলি প্রাধান্য বিস্তারে সক্রিয় হয়ে ওঠে।

৮৩.৮ অনুশীলনী

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

১) চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর শ্রেণীবিভাগ করুন।

২) চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর কার্যাবলী ও কার্য সম্পাদনের ধরনের উপর একটি টীকা লিখুন।

৩) বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ভূমিকার মূল্যায়ন করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন ঃ

১) চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী কাকে বলে ?

২) চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর সঙ্গে রাজনৈতিক দলের পার্থক্য নির্দেশ করুন।

৩) উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক কাঠামোয় চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ভূমিকা উল্লেখ করুন।

৪) সদ্য-প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ভূমিকা নির্ণয় করুন।

৮৩.৯ গ্রন্থপঞ্জী

1. Almond G. A. and Powell G. B. (Jr.) (1966) — Comparative Politics – A Developmental Approach, Oxford.
2. Almond G. A., Powell G. B. (Jr.) and Dalton R. J. (2000/2001 Indian Reprint) — Comparative Politics Today – A World View, Delhi, Replika Press Ltd.
3. Ball R. Alan (1973) — Modern Politics and Government.
4. Blondel J. (1985) — Comparative Government – A Reader
5. Eckstein H. and Apter D. E. (1989 Indian Reprint) — Comparative Politics - A Reader, Delhi, Surjeet Pub.
6. Rod Hague and Martin Harrop (2001 5th Edn.) — Comparative Government and Politics – An Introduction, New York, Palgrave.
7. ফিরোজা বেগম (২০০০/২০০১) — সামাজিক পরিবর্তন ও রাজনৈতিক উন্নয়ন, ঢাকা, কাকলি প্রকাশন।
8. মোঃ নজরুল ইসলাম (১৯৮১/১৯৮৭) — রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ব, ঢাকা, পুথিঘর লিমিটেড।

একক ৮৪ □ ধর্মের সংজ্ঞা এবং যাদুবিদ্যা ও ধর্মের সম্পর্ক

গঠন

৮৪.১ উদ্দেশ্য
৮৪.২ প্রস্তাবনা
৮৪.৩ ধর্ম বলতে কী বোঝানো হয় ?
৮৪.৪ ধর্মের বৈশিষ্ট্য
৮৪.৫ ধর্মের প্রকারভেদ
৮৪.৬ ধর্ম এবং নৈতিকতা
৮৪.৭ ধর্ম এবং বিজ্ঞান
৮৪.৮ যাদুবিদ্যা বলতে কি বোঝানো হয় ?
৮৪.৯ যাদুবিদ্যার প্রকারভেদ
৮৪.১০ যাদুবিদ্যা ও ধর্মের সম্পর্ক
৮৪.১১ সারাংশ
৮৪.১২ অনুশীলনী
৮৪.১৩ উত্তর সংকেত
৮৪.১৪ গ্রন্থপঞ্জী

৮৪.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি ধর্ম এবং যাদুবিদ্যা সম্পর্কিত আলোচনা প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির সুস্পষ্ট অনুধাবন এবং বিচার বিশ্লেষণে সক্ষম হবেন এবং এই বিষয়কেন্দ্রিক গবেষণাকার্যে আপনার অনুধাবন ক্ষমতার যথার্থ প্রয়োগ ঘটাতে সমর্থ হবেন : —

- ধর্মের অর্থ, বৈশিষ্ট্য এবং বিভিন্ন রূপ;
- ধর্মের সাথে নৈতিকতা এবং বিজ্ঞানের সম্পর্ক;
- যাদুবিদ্যার অর্থ এবং বিভিন্ন রূপ;
- যাদুবিদ্যা এবং ধর্মের সম্পর্ক।

৮৪.২ প্রস্তাবনা

প্রত্যেকটি সমাজেই সামাজিক কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে ধর্মীয় আচার ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। কিন্তু অন্য সব আচার-ব্যবস্থা থেকে ধর্মীয় আচার-ব্যবস্থা স্বতন্ত্র। অন্যান্য সব আচার ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী বুদ্ধিগ্রাহ্য

এবং এদের কার্যকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা পরীক্ষামূলকভাবে নির্ণেয়। অন্যদিকে ধর্মসম্পর্কিত আচার-ব্যবস্থার লক্ষ্য ও কর্মসূচী বুদ্ধির অগোচর এবং এই কারণে অস্পষ্ট। অতিমানবিক অথবা অতীন্দ্রিয় আদর্শ এর মুখ্য উপজীব্য। লৌকিক বুদ্ধি দ্বারা এর ব্যাখ্যা করা চলে না।

সভ্যতার প্রথম পর্বে মানুষ নানারকম যাদুবিদ্যার সহায়তায় অজ্ঞাত প্রাকৃতিক বা অতিপ্রাকৃত শক্তিগুলিকে বশে আনতে চেষ্টা করত। কিন্তু মানুষ যত বেশী সুসভ্য হতে থাকে, ততই যাদুবিদ্যার ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস পায় এবং এর পরিবর্তে ধর্মবিশ্বাস এবং এই সম্পর্কিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানগুলির প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়। তথাপিও মানবজীবনে যাদুবিদ্যার প্রভাবকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। বর্তমান এককে ধর্ম এবং যাদুবিদ্যা সম্পর্কেই আলোকপাত করা হয়েছে।

৮৪.৩ ধর্ম বলতে কী বোঝানো হয় ?

অতি প্রাচীনকাল থেকেই ধর্ম কোনো না কোনোভাবে মানুষের সঙ্গী হয়েছে। ধর্ম মানুষের এমন কিছু বৈশিষ্ট্য এবং ক্রিয়াকলাপ, যা তার পাশবিক প্রকৃতির থেকে স্বতন্ত্র। বাহ্যিক অথবা আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনে সাড়া দিয়ে ধর্ম মানুষের মন থেকে উৎসারিত হয়েছে। যেকোনো ধরণের সামাজিক গোষ্ঠীর জীবনধারার মধ্যে কোনো না কোনো রকমের ধর্মের ধারণা পরিলক্ষিত হয়। তবে সকল সমাজব্যবস্থায় ধর্মের প্রকৃতি এবং অর্থ অভিন্ন নয়। প্রকৃতপক্ষে ধর্মের ধারণা বিশেষভাবে জটিল, এর উৎপত্তি খুঁজে বার করা যেমন শক্ত এর সর্বসম্মত সংজ্ঞা প্রদান করাও তেমনি কষ্টকর। ধর্মের অধিকাংশ সংজ্ঞার সঙ্গেই অতিমানব, বিশ্বাস, নজির, ধর্মীয় আচার এবং আধ্যাত্মিক এর ধারণাসমূহ ঘুরে ফিরে সংশ্লিষ্ট হতে দেখা যায়।

বিশিষ্ট অধ্যাপক ডঃ অনাদিকুমার মহাপাত্র ধর্মের সংজ্ঞা বিষয়ে বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানীর মতামত অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাবে তুলে ধরেছিলেন। সেগুলি নিম্নরূপ ঃ —

জেম্‌স্ ফ্রেজার (James G. Frazer) তাঁর 'The Golden Bough' শীর্ষক গ্রন্থে ধর্মের ধারণা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, "ধর্ম হলো মানুষের থেকে উন্নত বিভিন্ন শক্তি যা প্রকৃতির ধারা এবং মানবজীবনের গতিপথ নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ করে বলে বিশ্বাস করা হয়, তাদের প্রসন্নতা বা সন্তুষ্টিসাধন" ("Propitiation or conciliation of powers superior to man which are believed to direct and control the course of nature and of human life")। ফ্রেজারের সংজ্ঞায় ধর্মের ক্রিয়ামূলক বা আনুষ্ঠানিক দিকটির ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কিন্তু ধর্মের প্রকৃত অর্থ অনুধাবনের জন্য ধর্মের কেবলমাত্র ব্যবহারিক দিকটির উল্লেখ যথেষ্ট বিবেচিত হয় না।

অধ্যাপক ম্যাকাইভার (R. M. MacIver) ধর্মের ধারণা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আত্মিক সম্পর্কের কথা বলেছেন। তাঁর মত অনুযায়ী ধর্ম কেবলমাত্র মানুষের মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টি করে তা নয়, ধর্ম মানুষ এবং অন্য কোনো উর্দ্ধশক্তির মধ্যে সম্পর্কের সৃষ্টি করে (" Religion, as we understand the term implies a relationship not merely between man and man but also between man and some higher power")। অধ্যাপক অগবার্ণ ও নিমকফ্ (W. F. Ogburn and M. F. Nimkoff) তাঁদের 'A handbook of Sociology'

শীর্ষক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন ঃ "অতিমানবীয় শক্তির প্রতি মনোভাব হল ধর্ম" ("Religion is attitude towards superhuman powers")। এমিল ডুর্কহেইম (Emile Derkheim) ও ধর্ম সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত মতামত প্রকাশ করেছেন। তিনি ধর্মের তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক বা ক্রিয়ামূলক দিকের কথা বলেছেন। তাঁর মতে ধর্ম হ'ল বিশেষ একটি পদ্ধতি। এই পদ্ধতির সৃষ্টি হয়েছে কতকগুলি পবিত্র বিষয়কে কেন্দ্র করে বিভিন্ন কার্যকলাপের মাধ্যমে এবং এই সমস্ত পবিত্র বিষয় সমাজে স্বতন্ত্র ও নিষিদ্ধ অবস্থায় বর্তমান থাকে (Religion as a "unified system of beliefs and practices relative to secred things, that is to say, things set apart and forbidden.")। ট্যাগার্ট (M. C. Taggart) -এর অভিমত অনুসারে, ধর্ম হ'ল এক বিশেষ ধরণের আবেগ, এই আবেগ একটি প্রত্যয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। সংশ্লিষ্ট প্রত্যয়টি হল এই যে, মানুষ ও বিশ্বসংসারের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বর্তমান ["(Religion is) an emotion resting on a conviction of a harmony between ourselves and the universe at large."]।

সমাজ- দার্শনিকদের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ধর্মকে স্বতন্ত্রভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়। এই শ্রেণীর সমাজবিজ্ঞানীরা পৃথক দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্মের অর্থ এবং তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন সমাজ দর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে ধর্ম বলতে মানবজীবনের সর্বোচ্চ মূল্যবোধসমূহের স্বীকৃতিকে বোঝায়। ফরাসী সমাজবিজ্ঞানী কোঁত (Conte) এর মতে, ধর্ম ও মানবতা হ'ল অভিন্ন। তিনি মানবতাকেই ধর্ম হিসাবে গণ্য করার পক্ষপাতী। ম্যাকেঞ্জি (Mc. Kenzie) তাঁর 'Outline of social Philosophy' শীর্ষক গ্রন্থে ধর্মের সামাজিক আদর্শের দিকটির ওপর জোর দিয়েছেন। ধর্ম বলতে তিনি সর্বোচ্চ ও সর্বোৎকৃষ্ট সত্তার প্রতি মানুষের চূড়ান্ত অনুরাগ-অনুরক্তিকে বুঝিয়েছেন। তাঁর অভিমত অনুসারে, ধর্ম হল মানবজীবনের পূর্ণ নৈতিক শুদ্ধতার উদ্দেশ্যে আন্তরিক অনুরক্তি বা উদ্যোগ। এই বক্তব্যের মধ্যে ধর্মের সামাজিক আদর্শের দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে। সমাজদর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মের মানবতা, মূল্যবোধ এবং সামাজিক সংহতির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। ধর্মের এই দিকটির প্রতি সমাজবিজ্ঞানী রাইট (W. K. Wright) দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে সমাজদর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা ধর্মের অর্থ এবং তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারি। তবে ধর্মের সমস্ত দিকের সম্পূর্ণ অর্থ এই ধারণা সূত্রে অনুধাবন করা সম্ভবপর নয়। প্রকৃত-প্রস্তাবে, ঈশ্বর বিশ্বাস ব্যতিরেকে ধর্মের কিছুই আর অবশিষ্ট থাকে না। ঈশ্বরের ধারণা ধর্মের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কযুক্ত। মানুষের থেকে মহৎ এবং উন্নত এক শক্তিতে বিশ্বাস এবং আস্থাই হল ধর্ম। এই বিশ্বাস ও আস্থার ভিত্তিতে কিছু অনুভূতির সঞ্চার হয় এবং সৃষ্টি হয় কিছু কার্য-প্রক্রিয়ার। এর সাথে বিভিন্ন পার্থিব অথবা অপার্থিব ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্খা প্রত্যক্ষ বা প্রচ্ছন্নভাবে জড়িয়ে আছে। ম্যালিনাউস্কি (B. Malinowski) তাঁর 'Magic, science and Religion and other Essays' শীর্ষক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে ধর্ম একদিকে যেমন একটি কার্য পদ্ধতি এবং বিশ্বাস ব্যবস্থা, তেমন অন্যদিকে এটি একটি সমাজতাত্ত্বিক প্রপঞ্চ এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও বটে ("Religion is a made of action as well as system of belief and a sociological phenomenon as well as a personal experience.")।

ধর্মের আলোচনা সূত্রে দু'টি প্রসঙ্গ স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়ে। সেগুলি হল ধর্মের অন্তরঙ্গ দিক এবং ধর্মের বহিরঙ্গের দিক। ধর্মের অন্তরঙ্গ দিক বলতে আমরা বুঝি মহত্তর বা উচ্চতর ঈশ্বরীয় শক্তিতে বিশ্বাস ও ধারণার

ভিত্তিতে সৃষ্টি কিছু ভাব, অনুভূতি, চেতনা, প্রত্যয় ইত্যাদিকে। এই সমস্ত অন্তরঙ্গ বিষয়সমূহের অভিব্যক্তি ঘটে থাকে বিভিন্ন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান এবং ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। এই সমস্ত আচার-অনুষ্ঠান বা ক্রিয়া-প্রক্রিয়াকে বলে ধর্মের বহিরঙ্গের দিক। ধর্মের বহিরঙ্গের দিক নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে।

৮৪.৪ ধর্মের বৈশিষ্ট্য

এতক্ষণ আমরা ধর্ম সম্পর্কে বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানীদের অভিমত আলোচনা করলাম। আসুন এবার ধর্মের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা যাক, অধ্যাপক ডঃ মহাপাত্রের মতে, ধর্মের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রথমত, সকল ধর্মেই কোনো না কোনো অতিমানবিক, অতিপ্রকৃত এবং উচ্চতর সত্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস পরিলক্ষিত হয়। মনে করা হয় যে মানুষের থেকে এই অতীন্দ্রিয় সত্তা অনেক বেশী গুণান্বিত এবং শক্তিশালী।

দ্বিতীয়ত, মানুষ মূলত পার্থিব অথবা অপার্থিব কোনো কিছু পাওয়ার আশায় অথবা কল্যাণ সাধনের স্বার্থে এই পরমসত্তার ওপর নির্ভরশীল।

তৃতীয়ত, মহত্তর এই সত্তার উপর বিশ্বাসের ভিত্তিতে মানুষের মনে আবির্ভূত হয় আবেগ-অনুভূতি, ভয়-ভক্তি, প্রেম -শ্রদ্ধা প্রভৃতি। মানুষের মনের এই সমস্ত ভাবাবেগ বা অনুভূতি হল ধর্মের আভ্যন্তরীণ বা অন্তরঙ্গ বিষয়।

চতুর্থত, বিভিন্ন ধরণের আচার-অনুষ্ঠান, ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ, পূজা-উৎসব প্রভৃতির মাধ্যমে এই সমস্ত ভাবাবেগ বা অনুভূতির অভিব্যক্তি ঘটে থাকে। এই সমস্ত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান হল ধর্মের বাহ্যিক অথবা বহিরঙ্গের দিক।

পঞ্চমত, সকল ধর্মেই কতকগুলি কাজকর্ম পাপ হিসাবে চিহ্নিত থাকে। পাপীর ওপর ঈশ্বরের অভিশাপ বর্ষিত হয়। পাপীকে এই অভিশাপ ভোগ করতে হয়। পাপাচারের সঙ্গে সংযুক্ত ব্যক্তির সাথে দেবতা অথবা ঈশ্বরের সমন্বয়পূর্ণ সম্পর্ক বিঘ্নিত হয়।

ষষ্ঠত, পাপ খণ্ডন করে পাপীর সাথে ভগবানের সমন্বয়পূর্ণ সম্পর্ক পুনরায় স্থাপনের ব্যবস্থা প্রত্যেক ধর্মেই থাকে। অর্থাৎ সকল ধর্মেই পাপীর প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা বর্তমান। এ ব্যাপারে প্রত্যেক ধর্মেই প্রয়োজনীয় ক্রিয়াকর্মের বিধান থাকে।

সপ্তমত, ধর্মের ধারণার মধ্যে জ্ঞান, অনুভূতি এবং ক্রিয়ার এক সার্থক সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। ব্যক্তির মধ্যে আত্মোপলব্ধি, আত্মবিকাশ, জীবনধারণের অভিপ্রায় প্রভৃতি বিভিন্ন ধরণের কামনা-বাসনা বর্তমান থাকে। এগুলি ধর্ম সম্পর্কে প্রেরণা হিসাবে কাজ করে। এ দিক থেকে বিচার করলে ধর্মের একটা ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রকাশ বর্তমান।

ডঃ মহাপাত্রের মতে, ধর্ম সম্পর্কে মার্ক্সীয় ধারণা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, মার্কসীয় দর্শনে ধর্ম এবং ঈশ্বর-বিশ্বাসের বিরোধিতা করা হয়। মার্কসবাদীদের মতে, ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে উদ্বেগ -উৎকণ্ঠা থেকে, ভয় থেকেই ভগবানের সৃষ্টি। স্বভাবতই, মার্ক্সবাদীরা বিশ্বাস করেন যে প্রাকৃতিক অবস্থাসঞ্জাত ভয় এবং উৎকণ্ঠা দূর করতে পারলে

ধর্মের অবসান অনিবার্য, মার্ক্সবাদীদের কাছে ধর্ম হল মানুষের মায়া বা অলীক কল্পনা মাত্র। সুতরাং ধর্মের প্রতি মার্ক্সবাদীরা বিরূপ মনোভাবাপন্ন। ধর্ম সম্পর্কে মার্কসীয় বিচার-বিশ্লেষণ আমরা বিস্তারিতভাবে পরে আলোচনা করব।

৮৪.৫ ধর্মের প্রকারভেদ

অ্যারিস্টটলের একটি উক্তি আছে যার অর্থ হল মানুষের মহত্তম ক্ষমতা তার বাকশক্তি কিংবা যুক্তিবত্তা নয়, তা হচ্ছে তার গভীরভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা, যার মূল বৈশিষ্ট্যটি ভাষায় ঠিক প্রকাশ করা যায় না। এই গভীরভাবে চিন্তা করার ফলশ্রুতি হিসাবেই মানুষ একসময় বিশ্বজগতের ঘটনা-প্রবাহ বিশ্লেষণে, জন্ম-মৃত্যু এবং জীবনের রহস্য উদঘাটনে অগ্রসর হয়ে এই সিদ্ধান্তে আসে যে এমন কোনো অদৃশ্য শক্তি রয়েছে যার দ্বারা আমাদের চিন্তা-ভাবনা, আমাদের কার্যকলাপ, সৃষ্টির গতিশীলতা সব কিছুই পরিচালিত হচ্ছে। এই শক্তিই হল স্বয়ং ঈশ্বর অথবা ঈশ্বরের শক্তি। ধর্মের আদিপর্বে এই ঈশ্বর বিশ্বাসের কারণ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ বলেছেন, 'আমাদের মনোগত চিন্তাধারা যে কোনো বর্হিশক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, ভৌত বিজ্ঞানের সূত্রে তাকে বলা হয় উপলব্ধি, আর ধর্মের বিজ্ঞানে তাকেই বলা হয় ইনট্রুউশন্ বা সজ্ঞানলব্ধ ঈশ্বর।

ডঃ অমলেন্দু মুখোপাধ্যায়ের মতে, ঈশ্বরাশ্রিত ধর্মবিশ্বাস কালক্রমে বহু ধর্মমতের প্রবর্তন করে। কোথাও সেই ঈশ্বর এক, কোথাও বা একাধিক হয়ে দাঁড়ায়। খ্রীষ্ট ধর্ম, ইসলাম ধর্ম, ইহুদী ধর্ম এক-ঈশ্বরে বিশ্বাসী বলে সেগুলি একেশ্বরবাদী (monotheistic)। পক্ষান্তরে, হিন্দু ধর্ম বহু-ঈশ্বরবাদী (polytheistic)। যেক্ষেত্রে ঈশ্বরের সাথে বিশ্বসংসারের সৃষ্ট বিষয়ের কোনো মৌলিক পার্থক্য করা হয় না, প্রতিটি বস্তুকেই ঈশ্বরের অংশ বা প্রকাশ বলে বিবেচনা করা হয় সেক্ষেত্রে সেই ধর্মবিশ্বাস হচ্ছে অদ্বৈতবাদ (Pantheism or monism)। হিন্দুধর্ম মূলত বহু- ঈশ্বরবাদী হলেও এর কোনো কোনো শাখায়, যেমন ব্রাহ্ম ধর্মমতে, একেশ্বরবাদ প্রচলিত। আবার, হিন্দুধর্মেরই বৈদান্তিক সংস্করণে যেমন শঙ্করাচার্যের ব্যাখ্যায়, অদ্বৈতবাদেরও সমর্থন রয়েছে। বস্তুত, হিন্দু ধর্ম একক (single), অথবা অনন্য (exclusive) কোনো মত বা পথকে আশ্রয় করে ওঠে নি। এটি প্রকৃতির দিক থেকেই বহুত্ববাদী (pluralistic)। পূর্বোক্ত অদ্বৈতবাদ এবং একেশ্বরবাদ কিন্তু একই ব্যাপার নয়। অদ্বৈতবাদের মূল কথা হল, সব কিছুই ঈশ্বর, সব কিছু তাঁরই অংশ বা অভিব্যক্তি। আর একেশ্বরবাদ অনুসারে 'ঈশ্বর এক, এবং যাবতীয় বিষয় সেই এক-ঈশ্বরেরই সৃষ্টি।' ধর্ম সম্পর্কে এই যে ধারণা, এটি অপেক্ষাকৃত উন্নত এবং পরিণত বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের চিন্তাপ্রসূত।

৮৪.৬ ধর্ম এবং নৈতিকতা

ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে নৈতিকতার (Morality) উল্লেখ অনিবার্যভাবে এসে পড়ে। এই অংশে আমরা ধর্ম এবং নৈতিকতার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করব।

ধর্ম এবং নৈতিকতা-উভয়ই মানুষের আচার-আচরণ পরিচালনা করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পথপ্রদর্শক হিসাবে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। সামাজিক আচার-আচরণবিধি তৈরী করার ক্ষেত্রে উভয়রই ভূমিকা অপরিসীম।

ধর্মের যেমন নিজস্ব একটি আচরণবিধি রয়েছে, ঠিক তেমনই নৈতিকতার একটি নিজস্ব আচরণবিধি বর্তমান, ধর্মীয় আচরণবিধির মধ্যে দিয়ে ধর্মীয় আদর্শ, চিন্তা-ভাবনা ইত্যাদি প্রতিফলিত হয়। নৈতিকতার মধ্যে দিয়ে নীতিসংক্রান্ত চিন্তাধারার বহিঃপ্রকাশ ঘটে থাকে। মূলত, ধর্ম এবং নৈতিকতা সামাজিক নিয়ন্ত্রণের উল্লেখযোগ্য মাধ্যম হিসাবে কাজ করে।

নৈতিকতার উদ্ভব হয় ন্যায় -অন্যায় এর ধারণার উপর ভিত্তি করে। আবার, মানুষের সমাজব্যবস্থা এই ন্যায়-অন্যায় বোধেরই মূল ভিত্তি। মূলত ন্যায়-অন্যায়ের ধারণা একটি সামাজিক ধারণা। সমাজের প্রচলিত জীবনধারার সাথে ন্যায়-অন্যায়ের ধারণা বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত। স্বভাবতই সমাজভেদে নৈতিকতার অল্প-বিস্তর পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সাধারণ অর্থে নৈতিকতা বলতে ন্যায়-নীতি, মূল্যমান ইত্যাদির এক বিশেষীকৃত এবং ব্যাপক রূপকে বোঝায়। নৈতিকতার সৃষ্টি হয় সততা, ন্যায়পরায়ণতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, ধর্মবোধ, শান্তিপ্রিয়তা ইত্যাদির সমাহারে। অধ্যাপক ম্যাকাইভার এবং পেজ (R.M.MacIver and C. H. Page) তাঁদের Society : An Introductory Analysis শীর্ষক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে, একটি নিয়ম-নীতি তখনই নৈতিক হতে পারে যখন সেটি আচরণ বিধির মানসমূহ ঘোষণা করে থাকে এবং এই মানসমূহ ভাল এবং মন্দ সম্পর্কিত মানুষের বিচার-বিশ্লেষণ থেকে প্রত্যক্ষভাবে তাদের যথোপযুক্ত ন্যায্যতা প্রতিপাদনের জন্য সচেষ্ট হয় ("A code is moral when it promulgates standards of conduct that directly derive their sufficient justification from the human interpretation of good and evil.")।

ডঃ মহাপাত্রের অভিমত অনুসারে ধর্ম এবং নৈতিকতা পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক, উভয়ই মানুষের উপলব্ধির এবং অন্তরের অনুভবের বিষয়। এদের পারস্পরিক সম্পর্ক বিশেষভাবে গভীর। ঈশ্বর উদ্ভূত ধর্মবোধের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজস্থ মানুষের নৈতিক জীবনের নিয়ামক হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকেন। সুতরাং ধর্মহীন নৈতিকতা হল এক অবাস্তব ধারণা। ধর্মের সমর্থন ব্যতীত নৈতিকতা সমাজে স্থিতিশীল হতে পারে না। আবার ধর্মও নৈতিকতাবর্জিত নয়। মানব সমাজে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অবিসংবাদিত। ঈশ্বরই সমাজে সৎ-অসৎ, ন্যায়-অন্যায় এবং মানুষের নৈতিক বিধি-বিধানের নিয়ন্তা। যথার্থ ধর্মীয় আদর্শ এবং উন্নত নীতিবোধের মধ্যে সুগভীর সম্পর্ক বর্তমান। একে অপরের অগ্রগতির পথকে প্রশস্ত করে। সুতরাং ধর্ম বলতে ন্যায়-নীতিবর্জিত কোনো অলৌকিক এবং আচার-অনুষ্ঠান সর্বস্ব বিষয়কে বোঝানো হয় না। যথার্থ ধর্ম হল সত্য, শিব এবং সুন্দরের প্রতীক হিসাবে এক পরম সত্তার সাধনা, ধর্ম এবং নৈতিকতার উদ্দেশ্য হল এই সত্য এবং সুন্দরের সাধনা। মানুষ সত্য এবং সুন্দরকে লাভ করতে চায় সামাজিক কাজকর্মের মধ্যে দিয়েই। এবং এই সামাজিক কাজকর্মের মাধ্যমে ধর্ম ও নৈতিকতার মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয়।

অধ্যাপক হবহাউস (L. T. Hobhouse) তাঁর 'Morals in Evalution' শীর্ষক গ্রন্থে ধর্ম এবং নৈতিকতা প্রসঙ্গে আলোচনায় নৈতিকতার উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন। ম্যাথু আরনল্ডের (Mathew Arnold) মতে, ধর্ম বলতে আবেগস্পর্শী নৈতিকতাকে বোঝায় ("Religion is morality touched with emotion.")। সমাজবিজ্ঞানী গ্রীণ (A. W. Green) মনে করেন যে, কোনো একটি সমাজে সনাতন নৈতিকতার প্রকাশ ঘটায় এরূপ সামাজিক মূল্যবোধসমূহকে ধর্ম নিজ বিশ্বাসের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে। ("..... religion includes in its creed those social values of a given society which embody traditional morality.")।

বেঞ্জামিন কিড (Benjamin Kidd) এবং সি. এস. লিউইস (C. S. Lewis) প্রমুখ চিন্তাবিদ্‌গণ ধর্ম এবং নৈতিকতার মধ্যে সুগভীর সম্পর্কের কথা তাঁদের আলোচনায় তুলে ধরেছেন। সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্ এবং পীজ (R. W. Mack and J. Pease) এর অভিমত অনুসারে ধর্ম এবং নৈতিকতার মধ্যে এক ধরণের সংমিশ্রণ সকল মহান ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় ("In all the great religions there is an intermingling of religion and morals.")।

ধর্ম এবং নৈতিকতার মধ্যে পার্থক্যের বিষয়টিকেও আমরা অস্বীকার করতে পারব না। অনেক সমাজবিজ্ঞানী মনে করেন যে নৈতিকতা হল ধর্মনিরপেক্ষ বিষয়। হারবার্ট স্পেনসার (Herbert Spencer), টমাস হাক্সলী (Thomas Huxley), বারট্রান্ড রাসেল (Bertrand Russel) প্রমুখরা এই ধারণা পোষণ করেন যে বিশুদ্ধ বিচার-বিশ্লেষণের জন্য নৈতিকতাকে ধর্মীয় প্রভাব থেকে মুক্ত রাখা বাঞ্ছনীয়।

ডঃ মহাপাত্র ধর্ম এবং নৈতিকতার মধ্যে পার্থক্যের বিষয়ে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলির অবতারণা করে থাকেন।

প্রথমত, ধর্ম যুক্তি-তর্কের উর্দ্ধে, এটি মানুষের অন্তরের ভক্তি বা বিশ্বাসের বিষয়। ধর্ম যুক্তি বা বিচার-সাপেক্ষ নয়। পক্ষান্তরে, নৈতিকতা হল সমাজস্থ মানুষের বিচার-বিবেচনার বিষয় এবং যুক্তির অনুগামী।

দ্বিতীয়ত, ধর্ম হল আধ্যাত্মিক ধারণা, ধর্মীয় অনুভূতির মূলে এক অতীন্দ্রিয় শক্তি বর্তমান। অন্যদিকে, নৈতিকতা একটি সামাজিক বিষয়। সমাজজীবনের ভাল-মন্দের ধারণাকে ভিত্তি করে নৈতিকতার সৃষ্টি হয়। সমাজের প্রচলিত ন্যায়-অন্যায়ের ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে নৈতিকতার উদ্ভব হয়।

তৃতীয়ত, ধর্ম এবং নৈতিকতা পরস্পরের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল— এই ধারণাটি সম্পূর্ণ অর্থে সঠিক নয়। ধর্মবিশ্বাসী ব্যক্তিত্ব যেমন ন্যায়-নীতিহীন হতে পারেন, তেমন কোনো ব্যক্তি ধর্মবিশ্বাসী না হয়েও বিশুদ্ধ নৈতিক জীবনযাপন করতে পারেন। এ ধরণের জীবনযাপনের ক্ষেত্রে কোনোরকম অস্বাভাবিকতা থাকে না।

চতুর্থত, ধর্মের পরিপ্রেক্ষিতে পাপ-পুণ্যের কথা বলা হয়। ধর্মবিরোধী কাজকর্মের শাস্তি হল ধর্মচ্যুতি অথবা প্রায়শ্চিত্ত। অন্যদিকে, ন্যায়-নীতির বিরুদ্ধাচরণ হল অপরাধবোধ অথবা বিবেকের দংশন। আবার, নৈতিক প্রত্যয়ের জন্য সামাজিক শাস্তিও হতে পারে।

ধর্ম এবং নৈতিকতা সম্পর্কিত উপরোক্ত পার্থক্যগুলি সর্বাংশে স্বীকার্য নয়। সুসংগঠিত সমাজজীবন গড়ে তোলার জন্য ধর্ম এবং নৈতিকতার মধ্যে সুগভীর সম্পর্ক থাকা একান্তভাবে আবশ্যক। ধর্মবোধ ব্যতীত যেমন নৈতিকতার কোনো দৃঢ় ভিত্তি থাকে না, তেমনই নৈতিকতা সম্পর্কিত জ্ঞান ধর্মবিশ্বাসী ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সাধারণতঃ বেশী থাকে।

৮৪.৭ ধর্ম এবং বিজ্ঞান

ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বিজ্ঞানের প্রসঙ্গ উত্থাপন না করলে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। আসুন, এখন ধর্ম এবং বিজ্ঞান সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাক।

ডঃ অমলেন্দু মুখোপাধ্যায়ের অভিমত অনুসারে, সাহিত্য, শিল্পকলা, দর্শন অথবা অন্য কোনো বিষয়ই ধর্ম এবং বিজ্ঞানের মতো মানুষের জীবনবোধ এবং জীবনচর্চার ওপর তেমনভাবে প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয় নি। উৎপত্তিগত দিক থেকে ধর্ম পূর্ববর্তী এবং বিজ্ঞান তার পরবর্তী। মানবসমাজে ধর্মীয় প্রভাবের কারণ যেমন বিবিধ, তেমনি তা জটিল এবং গভীরতা -ব্যঞ্জকও বটে। তবে এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, পূর্ববর্তী হওয়ার প্রাথমিক সুবিধাটুকু ছিল বলেই ধর্ম একসময় নিরঙ্কুশভাবে তার প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তার করতে পেরেছিল। কিন্তু বিজ্ঞান অপেক্ষাকৃত পরে আবির্ভূত হয়েও খুব দ্রুতগতিতে মানুষের মন জয় করে নিতে সক্ষম হয়। মানুষের ওপর কোন্‌টির প্রভাব অধিকতর কাম্য কিংবা কার্যকর এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করেই ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে 'ধর্ম বনাম বিজ্ঞান' এর বিতর্ক উত্থাপিত হয়েছে। কিন্তু সর্বজনগ্রাহ্য কোনো স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়নি। এ জাতীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকারী চিন্তাবিদের একটি অংশের অভিমত অনুযায়ী ধর্ম এবং বিজ্ঞানের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক হল অসামঞ্জস্যপূর্ণ। আবার আর একদলের অভিমত অনুযায়ী ধর্ম এবং বিজ্ঞানের মধ্যে এই বিরোধ হল বাস্তবে বিজ্ঞান ও অন্ধ বিশ্বাসের বিরোধ। কিন্তু প্রথম শ্রেণীর চিন্তাবিদ্‌রা আবার এই ধারণার বিরোধিতা করেন। তাঁদের মতে, অন্ধ বিশ্বাসই বিভিন্ন ক্ষেত্রে ধর্ম বিশ্বাসের অঙ্গীভূত বিষয় হিসাবে বিবেচিত হয়। সুতরাং, অন্ধ বিশ্বাসের সাথে বিজ্ঞানের যে বিরোধ, তা আসলে ধর্মের সাথে বিজ্ঞানেরই বিরোধের সামিল।

মূলত আদি, অন্ধ বা গোঁড়া ধর্মীয় মতবাদ হ'ল বিজ্ঞান বিরোধী। মানব সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে স্পষ্টতই বোঝা যায় যে বিভিন্ন সময়ে অন্ধ ধর্মীয় বিশ্বাস বিজ্ঞানের বিকাশে বাধা প্রদান করেছে এবং বিভিন্নভাবে বিজ্ঞানের বিরোধিতা করেছে। উদাহরণ হিসাবে গ্যালিলিও (Galileo) -এর কথা বলা যেতে পারে। গ্যালিলিওকে একসময় ক্যাথলিক বিচারসভার নিকট নিয়ে আসা হয়েছিল এই অভিযোগে যে তিনি কোপারনিকাস্ (Copernicus) কে অনুসরণ করে সূর্যের অনড়ত্ব এবং পৃথিবীর সঞ্চরণশীলতা বিষয়ে এমন সব যুক্তি দেখিয়েছেন যা প্রচলিত ধর্ম-বিশ্বাসবিরোধী এবং সেই কারণেই তিনি শাস্ত্র লঙ্ঘনের অপরাধে অপরাধী। গ্যালিলিও তাঁর বক্তব্য প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন এবং তিনি যে ধর্মবিরোধী নন তা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ব্রুনো (Bruno) কোপারনিকাসের মতাদর্শ থেকে সরে আসতে রাজী হননি বলে তাঁকে শেষ পর্যন্ত রোমে অগ্নিদগ্ধ করে হত্যা করা হয়।

মানুষের আনুগত্য লাভের জন্য এবং নিজ নিজ প্রভাব প্রতিপত্তি বা শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের জন্য ধর্ম এবং বিজ্ঞানের বিরোধ বাস্তব ঘটনা হলেও এই বিরোধের কিন্তু কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। আমরা যা জানি, কিংবা যা আমাদের জানার সম্ভাবনা রয়েছে এমন সব বিষয়ই বিজ্ঞান ইন্দ্রিয়গতভাবে অনুসন্ধান করে দেখে। যা পরীক্ষা, পরিমাপনসাপেক্ষ নয়, অন্ততপক্ষে একটা কিছু অভিজ্ঞতামূলক পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত নয় তা বিজ্ঞানের বিবেচনাধীন হতে পারে না। কিন্তু তাই বলে এমন সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত নয় যে বিজ্ঞানের অনুসন্ধান বৃত্তটির বাইরে আর কোনো কিছুই নেই, কিংবা থাকলেও তা অর্থবিহীন। বস্তুত, বাস্তব বা ভৌত বিষয়ের বহির্ভূত অন্য কিছু নেই বললে এক ধরণের আধিবিদ্যক (metaphysical) ধারণার আশ্রয় নিতে হয়। এই ধারণা একটি স্বতঃসিদ্ধ নীতি হতে পারে, কিন্তু কখনোই তা অভিজ্ঞতালব্ধ কিম্বা প্রামাণ্য কোনো সিদ্ধান্ত নয়। দ্বিতীয়ত, বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় পার্থিব জগৎ, আর ধর্মের আলোচ্য বিষয় প্রধানত অপার্থিব বা অতিপ্রাকৃত জগৎ। বিজ্ঞান মানুষের ঐহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মাধ্যম। অন্যদিকে ধর্ম মানুষের আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক উন্নতির সোপান, মানুষের পারমার্থিক চিন্তাভাবনার পাথেয়।

তৃতীয়ত, বৈজ্ঞানিক সত্য বলতে বোঝায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তথ্যাদি অথবা সাক্ষ্যপ্রমাণ। পক্ষান্তরে ধর্মীয় সত্য হচ্ছে অনুভূতি বা উপলব্ধির ব্যাপার যার ভিত্তি বিশ্বাস, দিব্যজ্ঞান, অতিপ্রাকৃত অভিজ্ঞতা ইত্যাদি।

ডঃ মহাপাত্রের মতে, আধুনিক মানুষের দৈনন্দিন জীবনধারায় বিজ্ঞানের অনুকূল অবদান অনস্বীকার্য। তবে আমরা এ কথা কখনই দাবী করতে পারব না যে বিজ্ঞান মানবজাতির যাবতীয় সমস্যার সমাধান করতে পেরেছে। বাস্তবে বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের বাইরেও বিভিন্ন বিষয় বর্তমান। এই সমস্ত বিষয়ের অস্তিত্বকেও অস্বীকার করা যায় না। মূলত, এই বিশ্ব- ব্রহ্মাণ্ডের সাথে মানুষের সঠিক সম্পর্ক বিজ্ঞান সম্যকভাবে অনুধাবন করতে পারে নি। অর্থাৎ বিজ্ঞানের ভূমিকার সীমাবদ্ধতাকে অস্বীকার করা যায় না।

ধর্ম এবং বিজ্ঞানের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে অনেক সমাজ-বিজ্ঞানী মন্তব্য করেন যে, বিজ্ঞান ধর্মের বিরোধী নয়। বর্তমানে বিজ্ঞানের ব্যাপক অগ্রগতি ঘটেছে। এতদ্‌সত্ত্বেও ধর্ম ব্যতীত মানুষের চলে না। বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি বিশেষ ক্ষেত্রে ও সময়ে ধর্মের ভূমিকার অপরিহার্যতা বিশেষভাবে উপলব্ধি করেন। অধ্যাপক-অগবার্ণ ও নিমকফ্ (W. F. Ogburn and M. F. Nimcoff) তাঁদের 'A Handbook of Sociology' শীর্ষক গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, সমাজব্যবস্থার মধ্যেই এমন অনেকেই আছেন যাঁরা বিশ্বাস করেন যে, ধর্মবোধ ব্যতীত সমাজ জীবন যাপন করা যায় না। তবে ধর্মীয় আচার-বিচার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের বিষয় হতে পারে না। সমাজে বসবাসকারী মানুষদের জীবনযন্ত্রনা যত দিন থাকবে, ব্যক্তিগত এবং সামাজিক স্বার্থে ধর্মের ভূমিকার গুরুত্ব ও তাৎপর্যকেও ততদিন উপেক্ষা করা যাবে না। মানুষ তার চিন্তা-চেতনায় এবং আচার -আচরণে বিশেষভাবে বাস্তববাদী হয়ে পড়লে তার সুকুমার বৃত্তি সমূহের অপমৃত্যু ঘটে। এ রকম অবস্থায় সমাজজীবনের শৃঙ্খলা এবং সংহতি বিপন্ন হয়ে পড়ার আশংকা দেখা দিতে পারে। ধর্মের ইতিবাচক ভূমিকাই মানবসমাজকে এই আশংকা থেকে মুক্তি দিতে পারে।

অনেক সমাজবিজ্ঞানীই মনে করেন যে, ধর্ম এবং বিজ্ঞানের মধ্যে প্রকৃত কোনো বিরোধ নেই। অধ্যাপক ডঃ মহাপাত্রের বক্তব্য হ'ল, বিশ্বপ্রকৃতি এবং মানবজাতি সম্পর্কে সম্যকভাবে অবহিত হওয়ার স্বার্থে ধর্ম ও বিজ্ঞান উভয়ের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। পুরুষানুক্রমে ধর্মবিশ্বাস বিভিন্ন অভিজ্ঞতাকে বহন করে আনে। এক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক বিচার-বিশ্লেষণের সত্যাসত্য অর্থহীন প্রতিপন্ন হয়। বৈজ্ঞানিক বিচারে কোনো একটি ধর্মীয় ধারণা অসত্য প্রতিপন্ন হতে পারে। তথাপি সংশ্লিষ্ট ধর্মবিশ্বাসের সামাজিক ভূমিকার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এই কারণে বলা হয় যে, সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের জীবনধারায় একটা পর্যায় পর্যন্ত ধর্মনিরপেক্ষতাকে সমর্থন করা যেতে পারে কিন্তু তারপর নয়।

স্বভাবতই সমাজবিজ্ঞানীদের অনেকের অভিমত হল ধর্ম যেমন বিজ্ঞানের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে না, ঠিক তেমনভাবে বিজ্ঞানও ধর্মের জায়গা দখল করতে পারে না। উভয়ের মধ্যে পরিপূরক ভূমিকাই সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক। বর্তমানে বৈজ্ঞানিক ধারণার সাথে ধর্মীয় বিষয়ের সামঞ্জস্য সাধনের এক স্বাভাবিক প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। ধর্মীয় ক্ষেত্রে অন্ধবিশ্বাসের পরিবর্তে সামাজিক মূল্যবোধের উপর এখন অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

৮৪.৮ যাদুবিদ্যা বলতে কি বোঝানো হয় ?

যাদুবিদ্যা শব্দটি ইংরেজী শব্দ 'Magic' এর বঙ্গানুবাদ। ইংরেজী শব্দ 'Magic' জোরো অস্ট্রিয়ান কর্তৃক ব্যবহৃত শব্দ 'Magician' থেকে এসেছে। জোরো অস্ট্রিয়ানরা পুরোহিতদের 'Magian' বলতো। কারণ তারা পবিত্র মানব হিসাবে গণ্য হতেন। আধ্যাত্মিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে তারা নাকি যে কোনো কাঙ্ক্ষিত ফল বাস্তবায়িত করতে সমর্থ হতেন।

ডঃ মহাপাত্রের অভিমত অনুযায়ী সাধারণ অর্থে, যাদুবিদ্যা বলতে মন্ত্র-তন্ত্র এবং অন্যান্য ক্রিয়াকর্মের মাধ্যমে নৈর্ব্যক্তিক কোনো গুপ্ত শক্তিকে ইচ্ছাপূরণে বাধ্য করাকে বোঝায়। আদিম মানুষের কাছে যাদু হল নৈর্ব্যক্তিক এক গুপ্ত শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাস, যে শক্তিকে উপযুক্ত পন্থা-পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে ঈপ্সিত কার্য সম্পাদনে বাধ্য করা যায়। তারা আরোও বিশ্বাস করতো যে এই গুপ্ত শক্তি বর্তমান থাকে কিছু বস্তু, ক্রিয়াকর্ম এবং মন্ত্রতন্ত্রের মধ্যে। বিশেষ ক্রিয়াকর্ম এবং মন্ত্রতন্ত্রের মাধ্যমে এই গুপ্ত শক্তির সাহায্য লাভ সম্ভব এবং এইভাবে বিভিন্ন বিষয়ে উদ্দেশ্য সিদ্ধিও সম্ভব। সামাজিক নৃতত্ত্ববিদ ম্যালিনাউস্কি (B. Malinowski) যাদুবিদ্যা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, সমস্ত ধরণের যাদুবিদ্যা আবির্ভাবের সময় থেকেই সেই সমস্ত বিষয় এবং পদ্ধতির সাথে সংযুক্ত যেগুলি মানুষকে আকৃষ্ট করে এবং তার স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন কর্মপ্রচেষ্টাকে কৌশলে এড়িয়ে যায় ("All magic simply was from the beginning an essential adjunct of all such things and processes as vitally interest man and yet elude his normal rational effort.")।

যাদুবিদ্যা হল মূলত একটি কৌশল এবং প্রচেষ্টা। যাদুকর এই কৌশল এবং প্রচেষ্টার মাধ্যমে অতিপ্রাকৃত শক্তিকে বশীভূত করে এবং নিজের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে উদ্যোগী হয়। প্রাচীন আদিম সমাজে মানুষ রোগ-শোক, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দৈব-দুর্বিপাক, মহামারী প্রভৃতির মোকাবিলা করার জন্য যাদুবিদ্যার সাহায্য নিত। ম্যালিনাউস্কির মতে, মানুষ অনেক সময় নিজেদের বুদ্ধি-বৃত্তি, ক্ষমতা এবং অধিগত কলাকৌশলের সাহায্যে উদ্দেশ্যসাধনের ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়। তখনই মানুষ সাহায্য নেয় যাদুবিদ্যার। তিনি ট্রব্রায়ান্ড্ (Trobriand) দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদের সম্পর্কে যে গবেষণা করেছেন, তা পর্যালোচনা করলে আদিম অধিবাসীদের মধ্যে যাদুবিদ্যার গুরুত্ব সম্যকভাবে উপলব্ধি করা যায়। এই দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদের জীবিকার্জনের মূল উপায় হল মৎস্য শিকার এবং উদ্যানপালন। এই দুটি বিষয়ে তাদের যথেষ্ট ব্যবহারিক জ্ঞান এবং কৌশল বর্তমান। কিন্তু তা সত্ত্বেও উদ্যানপালনের সাফল্যের জন্য যাদুবিদ্যাকে তারা অপরিহার্য বলে মনে করে। কারণ, অভিজ্ঞতা থেকে তারা শিখেছে যে তাদের জ্ঞান, কলাকৌশল এবং প্রচেষ্টা সত্ত্বেও অজ্ঞাত এবং নিয়ন্ত্রণের অসাধ্য শক্তিসমূহের দ্বারা সব কিছু ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে পারে। অতএব অজ্ঞাত এবং নিয়ন্ত্রণাতীত শক্তিসমূহকে যাদুবিদ্যার সাহায্যে বশীভূত করা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে।

এডওয়ার্ডস (Edwards) তাঁর 'The Philosophy of Religion' শীর্ষক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে যাদু হল মন্ত্র-তন্ত্র, ক্রিয়াকর্ম, দুর্বোধ্য বাক্যবাণ ইত্যাদির রহস্যময় এভাবে দুষ্ট কোনো শক্তিকে বশ এবং বাধ্য করে অভীপ্সিত কাজ করিয়ে নেওয়ার উপায় পদ্ধতি, যাদুবিদ্যায় যে সমস্ত মন্ত্র-তন্ত্র এবং রহস্যাবৃত কালকৌশল এবং সূত্রাদির

সাহায্য নেওয়া হয়, তা নিতান্তই মনগড়া কাল্পনিক এবং যুক্তিবর্জিত। রেইনাক (Reinach) তাঁর 'A History of Religion' শীর্ষক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে যাদুবিদ্যা হল সর্বপ্রাণবাদের কলাকৌশল (Magic is the strategy of animism)।

৮৪.৯ যাদুবিদ্যার প্রকারভেদ

এতক্ষণ আমরা যাদুবিদ্যা বলতে কী বোঝায়, সেই বিষয়ে আলোচনা করলাম। এখন যাদুবিদ্যার প্রকারভেদ সম্পর্কে আলোকপাত করা হবে।

সাধারণভাবে যাদুবিদ্যাকে আমরা দুটি ভাগে ভাগ করতে পারি। একটি হল অনুকরণমূলক যাদু (Imitative Magic) এবং অন্যটি হল সংক্রামক তথা পরিত্রাণমূলক যাদু (Contagious Magic)। ফ্রেজার (Frazer) লক্ষ্য করেছেন যে, একটি অস্ট্রেলিয় উপজাতির মধ্যে অনুকরণমূলক যাদুবিদ্যা প্রচলিত। যখন কোনো ব্যক্তি যা চায় তা অনুকরণ করে যাদু প্রদর্শন করাকে অর্থাৎ সেই যাদুরীতিকে বলে অনুকরণমূলক যাদুবিদ্যা। ঐ অস্ট্রেলিয় উপজাতির যাদুকর যদি বৃষ্টি নামাতে চায়, তবে সে মুখ-গহ্বর জলে পূর্ণ করে এবং তা মুখ দিয়ে ছড়িয়ে দেয়। চারিদিকে এইভাবে মুখ দিয়ে ছিটানোর কাজটা সে এমনভাবে পালন করে, তাতে মনে হয় যে সত্যিই বোধহয় বৃষ্টি পড়ছে। দর্শকদের মধ্যে এইরূপ মনে করানোর কৌশলটাই যাদুকরের কারসাজিমূলক কৌশল।

সংক্রামক যাদুর অর্থ হল অমঙ্গলজনক যা কিছু আসুক না কেন, তা যদি অতিমানবীয় (Supernatural) বা দৈব শক্তির সংস্পর্শে আসে, তৎক্ষণাৎ তা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। এটিকে অধ্যাপক মৃণালকান্তি ঘোষ দস্তিদার একটি উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করেছেন। কোনো অঞ্চলে সংক্রামক মহামারী দেখা দিলে ভিল্ সমষ্টিভুক্ত কিছু ব্যক্তি রোগমুক্তির জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে তারা একটি বাঁশের মাথায় একটি কলসী এবং একটি ঝুড়ি বেঁধে সেটি নিয়ে 'তোরাকা' 'তোরাকা' বলে চীৎকার করতে থাকে এবং প্রধান সড়ক দিয়ে দৌড়তে থাকে। তারপর জঙ্গলে বা নদীর পারে সেই বাঁশটি পুঁতে দিয়ে আসে। এর ফলে নাকি ঐ রোগ, যা মহামারীরূপে দেখা দিয়েছে, তা দূর হয়।

৮৪.১০ যাদুবিদ্যা ও ধর্মের সম্পর্ক

প্রাচীন আদিম সমাজব্যবস্থায় ধর্ম এবং যাদুবিদ্যার মধ্যে তেমন সুস্পষ্ট পার্থক্য ছিল না। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান এবং যাদুবিদ্যাসংক্রান্ত ক্রিয়াকর্ম পরস্পরের সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত ছিল। স্যার ফ্রেজার ধর্মের বিবর্তনবাদী-যুক্তিবাদী ব্যাখ্যায় অগ্রসর হয়ে যাদুবিদ্যা এবং ধর্মের মধ্যে পার্থক্য করেছেন এই যুক্তিতে যে যাদুবিদ্যা হল একটা 'কৃত্রিম স্বাভাবিক আইন ও প্রতারণাপূর্ণ আচারণবিধি', অন্যপক্ষে ধর্ম হচ্ছে 'মনুষ্যসুলভ ক্ষমতার উর্দ্ধতন কোনো ক্ষমতায় বিশ্বাস এবং সেই ক্ষমতাকে প্রসন্ন বা সন্তুষ্ট করার একটা প্রচেষ্টা। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি যাদুবিদ্যা এবং ধর্মের অবিচ্ছিন্নতা স্বীকার করেছেন, এমনকি এও লক্ষ্য করেছেন যে সভ্যসমাজেও ধর্ম ও যাদুবিদ্যা প্রায়ই মিশ্রিতভাবে অবস্থিত। কিন্তু যে সকল কারণে উভয়ের এই মিশ্রিত অধিষ্ঠান ফ্রেজার তা উল্লেখ করেন নি।

অধ্যাপক ডঃ মহাপাত্রের মতে, ধর্ম এবং যাদুবিদ্যার মধ্যে কয়েকটি ক্ষেত্রে সাদৃশ্য বর্তমান।

প্রথমত, মানুষ বিশ্বাস করে যে, ধর্ম বা যাদুবিদ্যার মাধ্যমে অতীন্দ্রিয় অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃত এক শক্তির সাহায্য লাভ করা সম্ভব। মানুষের ইচ্ছাপূরণ বা উদ্দেশ্য সিদ্ধির ক্ষেত্রে এই সাহায্য অতি প্রয়োজনীয়।

দ্বিতীয়ত, সমাজবদ্ধ মানুষের জীবনধারা অত্যন্ত সমস্যাসঙ্কুল। জীবনে চলার পথে মানুষ সংকটপূর্ণ অবস্থায় অনেক সময় জ্ঞান-বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে। মানুষ তখন দিশেহারা হয়ে পড়ে। এরকম অবস্থায় মানুষ ধর্ম অথবা যাদুবিদ্যার ভিত্তিতে অধিবাবহারিক পন্থা-পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকে। ম্যালিনাউস্কি এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

তৃতীয়ত, অধ্যাপক ডেভিসের মতে, ধর্ম এবং যাদুবিদ্যার উৎস অভিন্ন। উভয়েরই উৎপত্তি হয়েছে অতীন্দ্রিয় এবং অলৌকিক শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাস থেকে।

চতুর্থত, অগবার্ন নিম্‌কফের মতে, ধর্ম এবং যাদুবিদ্যার মধ্যে একটি নিয়ন্ত্রণমূলক এবং নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থার ইঙ্গিত থাকে। কার্যত, এই নিয়ন্ত্রণ এবং নিরাপত্তার উদ্দেশ্য হচ্ছে যতদূর সম্ভব মানুষের মন থেকে উদ্বেগ, দুর্ভাবনা-দুশ্চিন্তা প্রভৃতি লাঘব করা। সুতরাং গোল্ডথ্রোপ (Goldthrope)-এর কথায় আমরা বলতে পারি যে, মানুষের দূরদর্শিতা ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার মধ্যে যে ফাঁক থেকে যায় এবং সেই কারণেই মানুষের মনে যে সকল উদ্বেগ এসে বাসা বাঁধে, ধর্ম এবং যাদুবিদ্যা হচ্ছে সেই সকল উদ্বেগ দূরীকরণের কতকগুলি প্রতীকধর্মী কর্মতৎপরতা।

যাদুবিদ্যা কিন্তু ধর্ম নয়। যাদুবিদ্যার সাথে বিশ্বাসের প্রশ্নও জড়িত থাকতে পারে। তাই বলে যাদুকে ধর্ম ভাবা সমীচীন হতে পারে না। সেল্‌বী (Selbie) মনে করেন যে, দীর্ঘকালযাবৎ যাদুকে নৈতিক অবিশুদ্ধতার বিষয়বস্তু হিসাবে গণ্য করা হয়ে আসছে। যাদুকে যদি কেউ কেউ ধর্ম বলে জ্ঞান করে থাকে, তাহলেও তা অতি নিম্নমানের নিষিদ্ধ ধর্ম বলে পরিগণিত হয়। অর্থাৎ যাদু কখনো বিশুদ্ধ বা নির্ভেজাল ধর্ম নয়, ধর্মের নিকৃষ্ট প্রকার হতে পারে মাত্র।

যাদুবিদ্যা এবং ধর্মের মধ্যে সাদৃশ্যের তুলনায় বৈসাদৃশ্য এত বেশী যে দুটিকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পর্যায়ভুক্ত করা সঙ্গত।

প্রথমত, যাদুবিদ্যা একটি উপলক্ষ্য মাত্র; কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য এর প্রয়োগ করা হয়। পক্ষান্তরে ধর্মকে এই ধরণের নিছক উপলক্ষ্য বলে ভাবা সঙ্গত নয়। উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যাক। ম্যালিনাউস্কির মতে, সন্তান-প্রসবের সময় প্রসূতির যাতে মৃত্যু না হয় তার জন্য নানাধরণের যাদুবিদ্যার আশ্রয় নেওয়া হয়। কিন্তু সন্তানের জন্ম হলে আনন্দোৎসবের অঙ্গ হিসাবে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করা হয়। তবে সব ক্ষেত্রে যে ধর্মের কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে না, তা বলা যায় না। কিন্তু অধিকাংশ সময় আমাদের ঐহিক স্বার্থের উর্দ্ধে এই লক্ষ্য নির্দিষ্ট হয়। যেমন- যখন কেউ অন্যায় করার জন্য মনে পীড়া অনুভব করে এবং দোষ স্খালনের জন্য প্রার্থনা বা অন্যান্য ধর্মীয় আচার পালন করে, তখন তার লক্ষ্য হল পাপ থেকে মুক্তি লাভ করা এবং পুণ্য অর্জন করা। আবার অনেক সময় অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রার্থনানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়। এখানে লক্ষ্য হল পার্থিব। কিন্তু যে পন্থায় এই লক্ষ্যে পৌঁছবার ব্যবস্থা করা হয়, তা ধর্মীয়।

দ্বিতীয়ত, ডানকাণ মিশেল্ (Duncan Mitchell) ধর্ম এবং যাদুবিদ্যা বিশ্লেষণ করে উভয়ের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। যাদু হল এমন একটা পন্থা যার লক্ষ্য হল পরিস্থিতি এবং বাতাবরণ পরিবর্তিত করে

কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অচিরে লাভ করা। কিন্তু ধর্ম কোনো কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অচিরে লাভ করার প্রসঙ্গ নিয়ে আসে না। ধর্ম বিশ্বাসের বিষয়মুখীন (subjective) অবস্থার সাথে সংযুক্ত। ধর্মের মাধ্যমে মানুষ তার মনোভাব অথবা দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন করতে চায় এবং প্রকৃত ক্ষেত্রে সে জানতে চায় যে সে কীভাবে কাজ করবে। অথচ, আপাতদৃষ্টিতে আমাদের মনে হয় যে যাদুবিদ্যা এবং ধর্ম উভয়ই 'অলৌকিক জগতের' (supernatural) সাথে সংশ্লিষ্ট।

তৃতীয়ত, ধর্মের উচ্চতর বিকাশের ক্ষেত্রে ন্যায়-নীতিবোধের অভিব্যক্তি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। ডঃ মহাপাত্রের অভিমত অনুসারে ধর্মবোধের সাথে শ্রদ্ধাভক্তির উচ্চভাব বর্তমান থাকে। এছাড়া শুচিতা এবং পবিত্রতার ধারণাও ধর্মের সাথে সংযুক্ত থাকে। অন্যদিকে যাদুবিদ্যার সাথে নীতিবোধের এবং পবিত্রতা অথবা শুচিতার কোনো সম্পর্ক নেই।

চতুর্থত, ফ্রেজারের অভিমত অনুসারে বলা যেতে পারে যে, যাদুবিদ্যা ব্যক্তিগত কাজে অতীন্দ্রিয় গুপ্ত শক্তিকে ব্যবহার করতে সচেষ্ট হয়। তন্ত্র-মন্ত্রের মাধ্যমে অতিপ্রাকৃত শক্তিকে প্রভাবিত করা এবং এই অলৌকিক শক্তিকে নির্দেশ পালনে বাধ্য করাই হল যাদুবিদ্যার উদ্দেশ্য। অন্যদিকে, ধর্মের উদ্দেশ্য হল সাধন-ভজন এবং আরাধনার মাধ্যমে মহাশক্তিকে সন্তুষ্ট করা এবং এই শক্তির কৃপা বা অনুগ্রহ লাভ করা। অর্থাৎ ধর্মাচরণের উদ্দেশ্য হল পূজার্চনার মাধ্যমে এই বিশ্বসংসারের নিয়ন্তা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করা এবং তাঁর কৃপা লাভ করা।

পঞ্চমত, ধর্মের ধারণার মধ্যে মানুষের উচ্চতর উপলব্ধি জ্ঞান এবং বুদ্ধি বর্তমান থাকে। উদাহরণ হিসাবে ডঃ মহাপাত্র ধর্মশাস্ত্রগুলির কথা উল্লেখ করেছেন। অন্যদিকে, যাদুবিদ্যার সাথে মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির নিতান্তই ক্ষীণ সম্পর্ক বর্তমান, আবার অনেক সময় কোনো সম্পর্ক থাকেও না।

ষষ্ঠত, ধর্ম পালনের ক্ষেত্রে সাধন-ভজন, উপাসনা, আরাধনা, প্রার্থনা ইত্যাদির কথা বলা হয়। অন্যদিকে, যাদুবিদ্যার সাথে দুর্বোধ্য এবং অলীক সব মন্ত্র-তন্ত্র, বশীকরণ ইত্যাদি ক্রিয়াকর্ম বিশেষভাবে সংযুক্ত থাকে। ধর্মবোধ এবং ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে এসব থেকে দূরে থাকার কথাই বলা হয়।

সপ্তমত, ধর্ম ব্যক্তিকেন্দ্রিক বিষয় নয়, সামাজিক বিষয়, পক্ষান্তরে, যাদুবিদ্যা ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়। যাদুবিদ্যার সাথে সংযুক্ত থাকেন একজন যাদুকর যিনি যাদু সম্পাদন করে থাকেন। তাঁর আচার-আচরণ সাধারণত স্বার্থপ্রণোদিত এবং শঠতাযুক্ত হয়ে থাকে।

অষ্টমত, ডঃ মহাপাত্র মনে করেন যে, ধর্মের মননশীল ক্ষেত্রটি বিশেষভাবে বিস্তৃত এবং সমৃদ্ধ। কারণ ধর্মের ধারণার মধ্যে বিভিন্ন সদুপদেশ এবং মননশীল প্রশ্নসমূহ বর্তমান থাকে। অন্যদিকে, যাদুবিদ্যার মননশীল ক্ষেত্রটি অতিমাত্রায় সংকীর্ণ এবং সীমাবদ্ধ। কারণ যাদুবিদ্যা বিশেষভাবে উপযোগবাদী।

সর্বোপরি, ধর্মের ধারণার জটিলতা এবং উদ্দেশ্যের ব্যাপকতার জন্যই ধর্মাচরণের পন্থা- পদ্ধতি এবং আচার-অনুষ্ঠানও সাধারণঃ জটিল প্রকৃতির হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে, অন্যতম ব্যবহারিক বিদ্যা হিসাবে যাদুবিদ্যার কলাকৌশল সাধারণত সরল প্রকৃতির হয়ে থাকে।

সুতরাং ধর্ম এবং যাদুবিদ্যার পারস্পরিক সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য- কোনোটিকেই অস্বীকার করবার উপায় নেই। তবে এটি লক্ষ্য করা যায় যে, যাদুবিদ্যা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের সাথে এমন নিবিড় জালে জড়িয়ে আছে যে সব সময় এই দুই ধরণের আচারকে পৃথক করে দেখার কোনো উপায় থাকে না। অনেক ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে যাদুবিদ্যার প্রভাব সুস্পষ্ট।

৮৪.১১ সারাংশ

প্রত্যেক সমাজেই ধর্মের ধারণা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। তবে সব সমাজেই ধর্মের প্রকৃতি এবং অর্থ এক নয়। ধর্ম মূলত একটি জটিল ধারণা। ফলে এর সর্বসম্মত কোনো সংজ্ঞা প্রদান করাও কষ্টসাধ্য ব্যাপার। সমাজবিজ্ঞানী ফ্রেজার, ম্যাকাইভার, অগবার্ণ এবং নিমকফ, ডুর্কহেইম, ট্যাগার্ট, রবার্টসন, কোঁত প্রমুখরা তাঁদের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ধর্মের সংজ্ঞা প্রদান করবার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের আলোচনাসূত্রে ধর্মের অন্তরঙ্গ এবং বহিরঙ্গ- এই দুটি দিকের পরিচয় পাওয়া যায়। অন্তরঙ্গ দিক হল মহত্তর অথবা উচ্চতর ঈশ্বরীয় শক্তিতে বিশ্বাস হতে সৃষ্ট কিছু ভাব, অনুভূতি, চেতনা, প্রত্যয় ইত্যাদি। বহিরঙ্গের দিক হল বিভিন্ন ধরণের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, ক্রিয়া-প্রক্রিয়া যাদের মাধ্যমে অন্তরঙ্গ বিষয়গুলির অভিব্যক্তি ঘটে থাকে। প্রকৃতপক্ষে, অতিমানবিক এবং অতিপ্রাকৃত সত্তায় বিশ্বাস, পার্থিব এবং অপার্থিব কিছু প্রাপ্তির আশা, পাপসংক্রান্ত ধারণা, পাপীর প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা ইত্যাদি ধর্মের মধ্যে দিয়েই প্রতিফলিত হয়। অন্যদিকে, মার্ক্সীয় দর্শনে ধর্ম এবং ঈশ্বর-বিশ্বাসের বিরোধিতা করা হয়। ঈশ্বরাশ্রিত ধর্ম বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে একেশ্বরবাদ, বহু-ঈশ্বরবাদ, অদ্বৈতবাদ ইত্যাদি বিভিন্ন ধর্মমতের উদ্ভব হয়েছে।

ন্যায়-অন্যায়ের ধারণার ওপর ভিত্তি করে মূলত নৈতিকতার জন্ম হয়। ধর্ম সম্পর্কিত আলোচনায় নৈতিকতার উল্লেখ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। উভয়ই সামাজিক নিয়ন্ত্রণের উল্লেখযোগ্য মাধ্যম হিসাবে কাজ করে। ধর্ম এবং নৈতিকতা একে অপরের পরিপূরক। ধর্ম ব্যতীত নৈতিকতা যেমন অবাস্তব, তেমনই ধর্মের সমর্থন ছাড়া নৈতিকতা স্থিতিশীল হতে পারে না। আবার, ধর্মও নৈতিকতাবর্জিত নয়। ধর্মের সাথে নৈতিকতার যতই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকুক না কেন, আমরা তাদের মধ্যে পার্থক্যের বিষয়টিকেও অস্বীকার করতে পারব না। তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে, সুসংগঠিত সমাজজীবন গড়ে তুলতে ধর্ম এবং নৈতিকতার মধ্যে সুগভীর সম্পর্ক থাকা অতি আবশ্যক।

ধর্ম বনাম বিজ্ঞানকে কেন্দ্র করে বিতর্ক ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে লক্ষ্য করা যায়। একদল চিন্তাবিদ মনে করেন যে, ধর্ম এবং বিজ্ঞানের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক হল অসামঞ্জস্যপূর্ণ। আবার, আরেকদল মনে করেন যে, ধর্ম এবং বিজ্ঞানের মধ্যে বিরোধ হল মূলত বিজ্ঞান এবং অন্ধবিশ্বাসের বিরোধ। তবে অন্ধবিশ্বাস বিভিন্ন ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিশ্বাসের অঙ্গীভূত হওয়ায় মনে করা হয় যে, তা বিজ্ঞানের সাথে ধর্মের বিরোধেরই সামিল। বিজ্ঞান আধুনিক মানুষের দৈনন্দিন জীবনধারায় ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করলেও ধর্মের প্রয়োজনীয়তা অথবা গুরুত্বকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। ফলস্বরূপ, বর্তমানে বৈজ্ঞানিক ধ্যান-ধারনার সাথে ধর্মীয় বিশ্বাসের সামঞ্জস্য সাধন করার চেষ্টা করা হয়, যা সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক হিসাবে বিবেচিত।

যাদুবিদ্যা হল সেই সমস্ত বিশেষ ক্রিয়াকর্ম এবং মন্ত্রতন্ত্র যেগুলির মাধ্যমে কোনো নৈর্ব্যক্তিক গুপ্ত শক্তির সাহায্য লাভ করা যায় এবং বিভিন্ন বিষয়ে উদ্দেশ্য সিদ্ধও হয়। যাদুকর যাদুবিদ্যার সাহায্যে এই গুপ্ত শক্তিকে

বশীভূত করে উদ্দেশ্য চরিতার্থ করে থাকে। যাদুবিদ্যা সম্পর্কে ম্যালিনাউস্কি, এডওয়ার্ডস, রেইনাক প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানীরা তাঁদের নিজস্ব মতামত রেখেছেন। যাদুবিদ্যাকে অনুকরণমূলক এবং সংক্রামক তথা পরিত্রাণমূলক — এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। অনুকরণমূলক যাদুবিদ্যায় ব্যক্তির নিজ চাহিদাকে অনুকরণ করে যাদু প্রদর্শন করা হয়। অন্যদিকে, সংক্রামক যাদুবিদ্যায় মনে করা হয় যে, অমঙ্গলজনক সমস্ত কিছুই অতিমানবীয় বা দৈব শক্তির সংস্পর্শে এলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

যাদুবিদ্যা এবং ধর্মের সম্পর্ক সমাজতাত্ত্বিক আলোচনায় এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আদিম সমাজব্যবস্থায় ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান এবং যাদুবিদ্যাসংক্রান্ত কর্মকাণ্ড পরস্পরের সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কিত ছিল। তবে যাদুবিদ্যা এবং ধর্মের মধ্যে পার্থক্যই বেশী। বর্তমান সামাজিক জীবনযাত্রায় যাদুবিদ্যা ধর্মবিশ্বাসের সাথে এমন ঘনিষ্ঠবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে যে এদের পৃথক করা অনেক ক্ষেত্রেই অসুবিধাজনক হয়ে পড়ে।

৮৪.১২ অনুশীলনী

১) নীচের শূন্যস্থানগুলি পূরণ করুন ঃ

(ক) ধর্মের ক্রিয়ামূলক অথবা আনুষ্ঠানিক দিকটির উপর অধিক গুরুত্ব পরিলক্ষিত হয় _____ -এর প্রদত্ত সংজ্ঞায়।

(খ) _____ -এর মতানুযায়ী ধর্ম মানুষ এবং অন্য কোনো উর্দ্ধশক্তির মধ্যে সম্পর্ক রচনা করে।

(গ) ধর্মের সৃষ্টি হয়েছে কতকগুলি পবিত্র বিষয়কে কেন্দ্র করে বিভিন্ন কার্যকলাপের মাধ্যমে এবং ঐ সমস্ত পবিত্র বিষয়গুলি সমাজে স্বতন্ত্র ও নিষিদ্ধ অবস্থায় বর্তমান থাকে — এই অভিমত প্রকাশ করেন _____।

(ঘ) মানবতাকে ধর্ম হিসাবে গণ্য করার পক্ষপাতী হলেন _____।

(ঙ) মহত্তর শক্তিতে বিশ্বাস এবং ধারণার ভিত্তিতে সৃষ্ট অনুভূতি, চেতনা, প্রত্যয় ইত্যাদি হল ধর্মের _____ দিক।

(চ) অন্তরঙ্গ বিষয়গুলির বহিঃপ্রকাশ ঘটে ধর্মের _____ দিকের মাধ্যমে।

(ছ) ইসলাম ধর্ম এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করে বলে একে _____ ধর্ম বলে।

(জ) হিন্দু ধর্ম বহু ঈশ্বরে বিশ্বাস করে বলে একে _____ ধর্ম বলে।

(ঝ) যাদুবিদ্যাকে _____ এবং _____ এই দুইভাগে ভাগ করা যায়।

(ঞ) ট্রব্রায়ান্ড্ দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদের উপর যাদুবিদ্যার প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেন _____।

২) নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ

ক) সমাজ-দার্শনিকরা ধর্মকে কিভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন ?

খ) ধর্ম সম্পর্কে মার্কসবাদীদের বক্তব্যটিকে উল্লেখ করুন।

গ) ধর্মের প্রকারভেদগুলি কি কি ?

ঘ) যাদুবিদ্যার প্রকারভেদগুলিকে উদাহরণ সহযোগে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

ঙ) ধর্ম এবং যাদুবিদ্যার মধ্যে সাদৃশ্যগুলি কি কি ?

৩) নীচের প্রশ্নগুলির বিশদ উত্তর দিন ঃ

ক) ধর্ম বলতে কী বোঝায় ? ধর্মের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।

খ) ধর্ম এবং নৈতিকতার সম্পর্ক নিয়ে আলোকপাত করুন।

গ) আধুনিক সমাজে ধর্ম এবং বিজ্ঞানের প্রাসঙ্গিকতা বিষয়ে আলোচনা করুন।

ঘ) যাদুবিদ্যা বলতে কী বোঝায় ? ধর্ম এবং যাদুবিদ্যার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করুন।

৮৪.১৩ উত্তর সংকেত

১) ক) জেমস্ ফ্রেজার; খ) ম্যাকাইভার; গ) এমিল দুর্কহেইম; ঘ) কোঁত; ঙ) অন্তরঙ্গ; চ) বহিরঙ্গ; ছ) একেশ্বরবাদী; জ) বহু-ঈশ্বরবাদী; ঝ) অনুকরণমূলক, সংক্রামক তথা পরিত্রাণমূলক; ঞ) ম্যালিনাউস্কি।

৮৪.১৪ গ্রন্থপঞ্জী

১) বটোমোর টম ঃ সমাজবিদ্যা - তত্ত্ব ও সমস্যার রূপরেখা (অনুবাদ- হিমাচল চক্রবর্ত্তী); কে. পি. বাগচী অ্যাণ্ড কোম্পানী; কলকাতা; ১৯৯৫।

২) Haralambos Michael with Heald Robin : Sociology - Themes and Perspectives, Delhi, OUP; 1995.

৩) ঘোষ দস্তিদার মৃণালকান্তি ঃ সমাজবিজ্ঞান বিচিত্রা; নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি (প্রাঃ) লিমিটেড; কলকাতা; ২০০০।

৪) ডঃ মুখোপাধ্যায় অমলেন্দু ঃ প্রসঙ্গ সমাজতত্ত্ব ; সেন্ট্রাল বুক পাবলিশার্স; কলকাতা।

৫) ডঃ মহাপাত্র অনাদিকুমার ঃ বিষয় সমাজতত্ত্ব; ইণ্ডিয়ান বুক কনসার্ন; কলকাতা; ১৯৯৬।

৬) Rao C. N. Shankar : Sociology - Primary Principles of Sociology with an introduction to social throught; S. Chand & Company Ltd; New Delhi: 2000.

একক ৮৫ □ ধর্মের সামাজিক ভূমিকা

গঠন

৮৫.১ উদ্দেশ্য
৮৫.২ প্রস্তাবনা
৮৫.৩ ধর্মের সামাজিক ভূমিকা
৮৫.৩.১ ধর্মের ইতিবাচক ভূমিকা
৮৫.৩.২ ধর্মের নেতিবাচক ভূমিকা
৮৫.৪ সারাংশ
৮৫.৫ অনুশীলনী
৮৫.৬ উত্তর সংকেত
৮৫.৭ গ্রন্থপঞ্জী

৮৫.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি ধর্মের সামাজিক ভূমিকা সংক্রান্ত আলোচনা প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির বিচার বিশ্লেষণে সক্ষম হবেন এবং এই বিষয় সংক্রান্ত গবেষণাকার্যে আপনার বিচার-বুদ্ধির প্রকৃত প্রয়োগ ঘটাতে সমর্থ হবেন : —

- ধর্মের ইতিবাচক ভূমিকা,
- ধর্মের নেতিবাচক ভূমিকা।

৮৫.২ প্রস্তাবনা

অতি প্রাচীনকাল থেকেই ধর্মের অস্তিত্ব মানবসমাজে বর্তমান। প্রাচ্য, পাশ্চাত্য—সমস্ত ধরণের সমাজ ব্যবস্থায় ধর্মের ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। সমাজতত্ত্বের কাজ হ'ল ধর্মের সামাজিক প্রভাব নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করা। সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ, সামাজিক কাঠামো এবং সমাজের সমষ্টিবদ্ধতার ওপর ধর্ম কীভাবে প্রভাব বিস্তার করে, তা আলোচনা করা সমাজতত্ত্বের অন্যতম উদ্দেশ্য। মূলত ধর্মীয় বিশ্বাস ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান এবং রীতিনীতির ওপর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। এমিল দুর্কহেইম এবং ম্যাক্স-ওয়েবার উভয়ই ধর্মের এই প্রভাব নিয়ে বিস্তর গবেষণা করেছেন। তাঁরা লক্ষ্য করেছেন যে, মানবিক ক্রিয়াকলাপের এমন ক্ষেত্র কদাচিৎ নজরে পড়বে, যেখানে ধর্ম প্রভাব ফেলে নি। প্রকৃতপক্ষে, মানবিক ক্রিয়াকলাপের প্রায় সমস্ত পর্যায়েই ধর্ম সক্রিয় একটা ভূমিকা পালন করেছে। এ প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, সমাজের ওপর ধর্মের যেমন ইতিবাচক ভূমিকা রয়েছে, ঠিক তেমনই নেতিবাচক ভূমিকাও বর্তমান। পূর্ববর্তী এককে আমরা ধর্ম বলতে কী বোঝায় এবং ধর্ম ও যাদুবিদ্যার সম্পর্ক প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি। বর্তমান এককে আমরা ধর্মের সামাজিক ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করব।

৮৫.৩ ধর্মের সামাজিক ভূমিকা

বিশিষ্ট সমাজতত্ত্ববিদ্ পরিমল ভূষণ করের অভিমত হ'ল যে, সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে যাদুবিদ্যার পরিবর্তে ধর্ম উত্তরোত্তর প্রাধান্য পায়। মানুষের জীবনে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনিশ্চয়তা, পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করতে না পারার জন্য অসহায়বোধ এবং অভাবজনিত ব্যর্থতা পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। এই অবস্থায় দুটি দিক থেকে ধর্মের প্রয়োজন। একটি হল, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের দুঃখ-দুর্দশা, অভাব-অভিযোগের ঊর্দ্ধে আরেকটি জগত উন্মোচিত করা যাতে জাগতিক দুঃখ, অভাব প্রভৃতি সহনীয় হয়। দ্বিতীয়টি হল, আত্মবিশ্বাস বজায় রাখার জন্য উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনা তুলে ধরা।

অধ্যাপক আরনল্ড টয়েনবী (Arnold Toynbee), ডসন (C. H. Dawson) প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানীরা মন্তব্য করেছেন যে, ধর্ম মানবসমাজের সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কযুক্ত। মানবসভ্যতাকে বিপদাপন্ন করে তোলে ধর্মের অনস্তিত্ব অথবা ধর্মের ব্যর্থতা। ব্যক্তি-জীবনের অনেকটা স্থান দখল করে রয়েছে ধর্ম। প্রকৃতপক্ষে, ব্যক্তি-জীবনে এবং সমাজ জীবনে ধর্মের ভূমিকা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের অসীম সত্তার সাথে মিলিত হওয়ার বাসনা পরিতৃপ্ত হয় ধর্মের মাধ্যমে। ধর্মের উন্মেষ মানবজীবনে অপূর্ণতার জ্বালা দুর করে এবং পরিপূর্ণতা অর্জনের উদ্যোগকে সার্থক করে তোলে। আবার, ধর্মের একটি সামাজিক ভূমিকাও বর্তমান। সমগ্র সমাজব্যবস্থা অথবা মানুষের সমগ্র সমাজ-জীবনের ওপর ধর্মের প্রভাব-প্রতিপত্তি পরিলক্ষিত হয়। কারণ, ধর্মবোধের সাথে সমাজবদ্ধ মানুষের নীতিবোধের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। ধর্মবোধের সাথে মানুষের সামাজিকতারও একটি সম্পর্ক বর্তমান, মানুষের সামাজিকতার একটি উল্লেখযোগ্য উপাদান হল ধর্ম। স্বভাবতই, আর্থ-সামাজিক, রাজনীতিক, পারিবারিক প্রভৃতি ব্যক্তিজীবন এবং সমাজজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ধর্ম তার অবিসংবাদিত প্রভাব প্রতিপত্তি বজায় রাখে। 'The Psychology of Religion' শীর্ষক গ্রন্থে সমাজবিজ্ঞানী সেলবি (W. B. Selbie) মন্তব্য করেছেন যে, পবিত্র সমাজ অথবা গীর্জা কেউই ঈশ্বরে পরিণত হতে পারে না বা ঈশ্বরের স্থান দখল করতে পারে না। মানুষ একটি জনসম্প্রদায়ের সদস্য হিসাবে অন্যান্য সদস্যবৃন্দের সাথে ঈশ্বর উপাসনা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পারে। এই জনসম্প্রদায়ের অস্তিত্বের মূল কারণ হ'ল সেই সমস্ত লক্ষ্যগুলি পূরণ করা যেগুলির জন্য স্বয়ং ঈশ্বর রয়েছেন।

আমাদের সমাজে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান (Institution) বর্তমান, এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলির মতো ধর্ম হ'ল বিশেষ কার্যপ্রণালীর ভিত্তিতে উদ্ভূত বিশেষ একটি কাঠামো। সমাজবদ্ধ মানুষের কতকগুলি বিশেষ প্রয়োজন পূরণের উপায় অথবা মাধ্যম হিসাবে ধর্মের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তবে ব্যক্তি তথা সমাজজীবনে ধর্মের ইতিবাচক এবং নেতিবাচক - উভয়বিধ ভূমিকাই বর্তমান ধর্মের সামাজিক ভূমিকাকে কেন্দ্র করে এই ধরণের শ্রেণীবিভাজন অনেকাংশেই আপেক্ষিক কারণ, কোনো একটি ভূমিকা কোনো ব্যক্তির কাছে ইতিবাচক হতে পারে, আবার ঐ একই ভূমিকা অন্য কারো কাছে নেতিবাচক হতে পারে। যাই হোক্ আসুন প্রথমে আমরা ধর্মের ইতিবাচক ভূমিকাগুলিকে একটু বিচার-বিশ্লেষণ করি।

৮৫.৩.১ ধর্মের ইতিবাচক ভূমিকা

প্রথমত, ব্যক্তির আচারব্যবহার এবং সমাজজীবনের ধারা ধর্মীয় অনুশাসনের দ্বারা বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। মূলত, ধর্মীয় অনুশাসনের প্রত্যক্ষ এবং প্রচ্ছন্ন প্রভাব সমাজবদ্ধ মানুষের পারিবারিক এবং গোষ্ঠী-জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রসারিত। মানুষের দৈনন্দিন জীবনধারার ওপর ধর্মীয় অনুশাসনের প্রভাব অপরিসীম। বিশিষ্ট অধ্যাপক ডঃ অনাদিকুমার মহাপাত্রের মতে, ধর্ম মানুষকে নীতিনিষ্ঠ করে তোলে। সামাজিক বিধি-নিষেধ মেনে চলতে ধর্ম মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে। মানুষ এক অভীষ্ট লক্ষ্যে পরিচালিত হয় ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যমে। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের সূত্রে এক ভাবগম্ভীর পরিবেশের সৃষ্টি হয় যার প্রভাবে মানুষের আচার-ব্যবহার স্বভাবতই সংযত হয়ে পড়ে, এক লোকাতীত সত্তায় বিশ্বাসের ভিত্তিতে মানুষের মনে সৃষ্টি হয় ভয়-মিশ্রিত বিশেষ এক শ্রদ্ধা-ভক্তির ভাব। এই ভাবের ভিত্তিতে ব্যক্তি তার বাহ্যিক আচার-ব্যবহারকে সংযত এবং নিয়ন্ত্রিত করতে বাধ্য হয়।

অধ্যাপক মৃণালকান্তি ঘোষ দস্তিদার মনে করেন যে, সমগ্র সমাজ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেও ধর্মের ভূমিকা অনস্বীকার্য। ধর্মীয় অনুশাসনের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া সমাজ জীবনের প্রায় সকল ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। কোঁত (conte) বলেন যে, বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে এবং বিভিন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে মতৈক্য এবং সহমত স্থাপনেও ধর্মের ভূমিকা বর্তমান। বৌদ্ধিক দিক হল অন্ধভক্তি বা গোঁড়া বিশ্বাস এবং কার্যকরী বিষয় হ'ল প্রেম, এবং বাস্তব বিষয় হ'ল পূজাপদ্ধতি - এ সমস্তকেই ধর্ম ধারণ করে রেখেছে। বৌদ্ধিক চেতনা, আবেগ ও ইচ্ছার প্রতি ধর্ম একযোগে আহ্বান জানায় এবং শুভবুদ্ধির উন্মেষ ঘটায়, যা সামাজিক নিয়ন্ত্রণে গভীর প্রভাব ফেলে। ডুর্কহেইমের (Durkheim) এর মতে, ধর্ম 'সমষ্টিচেতনা' (sense of community) অথবা সমষ্টিবোধকে পুনর্বলবৎ (reinforces) করে। যারাই ধর্ম অনুসরণ করে তাদের সবাইকে ধর্ম ঐক্যবদ্ধ করে।

ডঃ মহাপাত্রের মতে, সমাজবদ্ধ মানুষের জীবনধারায় বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠান এবং ঘটনাদি সম্পাদিত হয়ে থাকে কোনো-না-কোনো ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। উদাহরণ হিসাবে আমরা জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, গৃহপ্রবেশ, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদির কথা বলতে পারি, যেগুলি ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। মানুষের সামাজিক জীবনের কথা বাদ দিলেও রাজনৈতিক, প্রশাসনিক এবং বিচারকার্যে শপথ গ্রহণের যে রীতি পরিলক্ষিত হয়, সেক্ষেত্রেও ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণের অস্তিত্ব অনস্বীকার্য. ইভানস প্রিচার্ড (E. E. Evans Pritchard) তাঁর 'Religion' শীর্ষক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে, জন্ম, উপনয়ন, বিবাহ, অসুস্থতা, মৃত্যু ইত্যাদি বিভন্ন সামাজিক ঘটনাপ্রবাহে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানসমূহ পালিত হয়ে থাকে এবং এই সমস্ত আচার-অনুষ্ঠানগুলি আচার পরিবার, জ্ঞাতিত্ব এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে সম্পর্কিত। জেমস ফ্রেজার (James Frazer)-এর অভিমত অনুসারে বলা যায় যে, ধর্ম নামক বিশেষ শক্তিটি মানুষ এবং সমাজের জীবনধারাকে নিয়ন্ত্রণ করে।

দ্বিতীয়ত, ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের ওপর ধর্মবিশ্বাস কার্যকরী প্রভাব বিস্তার করে। ডঃ মহাপাত্রের অভিমত অনুসারে মানুষের জীবনদর্শন অনেকক্ষেত্রে ধর্মবিশ্বাসের মাধ্যমে নির্দ্ধারিত হয়ে যায়। নিরাপত্তাবোধের অভাবজনিত হতাশা মানুষের মনে দেখা দেয়। অতীন্দ্রিয় দৈবশক্তির আশ্রয় এবং অনুকম্পা লাভ করে মানুষ এই হতাশা থেকে মুক্তি পায়। ধর্ম মানুষকে ভীতি, বিচ্ছিন্নতাবোধ ইত্যাদি থেকে রক্ষা করে। সুস্থ এবং স্বাভাবিক সমাজজীবনকে সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ধর্মের এই ভূমিকার গুরুত্ব অপরিসীম।

সমাজজীবনে মানুষ নানাবিধ যন্ত্রণার মুখোমুখি হয়ে থাকে। ধর্মবোধ মানুষকে এ ধরণের যাবতীয় যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি দেয়। দৈবদুর্বিপাক, যুদ্ধবিগ্রহ, প্রাকৃতিক বিপর্যয় ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে সমাজজীবনে আকস্মিকভাবে পরিবর্তন ঘটে থাকে। মানুষ তখন হতাশাগ্রস্ত হয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ে। এরকম অবস্থায় মানুষের আশু প্রয়োজন হ'ল নিরাপত্তাবোধের ব্যবস্থা করা। এরকম পরিস্থিতিতে ধর্ম মানুষের মনে শক্তি এবং সান্ত্বনার সঞ্চার করে এবং আশা ও বিশ্বাস জাগায়। আবার, আবেগতাড়িত জনতার ওপর ধর্মীয় আবেদনের কার্যকারিতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সমাজবিজ্ঞানী লে বঁ (Le Bon) তাঁর 'The Crowd' শীর্ষক গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। মূলত, যুক্তিহীন এবং আবেগতাড়িত জনতার ওপর ধর্মীয় চেতনার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া এবং ক্ষেত্রবিশেষে তার গুরুত্ব এবং তাৎপর্য অনস্বীকার্য।

তৃতীয়ত ডঃ মহাপাত্র মন্তব্য করেন যে, ধর্ম মানুষের চরিত্র গঠন করে এবং এই সূত্রে সমাজজীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে থাকে। প্রাচীন সমাজের মতো আধুনিক সমাজেও ধর্মের এই ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ। সুস্থ সমাজজীবনের স্বার্থে নীতি এবং আদর্শকে যথাযথ মূল্য এবং গুরুত্ব প্রদান করা এবং তার সংরক্ষণ ও বিস্তারের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে ধর্মই সহায়ক ও কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে। ধর্মই সমাজে নীতি এবং আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করে। সমাজবদ্ধ মানুষের বাহ্যিক আচার-ব্যবহারকে ধর্ম সংযত করে এবং এই পথে তাদের নৈতিক উন্নতি সাধন করে। যে সমস্ত ব্যক্তি সমাজে নীতিভ্রষ্ট, তারা সমাজে ধর্মচ্যুত বলেও বিবেচিত হন। স্বভাবতই প্রচলিত মূল্যবোধ সম্পর্কে সমাজে কোনোরকম বিরোধবিতর্ক দেখা যায় না। মানুষের নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে ধর্ম উন্নত করে এবং এই পথে ধর্ম ব্যক্তির চেতনাকে বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন, হৃদয়কে পবিত্র ও চিত্তকে শুদ্ধ করে। ধর্মবোধের প্রভাব সমাজের সদস্যদের সহনশীল, সহানুভূতিসম্পন্ন, পরোপকারী এবং মমত্ববোধযুক্ত করে তোলে। ধর্ম মানুষকে চিন্তায় ও আচরণে সৎ এবং ন্যায়-পরায়ণ হতে এবং সামাজিক মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে শিক্ষা দেয়। অসৎ পথ পরিহার করে সৎ পথে চলতে ধর্ম মানুষকে অনুপ্রাণিত করে থাকে। আবার, সমাজবদ্ধ মানুষ যাতে সামাজিক নিয়ম-নীতি যথাযথভাবে মেনে চলে এবং সামাজিক দায়-দায়িত্ব যত্নসহকারে পালন করে সে ব্যাপারে ধর্ম সকলকে উজ্জীবিত করে।

চতুর্থত, ধর্ম সমাজবদ্ধ মানুষের সংস্কৃতি এবং বস্তুজগতকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। মানুষের ধর্মবোধ এবং শিক্ষার সাথে তার ব্যবহারিক জীবনের সংযোগ অনস্বীকার্য, এই সংযোগের ফলশ্রুতি হিসাবে সমাজের সদস্যদের বাস্তবজীবনকে ধর্ম প্রভাবিত ও পরিবর্তিত করে। এমিল ডুর্কহেইম (Emile Durkheim) তাঁর ১৯১২ সালে প্রকাশিত The Elementary Forms of Religious Life' শীর্ষক গ্রন্থে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন যে, জৈন, পার্শী প্রভৃতি ধর্মীয় মতবাদ ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে প্রভাবিত এবং সমর্থন করেছে। সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবার (Max Weber) তাঁর ১৯০৫ সালে প্রকাশিত 'The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism' শীর্ষক বিখ্যাত গ্রন্থে মানুষের অর্থনৈতিক আচরণের ওপর ধর্মের প্রভাবের বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। তাঁর মতে, ধর্ম এবং অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ পরস্পর পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। ধর্মের প্রভাব সম্পর্কে ওয়েবার কর্ম সংক্রান্ত বিধান (work ethics) - এর ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি খ্রীষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ, ইহুদী, ইসলাম এবং কনফুসিয়াস ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। ওয়েবার এই ধারণা পোষণ করতেন যে, অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হয়। কোনো কোনো ধর্মবিশ্বাস অর্থনৈতিক উদ্যোগকে ত্বরান্বিত করে। আবার অন্যদিকে কোনো কোনো ধর্মবিশ্বাস অর্থনৈতিক উন্নতির পথে প্রতিবন্ধকতা

সৃষ্টি করে। তিনি দেখিয়েছেন যে, কেবলমাত্র প্রোটেস্টান্ট ধর্মেই কর্ম সম্পর্কিত নীতির ওপর জোর দেওয়া হয়। স্বভাবতই খ্রীস্ট ধর্মাবলম্বীদ্বারা সাধারণত যুক্তিসঙ্গত কার্যপ্রণালী (Rational action) অনুসরণ করে থাকেন। এর ভিত্তিতে ওয়েবার এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, পাশ্চাত্যের আধুনিক পুঁজিবাদের উদ্ভবের পিছনে প্রোটেস্টান্ট ধর্মের কর্ম সম্পর্কিত বিধানের অবদান অনস্বীকার্য। তিনি মনে করেন যে, প্রোটেস্টান্ট ধর্মের যুক্তিগ্রাহ্য কার্যপ্রণালীই হল আধুনিক পুঁজিবাদের প্রধান উপাদান (spirit)। পশ্চিমী দেশগুলিতে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উদ্ভব প্রসঙ্গে ওয়েবার বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন এবং এক্ষেত্রে ধর্মকে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান (variable) হিসাবে প্রতিপন্ন করেছেন। তাঁর মতে, প্রোটেস্টান্ট ধর্ম বিশ্বাসের মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ধ্যান-ধারণা বর্তমান। এই ধর্মীয় নীতির নিয়মানুবর্তী এবং সুবিন্যস্ত জীবনবোধ, কঠোর সংযম এবং তদনুযায়ী সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

বৌদ্ধ ধর্ম প্রসঙ্গে আলোচনায় ওয়েবার দেখিয়েছেন যে বৌদ্ধ ধর্ম পার্থিব জীবনকে অর্থহীন প্রতিপন্ন করে এবং মানুষের মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার ঘটায়। বৌদ্ধ ধর্মে নির্বাণের কথা বলা হয়। ইসলাম ধর্ম পুঁজির বিরোধিতা করে। হিন্দু ধর্মের শিক্ষানুসারে অপার্থিব আধ্যাত্মিক সত্তার সারতত্ত্ব উপলব্ধির ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই ধর্মে পার্থিব সম্পদ গুরুত্বহীন বিবেচিত হয়। আবার এই ধর্মে জাতিভেদ প্রথা বর্তমান। তাই ওয়েবারের মতে, এই প্রথা অর্থনৈতিক বিপ্লবের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এস. এন. শ্রীনিবাস মন্তব্য করেছেন যে, ভারতবর্ষে হিন্দু ধর্মের প্রসার ঘটেছে একদিকে বিভিন্ন উপজাতীয় গোষ্ঠীর আচার-আচরণ এবং বিশ্বাসের 'সংস্কৃতায়ন' এবং অন্যদিকে ঐ সব গোষ্ঠীকে ভারতের জাত-পাত ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট জাত-পাত হিসাবে আত্তীকরণের ফলে। তাঁর অভিমত অনুসারে বলা যেতে পারে যে, কোনো একটি মানবগোষ্ঠী একটি জাত-পাত হয়ে উঠলে বুঝতে হবে যে হিন্দু ধর্মের মধ্যে তার অন্তর্ভুক্তিকরণ সম্পূর্ণ হয়েছে। অধ্যাপক বটোমোরের মতে, কোনো গোষ্ঠী হিন্দু ধর্মে অন্তর্ভুক্তির পরও পুরনো বিশ্বাস এবং আচার-অনুষ্ঠান বজায় রাখতে চাইলে হিন্দু ধর্ম তাতে বাধা দেয় নি, বরং নতুন অন্তর্ভুক্ত গোষ্ঠী ঐসব পুরনো রীতিনীতি ও ধ্যান-ধারণার সংস্কার ঘটিয়ে জাত-পাতের স্তরভেদে উচ্চতর মর্যাদা ক্রমে উন্নীত হতে চাইলে তার সুযোগ করে দিয়েছে, যার ফলে ধীরে ধীরে সেগুলি অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছে।

সুতরাং, ডুর্কহেইম, ম্যাক্স ওয়েবার, শ্রীনিবাস এবং বটোমোরের বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে এটিই স্পষ্টত প্রতিভাত হয় যে ধর্ম নানাভাবে আমাদের ব্যবহারিক জীবনযাত্রায় প্রভাব ফেলে থাকে।

পঞ্চমত, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি সমাজে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি এবং সৌভ্রাতৃত্বের সৃষ্টি করে থাকে। অধ্যাপক ডঃ মহাপাত্র বলেন যে, মঠ-মন্দির-গীর্জা-মসজিদ কেবলমাত্র ধর্মীয় সংগঠনই নয়, সামাজিক সংগঠনও বটে। এই সমস্ত ধর্মীয় সংস্থায় সমাজের সদস্যদের সমাবেশ ঘটে থাকে। ধর্মীয় সংগঠনগুলি সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের সমাগম এবং মেলামেশার ক্ষেত্র হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ। এর ফলশ্রুতি হিসাবে সৃষ্টি হয় পারস্পরিক সম্প্রীতি, সহানুভূতি এবং আন্তরিকতার। অধ্যাপক ম্যাকাইভার এবং পেজ (R. M. Mac. Iver and C. H. Page) তাঁদের 'Society : An Introductory Analysis' শীর্ষক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে গীর্জা সামাজিক মিথষ্ক্রিয়ার (Social Interaction) একটি উল্লেখযোগ্য মাধ্যম হিসাবে কাজ করে থাকে। অধ্যাপক জিসবার্ট (P. Gisbert) 'Fundamentals of Sociology' শীর্ষক গ্রন্থে মন্তব্য করেন যে, ধর্ম ঈশ্বরের পিতৃত্বের অধীনে মানুষের সাথে মানুষের সৌভ্রাতৃত্বের সৃষ্টি করে ("This is the basis of the broth-

erhood of man under the fatherhood of God.")। ষষ্ঠত, ধর্ম সামাজিক ঐক্য এবং সংহতি স্থাপনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্যভাবে সাহায্য করে থাকে। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর সদস্যদের সমবেত করে এবং এই সমাবেশ সূত্রে তাদের মধ্যে সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় হয়।

এমিল ডুর্কহেইম (Emile Durkheim) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির সামাজিক ভূমিকার কার্যকারিতা বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করেছেন এবং সামাজিক সংহতিকে সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে উল্লেখযোগ্য উপাদান হিসাবে প্রতিপন্ন করেছেন। তিনি তাঁর 'The Elementary Forms of Religious life' শীর্ষক গ্রন্থে ধর্মের সংজ্ঞা দিয়েছেন এবং ধর্মের সমাজতাত্ত্বিক দিকটি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। ডুর্কহেইমের মতে, ধর্মের অস্তিত্ব সামাজিক প্রয়োজনের ওপর নির্ভরশীল। তিনি মনে করেন যে, আদিমতম ধর্মীয় বিশ্বাস বলতে টোটেমবাদ (Totemism)-কেই বোঝানো হয়ে থাকে। অন্যান্য ধর্মের উদ্ভব হয়েছে টোটেম ধর্মীয় বিশ্বাসের সূত্রে। ডুর্কহেইম এ প্রসঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসী 'আরুণতাসদের' কথা উল্লেখ করেন। আরুণতাসরা প্রতীক বস্তু হিসাবে টোটেমকে ধর্মজ্ঞানে শ্রদ্ধা করতো। গোষ্ঠীর প্রতীক বস্তুকে কেন্দ্র করে এই ধর্মজ্ঞান মানবগোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক সংহতির সৃষ্টি ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করতো। টোটেমবাদের মধ্যে দিয়ে গোষ্ঠী জীবনের পবিত্রতা রক্ষা এবং সামাজিক সংহতি সুরক্ষিত হতো। তাই আরুণতাসদের মধ্যে টোটেম প্রথা কেবলমাত্র গোষ্ঠীর ধর্ম হিসাবেই পরিগণিত হয় নি। টোটেম প্রথা গোষ্ঠীজীবনের সাথে অভিন্নভাবে অবস্থান করতো।

ডুর্কহেইমের মতে, ধর্মের সারমর্ম হল জগতের সামগ্রিক বিষয়বস্তুকে পবিত্র (Sacred) এবং অপবিত্র বা জাগতিক (Profane) হিসাবে পর্যালোচনা করা। অপবিত্র বিষয়াদি মানুষের নিত্যদিনের পার্থিব অভিজ্ঞতায় লুকিয়ে আছে। এখানে মানুষের চাওয়া-পাওয়া, স্বার্থভিত্তিক মানসিকতা, বস্তুজাগতিক ধ্যান-ধারনায় স্বার্থ পরমার্থ রূপ লাভ করে। তাই ধর্মের এই দিকটি অপবিত্র বলে গণ্য করা হয়। অন্যদিকে কিছু কিছু বিষয়বস্তু আছে যেখানে স্বার্থ-সামর্থ্যের কোনো ধরণের সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয় না। এগুলি কেবলই পবিত্র বস্তু, তৎসংক্রান্ত বিশ্বাস এবং অনুষ্ঠানাদির সমাহার। ডুর্কহেইম এই পবিত্র বিষয়বস্তুর সাথে ধর্মের সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন। এই সূত্রেই ডুর্কহেইম দেখিয়েছেন যে টোটেম প্রথা আদিবাসীদের মধ্যে একটা পবিত্র মনন কেন্দ্র গড়ে তোলে এবং সমাজ বন্ধনের সৃষ্টি করে। তাঁর মতে, টোটেম হলেন একজন নৈর্ব্যক্তিক, নামহীন, ইতিহাসহীন ঈশ্বর যিনি জগতে স্থায়ীভাবে অবস্থান করেন এবং যিনি বিভিন্ন সাধারণ বস্তু যেমন — কাঠের টুকরো, বৃক্ষ, পশু-পাখি প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে প্রতিভাত হন। তাই তিনি বলেন যে, টোটেম নামক শক্তি মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হয়েও মানুষের কাছাকাছি অবস্থান করে। প্রকৃত অর্থে টোটেম নামক শক্তির প্রতিরূপ হিসাবে প্রচলিত সমাজের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। ডুর্কহেইমের মতে, ধর্মীয় উপাসনার নামে মানুষ চিরকালই সমাজকেই শ্রদ্ধা করে। তাই ঈশ্বর হচ্ছেন সমাজের ব্যক্তিস্বরূপের সম্মুখ প্রকাশ। সুতরাং, তিনি ধর্মকে সমাজ হিসাবে উল্লেখ করেছেন এবং মন্তব্য করেছেন যে ধর্মীয় প্রতীক এবং অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে একদিকে ধর্ম যেমন টিকে থাকে, অন্যদিকে গোষ্ঠীর একাত্মতা সুদৃঢ় হয়।

ম্যালিনাউস্কিও (Bronislow Malinowski) মনে করেন যে, ধর্ম সামাজিক ঐক্য এবং সংহতির সংরক্ষক হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। তিনি লক্ষ্য করেছেন যে, মানুষের সামাজিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন — জন্ম, বিবাহ, মৃত্যু ইত্যাদির সাথে ধর্ম বিশেষভাবে সংযুক্ত। জীবন সংকটের বিভিন্ন মুহূর্তে যে উদ্বেগ এবং উত্তেজনা দেখা দেয় ধর্ম তা প্রশমিত করে এবং এর মধ্যে দিয়ে সামাজিক ঐক্য এবং সংহতি রক্ষা করে।

র‍্যাড্‌ক্লিফ্ ব্রাউন (A. R. Radcliffe-Brown) বলেছেন যে, সমাজের অভ্যন্তরস্থ সদস্যদের মনে সামাজিক প্রয়োজন অনুযায়ী আচরণ করার মতো একটা ভাবানুভূতিসংক্রান্ত পদ্ধতি প্রোথিত থাকে বলেই সমাজের অস্তিত্ব সম্ভবপর হয়েছে। এই ভাবানুভূতি গড়ে ওঠার ব্যাপারটি সর্বদা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দ্বারা নির্ণয় করা যায় না। তবে সামাজিক সংহতির ক্ষেত্রে এগুলি অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। কিংসলে ডেভিসের (Kingsley Davis) মতে, সমাজ সংহতিসূচক এই ভাবানুভূতিগুলিকে যুক্তিবাদী করে তোলা কিংবা সেগুলির ন্যায্যতা প্রতিপাদন করা ধর্মের অন্যতম কাজ ('One of the functions of religion is to justify, rationalize, and support the sentiments that give cohesion to society')।

সুতরাং, এ কথা আমাদের মেনে নিতে অসুবিধা হয় না যে, সংযোগকারী অথবা সংহতি সাধনকারী শক্তি হিসাবে ধর্মের ভূমিকার গুরুত্ব এবং তাৎপর্য বিরোধ-বিতর্কের উর্দ্ধে। যথার্থ ধর্মীয় চেতনা বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিকে বৃহত্তর সমাজের মধ্যে আবদ্ধ রাখে, সমগ্র সমাজজীবনের সাথে ব্যক্তিকে ঐক্য এবং সম্প্রীতির বন্ধনে শৃঙ্খলিত করে। এই চেতনা সমাজজীবনে ঐক্য, সংহতি এবং শৃঙ্খলা সংরক্ষণে বিশেষভাবে সহায়ক।

সপ্তমত, যথার্থ ধর্মবোধ মানুষকে সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করতে অনুপ্রাণিত করে থাকে। অধ্যাপক ডঃ মহাপাত্রের মতে, সমস্ত সমাজেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে দাতব্য এবং জনসেবামূলক নানাবিধ কাজকর্ম পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। এই সমস্ত জনহিতকর কার্যের পিছনে ধর্মীয় মনোভাব প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে বর্তমান থাকে। প্রাকৃতিক, সামাজিক অথবা রাজনৈতিক বিপর্যয়ের সময় অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে বিভিন্ন ধর্মীয় সংস্থাগুলি জনসেবামূলক নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। আবার অনেক ক্ষেত্রে ধর্মীয় সংগঠনগুলি হাসপাতাল, বিদ্যালয়, প্রসূতিসদন, অতিথি সদন, অনাথ আশ্রম প্রভৃতি সংস্থা প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনার ব্যবস্থা করে। অনেক ধর্মীয় সংগঠন দরিদ্রদের সেবা, দীন-দুঃখীদের আর্থিক সাহায্য প্রদান শিক্ষামূলক বিধিব্যবস্থা গ্রহণ এবং সুস্থ আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করে।

পরিশেষে, ধর্মের আবেদন সঙ্গীত-সাহিত্য, ললিতকলা প্রভৃতি উন্নয়ন এবং সমৃদ্ধি সাধনের ক্ষেত্রেও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন সময়ে মানুষ বিখ্যাত সঙ্গীত, সাহিত্য, চিত্রকলা প্রভৃতি সৃষ্টি করেছে। এই সমস্ত সৃষ্টির পিছনে ধর্মবোধের অনুপ্রেরণা অনস্বীকার্য। ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নির্মিত বিভিন্ন শিল্পকর্ম, ভাস্কর্য, সৌধ প্রভৃতির মধ্যে ধর্মবোধের সার্থক প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়।

উপরোক্ত এই আলোচনা থেকে আপনি ব্যক্তিজীবন এবং সমাজ জীবনে ধর্মের ইতিবাচক প্রভাব-প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে জানতে পারলেন। কিন্তু ধর্মের সামাজিক ভূমিকা সম্পর্কে এটাই সব কথা নয়। একটু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে এবং বিভিন্ন সমাজে ও বিভিন্ন সময়ে ধর্মের ভূমিকা পর্যালোচনা করলে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, ধর্মের নেতিবাচক (dysfunctional) ভূমিকাও বর্তমান। অধ্যাপক করের মতে, যখন ধর্ম সুসংগঠিত আচার-ব্যবস্থা (institutionalised religion) হিসাবে গড়ে ওঠে, তখনই নেতিবাচক দিকটি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রধানতঃ কার্ল মার্ক্স (Karl Marx) এবং মার্ক্সীয় দর্শনে বিশ্বাসী ব্যক্তিবর্গই ধর্মের নেতিবাচক দিকটি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। তবে অ-মার্ক্সবাদী অনেক চিন্তাবিদ্ এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

আসুন, এখন ধর্মের নেতিবাচক দিকগুলি নিয়ে আলোচনা করা যাক।

৮৫.৩.২ ধর্মের নেতিবাচক ভূমিকা

অধ্যাপক ডঃ অনাদিকুমার মহাপাত্র ধর্মের নেতিবাচক ভূমিকার সমর্থনে এবং বিপক্ষে বিভিন্ন মতামতগুলি অত্যন্ত সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করেছেন। সেগুলি নিম্নরূপ ঃ-

প্রথমত, ধর্মীয় প্রভাব মানুষকে অদৃষ্টবাদী এবং কল্পনাপ্রবণ করে তোলে। ধর্মবোধের প্রভাবে মানুষ অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে বর্তমানের দুঃখ-দারিদ্র্যকে অক্লেশে সহ্য করে এবং ভবিষ্যতের সুখলাভের স্বপ্নে দিন অতিবাহিত করে। ঈশ্বরবিশ্বাসী মানুষ পরলোকের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। তার মধ্যে এই ধারণাই প্রবলভাবে কাজ করে যে সে ইহলোক ত্যাগের পর পরলোকে নরক যন্ত্রণা এড়িয়ে নিরবচ্ছিন্ন সুখ লাভ করতে পারবে। এইভাবে ধর্ম মানুষের মনে এক অন্ধ বিশ্বাসের সৃষ্টি করে এবং তার ফলে সে অনেকাংশে নিরুদ্যম এবং নিস্পৃহ হয়ে পড়ে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার যাবতীয় শক্তি হারিয়ে ফেলে মানুষ অবিচার-অনাচারের সাথে আপোষ করে চলে।

ধর্মের নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কিত এই বক্তব্য সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয় না। ধর্মীয় চেতনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে মানুষ যেমন সামাজিক সংস্কারে অংশগ্রহণ করেছে, তেমনই বিপ্লব সংগঠিত করেছে। কোনো কোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষেত্র বিশেষে আর্থ-সামাজিক আন্দোলন পরিচালনা করেছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে সমাজজীবনে বহু অন্যায়-অত্যাচার এবং দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি প্রতিবাদ করেছে। সুতরাং, সমাজজীবনে উন্নতি ও প্রগতির ক্ষেত্রে ধর্মের ইতিবাচক অবদানকে অস্বীকার করা যায় না।

দ্বিতীয়ত, কার্ল মার্ক্সের মতে, ধর্ম হল শ্রেণী-শোষণের হাতিয়ার বিশেষ। এই হাতিয়ার শোষক শ্রেণীর হাতে থাকে এবং এই হাতিয়ারের সাহায্যে শোষণ বলবৎ করা হয়। সমাজের কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষই শোষণের এই হাতিয়ারটি সৃষ্টি করে। সাধারণ মানুষকে এই হাতিয়ার দিয়ে আফিঙের নেশার মতো বিভোর করে রাখা হয়। এইভাবে সমাজের স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী শোষণের সুযোগ সৃষ্টি করে। মার্ক্সের মতে, ধর্ম হল সাধারণ মানুষের কাছে আফিঙের নেশার মতো ('Religion is the opiate of the masses.')। মার্ক্সবাদীদের অভিমত অনুসারে বলা যেতে পারে যে, ব্যবহারিক অথবা বস্তুজগতের ওপর ধর্মের কোনো কার্যকর প্রভাব লক্ষ্য করা যায় না। মার্ক্সীয় দর্শন অনুযায়ী মানবসমাজের মূল কাঠামোর বনিয়াদ (structure) - এর ওপর গড়ে ওঠে উপরি-কাঠামো (super - structure)। ধর্ম এই উপরি কাঠামোরই অন্যতম অংশ। সুতরাং, সমাজের মূল কাঠামোর যদি পরিবর্তন ঘটে, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই উপরি-কাঠামোর অংশ হিসাবে ধর্মেরও পরিবর্তন ঘটবে।

এ কথা অনস্বীকার্য যে, সমাজের সাধারণ মানুষের ওপর শাসন-শোষণ বলবৎ করার ক্ষেত্রে ধর্মকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আবার এ কথাও সত্য যে, আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে জনকল্যাণ এবং উন্নয়নমূলক বহুবিধ কাজকর্মের পিছনে ধর্মীয় চেতনার উপস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সাধারণ মানুষের ওপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে এবং সমাজসংস্কারমূলক নানাবিধ কাজকর্মের পিছনে নানা সময় বিভিন্ন বিপ্লব, বিদ্রোহ, আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে। এগুলির পিছনে ধর্মের সক্রিয় ভূমিকা বর্তমান। সর্বোপরি মার্ক্স মানবজীবনের আধ্যাত্মিক দিকটি অগ্রাহ্য করে কেবলমাত্র বস্তুজগতের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

তৃতীয়ত অনেক সমালোচক মনে করেন যে ধর্ম অনেক সময় আবেগ অথবা অন্ধবিশ্বাসে পরিণত হয়। এরকম পরিস্থিতিতে ধর্ম বিজ্ঞান-বিরোধী হয়ে পড়ে এবং সৃজনমূলক চিন্তা ও কার্যের পরিপন্থী প্রতিপন্ন হয়।

ধর্মবিরোধীদের মতে, ধর্ম হল বিচার-বিবেচনাহীন আবেগযুক্ত (dogmatic) চিন্তাধারার সমষ্টি। আবার ধর্মান্ধতা সমাজের সাধারণ মানুষের মনের সুস্থ এবং স্বাধীন চিন্তাধারাকে ব্যাহত করে এবং সমাজজীবনে বহু কুসংস্কারের সৃষ্টি করে। এই কারণে সমালোচকদের মতে, ধর্ম এবং বিজ্ঞানের মধ্যে সনাতন বিরোধ বর্তমান।

ধর্মের নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে উপরোক্ত অভিযোগের মধ্যে আংশিক সত্য বর্তমান, তৎসত্ত্বেও বলা যেতে পারে যে ধর্মান্ধতা এবং ধর্ম এক নয়। সুতরাং, ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে সমালোচনাকে ধর্মের বিরুদ্ধে সমালোচনা হিসাবে গণ্য করা যায় না। তবে সভ্যতার ক্রমবিকাশ এবং অগ্রগতির পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের অন্ধবিশ্বাস এবং রক্ষণশীলতা ধীরে ধীরে দূর হচ্ছে এবং বিচার-বিবেচনাবোধ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

চতুর্থত, সমালোচকদের মতে, ধর্ম-বিশ্বাস প্রগতিবিরোধী এবং রক্ষণশীলতা দোষে দুষ্ট। ধর্মের রক্ষণশীল মনোভাবের জন্য কোনো রকম নতুন ব্যবস্থাকে স্বীকার অথবা সমর্থন করা যায় না। ধর্ম-বিশ্বাসীরা মনে করেন যে, ধর্মীয় অনুশাসন এবং বিশ্বাস হল শাশ্বত, চিরন্তন এবং সময়কাল নিরপেক্ষ। হিন্দু ধর্মের কর্মবাদের তত্ত্ব অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রগতির প্রতিবন্ধকস্বরূপ। হিন্দু ধর্মের সনাতন আচার-অনুষ্ঠানগুলি আধুনিক জীবনযাত্রার পরিপ্রেক্ষিতে মেনে চলা অসুবিধাজনক। সমাজের পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখে মানুষকে চলতে হয়। কিন্তু ধর্ম তার আচার-অনুষ্ঠান এবং অনুশাসনগুলি জনসাধারণের ওপর জোর করে চাপিয়ে দিতে চায়। ফলস্বরূপ স্বাভাবিকভাবেই সৃষ্টি হয় সামাজিক সমস্যার।

এই বক্তব্যও সর্বাংশে সত্য বলে বিবেচিত হয় না। সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবার (Max Weber) - এর মতে, ধর্ম সংস্কৃতি এবং বস্তুজগতের ওপর কার্যকরী প্রভাব বিস্তার করে। তিনি তাঁর 'The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism' শীর্ষক গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের মধ্যে প্রোটেস্টান্ট ধর্মের শিক্ষা পুঁজিবাদের উদ্ভব এবং বিকাশের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সহায়ক, এছাড়া, মানুষের দৈনন্দিন জীবনধারার ক্ষেত্রেও প্রোটেস্টান্ট ধর্মবিশ্বাস পরিবর্তন আনার পক্ষে যুক্তি দেয়।

পঞ্চমত, অনেকে মনে করেন যে, ধর্ম মানুষের ব্যক্তিত্বের স্বাধীন এবং স্বাভাবিক বিকাশের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। ধর্ম বিশ্বাস মানুষের স্বাধীন চেতনাকে ক্ষুণ্ণ করে, আত্মনির্ভরশীলতার পরিবর্তে প্রশ্রয় দেয় নিয়তির ওপর নির্ভরশীলতা এবং হীনমন্যতাকে। ধর্মের ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীলতা ব্যক্তির নিজস্বতা এবং সুপ্ত গুণাবলীর স্বাভাবিক বিকাশের পরিপন্থী।

এই সমালোচনাও ঠিক যথার্থ নয়। প্রকৃতপক্ষে, ধর্ম ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের সুসংহত বিকাশের ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। ধর্মবোধ সমাজবদ্ধ মানুষকে যথার্থ ব্যক্তিত্বের অধিকারী করে তোলে। সুখে-দুঃখে ধর্ম মানুষকে শান্ত রাখে এবং মনে প্রশান্তি আনে।

পরিশেষে, ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে সংযোগকারী চেতনা যেমন বর্তমান থাকে, তেমনি থাকে বিভেদমূলক শক্তিও, অনেক ক্ষেত্রে ধর্ম সাম্প্রদায়িকতার (communalism) বিষাক্ত আবহাওয়া সৃষ্টি করে। একই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ধর্মবোধ গভীর একাত্মতার সৃষ্টি করে। কিন্তু এই ধর্মবোধই আবার এইভাবে একাত্ম বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ব্যক্তিবর্গের মধ্যে জন্ম দেয় বৈরিতার মনোভাবের।

এই বক্তব্যকেও সম্পূর্ণ অর্থে মেনে নেওয়া যায় না। কারণ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্য দায়ী হ'ল ধর্মান্ধতা। এ ক্ষেত্রে ধর্মের কোনো দায়িত্ব নেই। ধর্ম মানবজাতির মধ্যে প্রেম-প্রীতির সম্পর্ক সৃষ্টি করে, বিশ্বজনীন সৌভ্রাতৃত্বের আদর্শ প্রচার করে।

সুতরাং সামগ্রিক আলোচনা থেকে এটিই স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে ধর্মের একটি বিশেষ সামাজিক ভূমিকা বর্তমান। তবে আধুনিককালে ধর্মের কর্মক্ষেত্র এবং কার্যক্রমের পরিবর্তন ঘটেছে। সামাজিক অনুশাসনের উপায় হিসাবে ধর্মের গুরুত্ব বহুলাংশে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছে। বর্তমান সমাজব্যবস্থায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে এমন অনেক প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেগুলি অনেক ক্ষেত্রে ধর্মীয় সংগঠনের পরিপূরক সামাজিক ভূমিকা পালন করে। উদাহরণ হিসাবে আমরা বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক সামাজিক সংগঠনের কথা উল্লেখ করতে পারি। স্বভাবতই এ ক্ষেত্রে ধর্মীয় সংগঠনগুলির ভূমিকা অনেকটাই হ্রাস পাচ্ছে। আবার, বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যার অভাবনীয় উন্নতির ফলে ধর্মের সামাজিক ভূমিকার গুরুত্ব এবং আধিপত্য অনেকাংশেই হীনবল হয়ে পড়ছে। তবুও এ কথা অনস্বীকার্য যে, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির ওপর সমাজের সাধারণ মানুষের বিশ্বাস এবং আস্থা অটুট রয়েছে।

৮৫.৪ সারাংশ

মানুষের দৈনন্দিন জীবনে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। ধর্মের মাধ্যমেই আমাদের জাগতিক দুঃখ-দুর্দশা, অভাব-অভিযোগ ইত্যাদি সহনীয় হয় এবং এক ধরনের আত্মবিশ্বাস গড়ে ওঠে। টয়েনবী, ডসন প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে দেখিয়েছেন যে, মানবসমাজের সাথে ধর্ম বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত। মানবজীবনের পরিপূর্ণতা বাস্তব রূপ পায় ধর্মের মাধ্যমে। ধর্মবোধ, নীতিবোধ এবং সামাজিকতার সাথে ঘনিষ্টভাবে আবদ্ধ। সমাজবিজ্ঞানী সেলবি-ও ধর্মের তাৎপর্যকে উপলব্ধি করেছেন।

মানুষের কতকগুলি বিশেষ প্রয়োজন পূরণে ধর্মের ভূমিকা অপরিসীম। সমাজজীবনে ধর্মের ইতিবাচক এবং নেতিবাচক ভূমিকা বর্তমান, যদিও এই বিভাজন আপেক্ষিক। ইতিবাচক ভূমিকাগুলির মধ্যে ধর্মের নিয়ন্ত্রণমূলক ভূমিকা, নিরাপত্তাবোধ এবং সান্ত্বনার সঞ্চার, নীতি এবং আদর্শের প্রতিষ্ঠা, ব্যবহারিক জীবনের ওপর প্রভাব, সম্প্রীতি এবং সৌভ্রাতৃত্বের সৃষ্টি, সামাজিক ঐক্য এবং সংহতির সংরক্ষণ, জনসেবায় উৎসাহিতকরণ, ললিতকলার সমৃদ্ধি সাধন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। নেতিবাচক ভূমিকার সমর্থকরা মনে করেন যে ধর্ম মানুষকে অদৃষ্টবাদী এবং কল্পনাবিলাসী করে তোলে। মার্কস ধর্মকে 'আফিঙের নেশা' বলে উল্লেখ করেছেন। অনেক সমালোচক ধর্মকে বিজ্ঞানবিরোধী, রক্ষণশীল ও প্রগতিবিরোধী, ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে প্রতিবন্ধক, সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টির মাধ্যম হিসাবে অভিহিত করেছেন। তবে ধর্মের নেতিবাচক ভূমিকা সংক্রান্ত বক্তব্যগুলিও সমালোচনার ঊর্দ্ধে নয়।

আধুনিক সমাজে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতি, ধর্মীয় সংগঠনের পরিপূরক বিভিন্ন সামাজিক জনকল্যাণমূলক সংগঠনের উদ্ভবের ফলে ধর্মের আধিপত্য অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। তবুও, সাধারণ মানুষ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতি অতি মাত্রায় আস্থাশীল।

৮৫.৫ অনুশীলনী

১) নীচের বক্তব্যগুলি ঠিক্ না ভুল তা নির্দিষ্ট স্থানে '✓' চিহ্ন দিয়ে দেখান ঃ

		ঠিক	ভুল
ক)	ব্যক্তির আচারব্যবহার নিয়ন্ত্রণের পিছনে ধর্মের কোনো ভূমিকা নেই।	☐	☐
খ)	ডুর্কহেইমের মতে, ধর্ম সমষ্টিবোধকে পুনর্বলবৎ করে।	☐	☐
গ)	সামাজিক নীতি এবং আদর্শ প্রতিষ্ঠায় ধর্ম কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে।	☐	☐
ঘ)	ওয়েবারের মতে, মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে ধর্ম কোনোরকম প্রভাব ফেলে না।	☐	☐
ঙ)	এম. এন. শ্রীনিবাস টোটেমবাদ (Totemism) প্রসঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসী আরুণতাসদের উল্লেখ করেছেন।	☐	☐
চ)	প্রবিত্র (sacred) এবং অপবিত্র (profane) -এর ধারণা দেন ডুর্কহেইম।	☐	☐
ছ)	ম্যালিনাউস্কির মতে, ধর্ম সামাজিক ঐক্য এবং সংহতি রক্ষা করে।	☐	☐
জ)	ধর্ম আফিঙের নেশার মতো — এই বক্তব্য রেখেছেন কিংসলে ডেভিস।	☐	☐
ঝ)	'The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism' — নামক বইটির লেখক হলেন র‍্যাড্‌ক্লিফ্ ব্রাউন ।	☐	☐
ঞ)	এমিল ডুর্কহেইম তাঁর 'The Elementary Forms of Religious Life' — শীর্ষক গ্রন্থে ধর্মের সমাজতাত্ত্বিক দিকটি ব্যাখ্যা করেছেন।	☐	☐

২) নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ

ক) সামাজিক নিয়ন্ত্রণে ধর্মের ভূমিকা প্রসঙ্গে কোঁতের বক্তব্যটি কী ছিল?

খ) মানুষের ব্যবহারিক জীবনে ধর্মের প্রভাব সম্পর্কে ম্যাক্স ওয়েবারের অভিমত কী ছিল?

গ) সামাজিক ঐক্য এবং সংহতি স্থাপনের ক্ষেত্রে ধর্মের ভূমিকাকে ডুর্কহেইম কীভাবে দেখিয়েছেন?

৩) নীচের প্রশ্নগুলির বিশদ উত্তর দিন ঃ

ক) ধর্মের ইতিবাচক ভূমিকাগুলির বিচার-বিশ্লেষণ করুন।

খ) ধর্মের নেতিবাচক ভূমিকাগুলিকে সমালোচনাসহ আলোচনা করুন।

গ) ধর্মের সামাজিক ভূমিকা আলোচনা করুন। আপনি কি মনে করেন আধুনিক সমাজে ধর্ম অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ছে?

৮৫.৬ উত্তর সংকেত

১) ক) ভুল; খ) ঠিক; গ) ঠিক; ঘ) ভুল; ঙ) ভুল;
চ) ঠিক; ছ) ঠিক; জ) ভুল; ঝ) ভুল; ঞ) ঠিক।

৮৫.৭ গ্রন্থপঞ্জী

১) বটোমোর টম ঃ সমাজবিদ্যা - তত্ত্ব ও সমস্যার রূপরেখা (অনুবাদ - হিমাচল চক্রবর্ত্তী); কে. পি. বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী; কলকাতা; ১৯৯৫

২) Haralambos Michael with Heald Robin : Sociology - Themes and Perspectives: Delhi: OUP; 1995.

৩) কর পরিমলভূষণ ঃ সমাজতত্ত্ব; পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ; কলকাতা; ১৯৮২

৪) ঘোষ দস্তিদার মৃণালকান্তি ঃ সমাজবিজ্ঞান, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ; কলকাতা; ১৯৮২

৫) ডঃ মহাপাত্র অনাদিকুমার ঃ বিষয় সমাজতত্ত্ব; ইন্ডিয়ান বুক কনসার্ন, কলকাতা; ১৯৯৬

একক ৮৬ □ সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে ধর্ম সম্পর্কে মার্ক্সের ব্যাখ্যা

গঠন

৮৬.১ উদ্দেশ্য
৮৬.২ প্রস্তাবনা
৮৬.৩ ধর্ম সম্পর্কে মার্ক্সের ব্যাখ্যা
৮৬.৪ মার্ক্সের বক্তব্যের সমালোচনা
৮৬.৫ মূল্যায়ন
৮৬.৬ সারাংশ
৮৬.৭ অনুশীলনী
৮৬.৮ উত্তরমালা
৮৬.৯ গ্রন্থপঞ্জী

৮৬.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করবেন এবং এই বিষয় সমূহ সম্পর্কিত সমাজতাত্ত্বিক গবেষণাকার্যে আপনার ধারণার যথার্থ প্রতিফলন ঘটাতে সমর্থ হবেন ঃ

- ধর্ম সম্পর্কে মার্ক্সীয় বিচার-বিশ্লেষণ
- মার্ক্সীয় বক্তব্যের বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে সমালোচনা
- মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গীর সার্বিক মূল্যায়ন

৮৬.২ প্রস্তাবনা

যেসব দার্শনিক তাত্ত্বিক আলোচনার দ্বারা মানুষের চিন্তা এবং কর্মজগতে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছেন, কার্ল মার্ক্স (১৮১৮ - ১৮৮৩) তাঁদের মধ্যে অন্যতম। সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে মার্কস এক ভিন্ন ঐতিহ্যের স্রষ্টা। কোঁত, স্পেনসার, ডুর্কহেইম, ওয়েবার প্রমুখ মনীষী সমাজতত্ত্ব চর্চার যে ধারার সৃষ্টি করেছেন, মার্ক্সের সমাজতত্ত্ব চর্চা তার থেকে অনেকটাই স্বতন্ত্র। তাঁর আলোচনার উদ্দেশ্য ছিল শোষণ এবং বৈষম্যভিত্তিক সমাজব্যবস্থার অবসান ঘটানো। মার্ক্সীয় তত্ত্ব বর্তমান শতাব্দীতে সামাজিক এবং রাজনৈতিক চিন্তাজগতে এক অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। বিভিন্ন দেশে মার্ক্সীয় তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে নতুন আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে।

আবার মার্ক্সের মত বিতর্কমূলক দার্শনিকও বিরল। কিছু কিছু সমালোচক তাঁর মতবাদকে কঠোর ভাষায় নিন্দা করেন এবং সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করার প্রস্তাব দেন। ধর্ম সম্পর্কে মার্কসের তত্ত্ব হল এমনই একটি বিতর্কধর্মী তত্ত্ব।

পূর্ববর্তী এককে ধর্মের সামাজিক ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে মার্ক্সের বক্তব্য সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে। বর্তমান এককে ধর্ম সম্পর্কে মার্কসের বক্তব্য এবং তাঁর সমালোচনাকে বিশদ্‌ভাবে আলোচনা করা হবে।

৮৬.৩ ধর্ম সম্পর্কে মার্ক্সের ব্যাখ্যা

মার্কসের বিতর্কিত অথচ সাহসী পদক্ষেপের মধ্যে ধর্ম সম্বন্ধীয় পর্যালোচনা অন্যতম। তিনি কোনোভাবেই ধর্মকে সমাজের নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয় হিসাবে মনে করতে পারেন নি। তাই ধর্ম সম্পর্কে বহু বিতর্কিত মতামত তিনি সদর্পে রাখতে পেরেছিলেন। প্রসঙ্গত, হ্যারালম্বসের (M. Haralambos) এর মতে, ধর্ম হল এমন একটি মায়াবি বিভ্রম যার থেকে শোষণ এবং অত্যাচারের জন্ম হয়।

বিশিষ্ট সমাজতত্ত্ববিদ ডঃ অনাদিকুমার মহাপাত্রের অভিমত অনুসারে, কার্ল মার্ক্স ধর্মের তীব্র সমালোচনা করেছেন এবং বলেছেন যে, ধর্মের কোনো ব্যবহারিক মূল্য নেই। ধর্মের কোনো নিজস্ব ক্রিয়া নেই। ভয় থেকেই ভগবানের সৃষ্টি হয়েছে। শোষিত এবং নিষ্পেষিত মানুষকে ধর্ম নিস্তেজ এবং হীনবল করে দেয়। সম্পত্তিবান শ্রেণীর অমানবিক শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বা প্রতিকারের স্বার্থে সম্পত্তিহীন শ্রেণীর সুদৃঢ় মনোবল এবং আত্মবিশ্বাস থাকা আবশ্যক। ধর্মবিশ্বাস বিত্তহীন মানবগোষ্ঠীর এই মনোবল এবং আত্মবিশ্বাসকে অবদমিত করে। মার্কসের মতে, ধর্ম হল স্বার্থান্বেষী শোষক শ্রেণীর হাতে ন্যস্ত একটি বিশেষ হাতিয়ার। এই হাতিয়ারের সাহায্যে সমাজের সাধারণ মানুষকে আফিঙের নেশার মতো মোহাচ্ছন্ন এবং অবশ করে রাখা হয়। সমাজের দরিদ্র এবং দুর্বল মানবগোষ্ঠীকে ধর্মভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত করে রাখা হয় এবং সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সার্বভৌম কর্তৃত্ব কল্পনা করতে কার্যত বাধ্য করা হয়।

মার্ক্সের ভাষায় ধর্ম হ'ল অবাস্তবোচিত একটি সামাজিক দিক যার মধ্য দিয়ে নেতৃত্বকারী শ্রেণীর আদর্শ এবং ভুয়ো শ্রেণী সচেতনতা জাগরিত হয়। তাই মার্ক্স বলেন যে, ধর্ম হ'ল অত্যাচারিতদের দুঃখ প্রকাশের মাধ্যম, হৃদয়হীন বিশ্বের আবেগ এবং আত্মাহীন আত্মা। ধর্ম মানবজগতের আফিঙ বিশেষ। ('Religion is the sigh of the oppressed creature, the sentiment of a heartless world and the soul of soulless conditions. It is the opium of the people.')। তাই মার্ক্স মনে করেন যে, ধর্ম সমাজে আফিঙের মাদকতা ছড়ায় এবং ধর্মীয় অত্যাচারের মধ্যে দিয়ে জনসাধারণের মস্তিষ্ককে দুর্বল করে। তাঁর মতে, ধর্মীয় ভন্ডামির মধ্যে দিয়ে সমগ্র সমাজ ভিন্নপথে চালিত হতে পারে। মার্ক্স দেখেছেন যে, অধিকাংশ ধর্মীয় আন্দোলনগুলি অত্যাচারিত শ্রেণীগুলির মধ্যে থেকেই গড়ে উঠেছে। তাদের সামাজিক অবস্থা নতুন নতুন ধর্মের উৎপত্তির পিছনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে। তাই এঙ্গেলস্ বলেছিলেন যে, খ্রীষ্টধর্মীয় ধ্যান-ধারণা বাস্তবে অত্যাচারিত মানুষের আন্দোলনেরই ফলশ্রুতি। প্রথমে এটি দাস শ্রেণীভুক্তদের ধর্ম হিসাবে গড়ে ওঠে যারা সমাজের সকল প্রকার অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল।

সমাজতত্ত্ববিদ হ্যারালম্বসের মতে, ধর্ম শোষণের যন্ত্রণা নানাভাবে প্রশমিত করে থাকে। প্রথমত, ধর্ম মৃত্যুর পর জীবনে চিরন্তন স্বর্গীয় সুখ প্রাপ্তির প্রতিশ্রুতি দেয়। এঙ্গেলসের মতে, খ্রীষ্টধর্ম সমাজের শোষিত, নিপীড়িত, নির্যাতিত শ্রেণীগুলিকে মৃত্যু পরবর্তী জীবনে ইহজগতের দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্তির স্বপ্ন দেখায়। এরই ফলশ্রুতি হিসাবে মানুষ পার্থিব জীবনের সমস্ত দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে মৃত্যু পরবর্তী জীবনে স্থায়ী সুখভোগের আশায়। দ্বিতীয়ত, কোনো কোনো ধর্ম মনে করে যে, মানুষ যদি পার্থিব জীবনে শোষণ, বঞ্চনা, দুঃখ-দারিদ্র ইত্যাদিকে অত্যন্ত নম্রতার সাথে গ্রহণ করে তাহলে পরজীবনে সে তার জন্য পুরস্কৃত হবে। বাইবেলের একটি বিখ্যাত উক্তি হল যে, একটি উটের একটি সূচের ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে যাওয়া সহজ, কিন্তু একজন ধনী ব্যক্তির পক্ষে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করা অত সহজ নয় ('It is easier for a camel to pass through the eye of a needle, than for a rich man to enter the kingdom of Heaven.')। এইভাবে ধর্ম শোষণ, অত্যাচার এবং দারিদ্রকে পুরস্কার প্রদানের প্রতিশ্রুতি এবং অন্যায় অবিচারের পরজীবনে প্রতিবিধানের অঙ্গীকারের মাধ্যমে এগুলিকে মানুষের কাছে সহনীয় করে তোলে। তৃতীয়ত, ধর্ম বলে পৃথিবীতে যে সমস্ত সমস্যা রয়েছে সেগুলির সমাধান একমাত্র অতিপ্রাকৃত শক্তিরই করা সম্ভব। তাই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সদস্যরা আশা করে যে, কোনো এক সময় এই অতিপ্রাকৃত শক্তি এসে তাদের যাবতীয় সমস্যার সমাধান করে পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করবে। চতুর্থত, ধর্ম সামাজিক বিন্যাস (social order) এবং ঐ বিন্যাস-কাঠামোয় মানুষের অবস্থিতিকে যথার্থ বলে প্রতিপন্ন করে। সমাজকাঠামোর সৃষ্টিকর্তা হলেন ঈশ্বর। ফলে সামাজিক স্তরবিন্যাসে যারা নীচু শ্রেণীতে রয়েছে তারা তাদের এই অবস্থার সাথে মানিয়ে নিতে বাধ্য হয় কারণ ঈশ্বর সৃষ্ট সমাজকাঠামো অপরিবর্তনীয়। দারিদ্র এবং দুর্ভাগ্যকে অপরাধের জন্য ঈশ্বরকর্তৃক প্রদত্ত শাস্তি বলে মনে করা হয়। মানুষকে আধ্যাত্মিক দিক থেকে পার্থিব জীবনের যাবতীয় দুঃখ-দুর্দশাকে সহ্য করার ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়।

মার্ক্সের মতে, ধর্ম একটি অলীক সূর্য। এই সূর্য মানুষের চারদিকে পরিক্রমা করে ততদিন পর্যন্ত যতদিন তার নিজের চারদিকে মানুষ আবর্তিত না হয় ('Religion is the only illusory sun which revolves round man as long as he does revolve round himself')। তিনি মনে করেন যে, ধর্ম মানুষের এক কল্পনা মাত্র। সমাজের নিপীড়িত এবং অত্যাচারিত মানুষ ধর্মের মাধ্যমে করুণভাবে আবেদন-নিবেদন করে। ধর্মীয় চেতনা মানুষের দাস - মনোভাবের পরিচায়ক। মানুষের যথার্থ সুখের জন্য অলীক ধর্মের অবসান একান্তভাবে প্রয়োজন। অলীক কোনো শক্তির কাছে অকারণ আত্মসমর্পণ অর্থহীন। মানুষকে তার নিজের ভাগ্য নিজেকেই ঠিক করে নিতে হবে। নিজের বিচার বুদ্ধি এবং আত্মবিশ্বাসের জোরে মানুষকে এগিয়ে যেতে হবে। মার্কসীয় দর্শন অনুযায়ী সমাজব্যবস্থার মূল কাঠামোর (base) ওপর যে উপরিকাঠামো (superstructure) গড়ে ওঠে, ধর্ম হল সেই উপরিকাঠামোর অংশমাত্র। সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি বা মূল কাঠামোর পরিবর্তন ঘটলে স্বাভাবিক নিয়মে ধর্মেরও পরিবর্তন ঘটে। মার্ক্সবাদীদের মতে, প্রাকৃতিক আস্থা থেকে সৃষ্ট ভয়-ভাবনা এবং উৎকণ্ঠা দূর হলে ধর্মেরও ধীরে ধীরে অবসান ঘটবে। বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যা প্রসঙ্গে মানুষের জ্ঞান এবং আস্থা যত বৃদ্ধি পেতে থাকবে, ধর্মের ব্যবহারিক উপযোগিতা সম্পর্কে মানুষের মনে ততই অনাস্থা দেখা দেবে।

ডঃ মহাপাত্রের অভিমত অনুসারে, মার্ক্সীয় দর্শন অনুযায়ী ধর্ম এবং ঈশ্বরবিশ্বাস হল অলীক, অবান্তর এবং অযৌক্তিক। মার্কসবাদ অনুসারে জড়েরই একমাত্র সত্তা রয়েছে, এই কারণে মার্কসীয় তত্ত্বে জড়বাদের ভিত্তিতে

সমাজের যাবতীয় বিষয়কে অর্থনৈতিক উপাদানের মাধ্যমে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়। মার্কসবাদ অনুসারে অতীন্দ্রিয় কোনো সত্তার অস্তিত্ব কাল্পনিক। এই তত্ত্বে আত্মা-পরমাত্মা অস্তিত্বও স্বীকার করা হয় না। মার্কসবাদীরা কেবলমাত্র বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকেই পৃথিবীর স্বরূপ পর্যালোচনা করার পক্ষপাতী। দ্বন্দ্ববাদের (dialectics) সাহায্যে মার্কসীয় তত্ত্বে মানবসমাজের সুষ্ঠু এবং সঠিক ব্যাখ্যার চেষ্টা করা হয়।

ডঃ মহাপাত্রের মতে, মার্ক্সীয় দর্শনে বলা হয় যে ধর্মের বিরোধিতা করার অর্থ হল মিথ্যা এবং প্রবঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা। মানুষের মোহমুক্তির স্বার্থে ধর্মের সমালোচনা প্রয়োজনীয়। ধর্ম শোষণের এক অভিনব হাতিয়ার। এই হাতিয়ার স্বার্থান্ধ মানুষেরই সৃষ্টি, ধর্ম সত্যকে বিকৃত করে এবং মানুষের মনে ভ্রান্ত মূল্যবোধের সৃষ্টি করে। দারিদ্র্যকে ধর্ম মহৎ এবং মহান রূপ দান করে থাকে। বিশ্বজগত সম্পর্কে ধর্ম মানুষের মনে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করে। ধর্মীয় চেতনা মূলত সত্য অথবা বৈজ্ঞানিক চেতনার বিপরীত চেতনা। ধর্মীয় চেতনাকে বিপরীত জগৎ-চেতনার নামান্তর হিসাবে দেখা হয়। এই বিশ্বজগত সম্পর্কে সঠিক ধারণার পরিবর্তে ধর্মীয় চেতনা এবং বিধিবিধান বিপরীত চেতনার (reversed world consciousness) সৃষ্টি করে থাকে।

মার্ক্সের মতে, মেহনতী মানুষের মধ্যে অদৃষ্টবাদকে প্রসারিত করার ক্ষেত্রে ধর্মের দায়িত্ব অপরিসীম। শ্রমজীবী জনগণ যাবতীয় দুঃখ-কষ্টকে নিজেদের নিয়তি বা অদৃষ্ট হিসাবে মেনে নেয়। তারা ভাগ্যের কাছে কার্যত আত্মসমর্পণ করে। তাদের অবিরাম পরিশ্রমের ফলে সম্পত্তিবান শ্রেণীর স্বার্থ সাধিত হয় এবং শ্রমজীবী জনগণ বিনা প্রতিবাদে দারিদ্র্যের জ্বালা সহ্য করতে থাকে। দুঃখ-কষ্টের যথার্থ কারণ অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা থেকে তারা বিরত থাকে। বস্তুত, শ্রমজীবী সম্প্রদায় ধর্মের আধ্যাত্মিক মাদকতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অত্যাচার এবং নিপীড়নের ফলে মানুষ দরিদ্র এবং দুর্বল হয়ে পড়ে। মার্কসবাদীদের মতানুযায়ী আধুনিককালের পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় ধর্মবোধ এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে সমাজের মেহনতী মানুষের ওপর শাসন-শোষণ বজায় রাখতে এবং স্বার্থান্বেষী পুঁজিপতি শ্রেণীর কায়েমী স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

মার্ক্স মনে করেন যে, ধর্ম সাধারণ অর্থে অত্যাচারী সম্প্রদায়কে যান্ত্রিক উপায়ে নিয়ন্ত্রণের কাজে নিয়োজিত থাকে, প্রচলিত শোষণ রীতিকে বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করে এবং শ্রেণীগত অবস্থানের অস্তিত্বে মদত যোগায়। সাধারণ অর্থে, ধর্ম মানুষকে নিজ নিজ স্থানে অবস্থান করতে সাহায্য করে। সমাজের প্রচলিত প্রথাসমূহকে গুরুত্ব দিতে এক শ্রেণীর মানুষ ধর্মের দোহাই দেয়; আবার আশাহতদের কৃত্রিম আশার স্বপ্ন দেখায়। তাই ধর্ম কখনই প্রচলিত প্রথাকে ভেঙে দেওয়ার সমর্থন করে না। এটিই ধর্মের চরম দুর্বলতা। কেননা ধর্মীয় চিন্তা-ভাবনায় বাস্তবতার স্থান নেই। সুতরাং, ধর্ম সর্বদাই মানুষের মধ্যে ভ্রান্ত শ্রেণীচেতনা এবং অন্ধ সমর্থক গড়ে তুলতে সাহায্য করে। ধর্মীয় মতামতে বিশ্বাসীরা সর্বদাই তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে ধর্মের দোহাই দেয়।

অনেক ক্ষেত্রে ধর্ম নেতৃত্বকারী শ্রেণীকে সরাসরি সমর্থন করে। কেননা তারাই ধর্মের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। মার্ক্সের এই যুক্তির সমর্থন ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে খুব সহজেই আমাদের চোখে পড়ে। কৃষ্ণাঙ্গ মার্কিন খ্রীষ্টানরা সর্বদাই শ্বেতাঙ্গদের নেতৃত্বকে মেনে নিতে বাধ্য ছিল। পরবর্তীকালে মার্টিন লুথার কিং (Martin Luther King) সহ বহু ব্যক্তিই কৃষ্ণাঙ্গদের সমর্থনে সংগ্রাম করেন। মধ্যযুগীয় ইউরোপে রাজা ঐশ্বরিক ক্ষমতাবলে রাজত্ব করতেন বলে একটি ধারণা প্রচলিত ছিল। ফ্যাসিবাদী হিটলার এবং মুসোলিনী এক সময় চার্চগুলিতে বা গীর্জাগুলিতে কর্তৃত্ব রাখতেন। ইংল্যান্ডের শিল্পমালিকরা এক সময় শ্রমিকদের ভদ্র আচরণ এবং কর্মের ক্ষেত্রে নিয়মানুবর্তিতার

জন্য ধর্মের কথা বলতেন, সমাজতত্ত্ববিদ্ হ্যারালম্বসের মতে, ব্রাজিলের বড় বড় শহরগুলির চারপাশে বিভিন্ন বস্তি অঞ্চলে ধর্ম হিসাবে ঈস্টারের সাত সপ্তাহ পরবর্তী খ্রীষ্টীয় পর্ব (Pentecostalism) অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। শাসনকার্যে নিযুক্ত মন্ত্রীরা ব্রাজিলের দারিদ্র্যপীড়িত জনসাধারণকে বলেছিলেন যে, তাদের দারিদ্র্যের জন্য তাদের পাপাচারই দায়ী। কিন্তু কিছু রোমান ক্যাথলিক পুরোহিতবর্গ এই ধারণার প্রতিবাদ করে বলেছিলেন যে জনসাধারণের দারিদ্র্যের জন্য তাদের পাপাচার দায়ী নয়, দায়ী সরকার। প্রাচীন ভারতীয় সমাজে জাতিভেদ ব্যবস্থাও হিন্দু ধর্মীয় ব্যবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

মার্ক্স অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলেছেন যে, মানুষ ধর্ম গড়ে তোলে, ধর্ম মানুষকে গড়ে তোলে না। তিনি আরও বলেছেন যে, ধর্ম সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর একটি চরমতম উৎপাদন, ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে এর কোনো উপযোগিতা নেই। সামাজিক ধারাবাহিকতার ক্ষেত্রেও ধর্মের কোনো ভূমিকা থাকার কথা নয়। তাই তিনি বলেন যে, ধর্মীয় চিন্তাভাবনা থেকে মুক্ত হয়ে বাস্তবের ওপর ভরসা রেখে মানুষ যদি মানবতাবাদে বিশ্বাসী হয়, তবেই সে সুখী হবে। তিনি একথাও বিশ্বাস করতেন যে ভবিষ্যতের দর্শন ধর্মকে একদা সমাজ ছাড়া করবেই।

মার্ক্সীয় দর্শন অনুসারে শ্রেণী-শোষণের উদ্দেশ্যেই ধর্মকে ব্যবহার করা হয়। সুতরাং, শ্রেণী-শোষণের অবসান ঘটলে ধর্মেরও অবসান হবে। মুষ্টিমেয় শোষক শ্রেণী উৎপাদনের উপাদানগুলির উপর মালিকানা বজায় রাখে এবং সর্বহারা শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের উপর শাসন-শোষণ বলবৎ রাখে। সমাজব্যবস্থায় এ ঘটনা যতদিন অব্যাহত থাকবে ধর্মের অস্তিত্বও ততদিন অব্যাহত থাকবে। এই কারণে বলা হয় যে, পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা যতদিন বজায় থাকবে, ততদিন শ্রেণী-বৈষম্য, শ্রেণী-শোষণ এবং ধর্মও সমাজ ব্যবস্থায় অস্তিত্বশীল থাকবে। মার্কসীয় দর্শন অনুসারে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় ধর্ম অথবা ধর্মীয় সম্প্রদায় থাকবে না। শ্রমজীবী সম্প্রদায় সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় যথার্থ স্বাধীনতার স্বাদ পাবে। এই অবস্থায় তারা ধর্মের আধ্যাত্মিক মোহে আচ্ছন্ন ভাব কাটিয়ে উঠবে। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় মুষ্টিমেয় পুঁজিপতি শোষক শ্রেণীর সাথে অগণিত শোষিত সর্বহারা জনতার সংগ্রাম চলতে থাকে। এই দীর্ঘমেয়াদী সংগ্রামের শেষে শোষিত-নিষ্পীড়িত শ্রমজীবী জনগণের জয় অবশ্যম্ভাবী। এই অবস্থায় উৎপাদনের উপাদানসমূহের ওপর সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে। সমাজ হবে শোষণমুক্ত। এইভাবে সমাজব্যবস্থা থেকে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অবসান ঘটবে এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে সমাজজীবন থেকে ধর্মেরও ধীরে ধীরে অবসান হবে।

৮৬.৪ মার্ক্সের বক্তব্যের সমালোচনা

ধর্ম সম্পর্কিত মার্ক্সীয় ব্যাখ্যা কিন্তু সমালোচনার উর্দ্ধে উঠতে পারে নি। সমালোচকরা বিভিন্ন দিক থেকে মার্ক্সীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের বিরূপ সমালোচনা করেন। ধর্মের নামে বিভিন্ন কুসংস্কারমূলক ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সমাজজীবনে অস্তিত্বশীল। সমাজজীবনে এই সমস্ত আচার-অনুষ্ঠানের অভিশাপ অনস্বীকার্য। মানবসভ্যতার ইতিহাস যদি আমরা পর্যালোচনা করি, তাহলে দেখা যায় যে প্রশাসনিক ক্ষমতা এবং কর্তৃত্বের প্রশ্নে রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনাও প্রচুর। আবার মানবসভ্যতার ইতিহাসে ধর্মের দোহাই দিয়ে শাসন-শোষণ এবং অত্যাচারের ঘটনাও অসংখ্য। এ সব সত্ত্বেও ধর্ম সম্পর্কে মার্ক্সীয় বক্তব্য বিশেষভাবে বিতর্কিত। ধর্ম সম্পর্কে মার্ক্সের ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে যেসব যুক্তির অবতারণা করা হয় ডঃ মহাপাত্র সেগুলি অতি সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করেছেন। আসুন, এখন আমরা সেগুলি নিয়ে আলোচনা করি।

প্রথমত, ধর্মের উৎপত্তির ব্যাখ্যা হিসাবে মার্ক্সীয় ধারণা স্বীকার করা যায় না। মার্কসের মতে, ভয় থেকেই ভগবান এবং ধর্মের সৃষ্টি হয়েছে। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার উদ্ভব এবং শাসক ও শোষিত শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্যের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজজীবনে ধর্মবোধের সৃষ্টি হয়েছে। মার্কস্‌বাদের এই যুক্তি যথার্থ নয় বলে সমালোচকরা মনে করেন। কারণ ধর্মের ইতিহাস মানবসভ্যতার ইতিহাসের সমসাময়িক। ঈশ্বর-সম্পর্কিত অনুভূতি, আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ইত্যাদি হল মানব প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান। মার্ক্সবাদে এই সমস্ত উপাদানকে অস্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু মানুষের ধর্মবিশ্বাস এবং ধর্মবোধের ভিত্তি হিসাবে মানুষের মনোজগতের এই সমস্ত বিষয় বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

দ্বিতীয়ত, মার্ক্স ধর্মের অর্থ ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে মূলত জড়বাদী দর্শনের সাহায্য নিয়েছেন। কিন্তু সমালোচকরা জড়বাদী দর্শন ভ্রান্ত বলে মনে করেন। কারণ, এই দর্শন সত্যের সন্ধান দিতে পারে না। স্বভাবতই এই ভ্রান্ত দর্শনের উপর নির্ভরশীল ধর্ম সম্পর্কিত মার্কসীয় ধারণাও ভ্রান্ত। জড়বাদী দর্শন অনুসারে এই জগতে চরম সত্তা হল জড় (matter) । একমাত্র জড়েরই সত্তা আছে। এই পৃথিবীর বাকী সব কিছুতেই জড়েরই প্রকাশ। জগতের সব কিছুই নির্দ্ধারিত এবং নিয়ন্ত্রিত হয় অর্থনৈতিক উপাদানের দ্বারা। মার্ক্সীয় তত্ত্বে জড়বাদের মাধ্যমে সমাজের যাবতীয় বিষয়কে জড় উপাদানের সাহায্যে বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়। কিন্তু পৃথিবীর সব কিছু এবং বিশেষত সমাজবদ্ধ মানুষের মানসিক প্রকৃতি সম্পর্কে জড়বাদী দর্শনের ধারণা মেনে নেওয়া যায় না।

তৃতীয়ত, মার্ক্সবাদ অনুসারে ধর্মীয় চেতনার অস্তিত্ব সমাজের কেবলমাত্র শোষিত সর্বহারা শ্রেণীর মধ্যেই দেখা যায়। মার্ক্সবাদের এই বক্তব্যকে যথার্থ বলে মনে করেন না সমালোচকরা। সম্পত্তিবান - সম্পত্তিহীন নির্বিশেষে সমাজের অধিকাংশ মানুষ নিজ নিজ বিশ্বাস এবং অনুভূতি অনুযায়ী ধর্মপালন করে। অথচ মার্ক্সবাদীদের মতানুসারে শ্রেণী-বৈষম্যমূলক পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় সম্পত্তিবান শ্রেণী শ্রমজীবী সর্বহারা সম্প্রদায়কে শোষণ করে এবং এই শোষণের হাতিয়ার হিসাবে ধর্মকে ব্যবহার করে। বাস্তব জীবনের যাবতীয় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য থেকে বঞ্চিত এবং দুঃখ-দারিদ্র্যে দুর্দশাগ্রস্ত শ্রমজীবী সাধারণ মানুষ ধর্মের মাধ্যমে সান্ত্বনা এবং শান্তি লাভ করে। সুতরাং, শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যেই শুধু ধর্মবোধ বর্তমান থাকে। মার্ক্সীয় দর্শনের এই তত্ত্ব সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বলে মনে করা হয়। বস্তুত, সম্পত্তিবান মানুষের মধ্যেও ধর্মবোধ বর্তমান থাকে। কারণ, ধর্ম মানুষের চিন্তা-চেতনা এবং আচার-আচরণকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে থাকে।

চতুর্থত, মার্ক্সীয় দর্শনে ধর্মকে শাসন-শোষণের হাতিয়ার হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু যথার্থ ধর্মের মধ্যে শোষণ-পীড়নের কোনো উপাদান থাকে না। দয়া-মায়া-মমতা, প্রেম-প্রীতি -ভালবাসা ইত্যাদি সদ্‌গুণের অভিব্যক্তি হল ধর্ম। ধর্ম বলতে সত্য এবং সুন্দরের প্রতি অনুরাগকে বোঝায়। ধর্মীয় চেতনা, ঈশ্বরবিশ্বাস এবং ভক্তি মানুষের হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটায়। তাই ধর্ম পাপাচার বা পীড়ণমূলক আচরণের কারণ হতে পারে না। কিন্তু মার্ক্সবাদীদের কাছে ধর্ম হল কৃত্রিম আচার-অনুষ্ঠান সর্বস্ব একটি বাহ্যিক বিষয়। ধর্ম তাঁদের কাছে অলীক কল্পনা মাত্র। এ কথা অনস্বীকার্য যে সমাজে ধর্মের নামে কিছু কুসংস্কারমূলক আচার-অনুষ্ঠান প্রচলিত থাকতে দেখা যায়। এগুলিকে ধর্ম হিসাবে গণ্য করা যায় না। সমাজজীবনে প্রচলিত এই সমস্ত কুসংস্কারের মধ্যে স্বার্থান্বেষী মানুষের হীন উদ্দেশ্য থাকতে পারে, কিন্তু তার জন্য ধর্মকে দায়ী করা যায় না।

পঞ্চমত, মার্ক্সবাদে ধর্মকে আফিম হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে। মার্ক্সবাদীদের মতানুযায়ী, ধর্মের একটি আধ্যাত্মিক মাদকতা আছে। এই মাদকতার প্রভাব মানুষকে দুর্বল করে তোলে। ধর্মের মোহে আচ্ছন্ন মানুষ অন্যায়-

অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। ধর্ম সম্পর্কিত মার্ক্সীয় ব্যাখ্যা সমালোচনার উর্দ্ধে উঠতে পারে নি। প্রকৃত ধর্মবোধ মানুষের যাবতীয় দুর্বলতা দূর করে এবং মানুষের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং আশার সঞ্চার করে। ধর্মীয় চেতনা সত্যের জন্য সংগ্রাম করতে মানুষকে উৎসাহিত করে। ধর্মবোধে উদ্বুদ্ধ এবং অনুপ্রাণিত ব্যক্তিদের জনকল্যাণ সাধনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়। ভারতীয় দার্শনিক অধ্যাপক ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ (Dr. S. Radhakrishnan) - এর মতে, ধর্মবোধ মানুষের মধ্যে চারিত্রিক দৃঢ়তার সৃষ্টি করে এবং নৈতিক শক্তি সঞ্চারিত করে। ধর্মীয় চেতনা মানুষকে সংকীর্ণতা এবং লোভলালসা জয় করতে এবং এক উন্নত মহান জীবনে উন্নীত হতে সাহায্য করে ('Religion is a dynamic process, a renewed effort of the creative impulse working through exceptional individuals and seeking to uplift mankind to a new level.') ।

ষষ্ঠত, মার্ক্সবাদীদের মতে, ধর্মীয় চেতনা বৈজ্ঞানিক চেতনার বিপরীত। মানুষের মনে ধর্ম এক অলীক এবং অবাস্তব জগতের চেতনা সৃষ্টি করে। মার্কসীয় দর্শন অনুসারে ধর্মীয় চেতনা এই বিশ্ব সংসার সম্পর্কে মানুষের মনে এক বিপরীত চেতনা বা ধারণা (a reversed world consciousness)-এর সৃষ্টি করে। সমালোচকদের মতে, ধর্মীয় চেতনার মাধ্যমে মানুষ তার যথার্থ মূল্য এবং মর্যাদা উপলব্ধি করতে পারে। ধর্মবোধই মানুষকে সচেতন করে তোলে। ধর্মীয় চেতনা নিহিত থাকে মানুষের অন্তর অথবা মনোজগতের মধ্যেই। বাইরে থেকে মানুষের ওপর ধর্মবোধ চাপিয়ে দেওয়া যায় না। তাই ধর্ম সম্পর্কে মার্কসীয় বক্তব্যকে গ্রহণ করা যায় না।

সপ্তমত, মার্ক্সবাদে ভিত্তি এবং উপরিকাঠামোর (base and superstructure) তত্ত্বের মাধ্যমেও ধর্মের ধারণা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সমাজের মূল কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে একটি উপরি-কাঠামো বা বহিকাঠামো। মার্ক্সবাদীদের মতে, ধর্ম হলো এই উপরি কাঠামোর অন্যতম অংশবিশেষ। ধর্মের নিজস্ব কোনো ব্যবহারিক মূল্য নেই। সমাজের মূল কাঠামোর পরিবর্তন ঘটলে তার সঙ্গে সংগতি বজায় রেখে ধর্মেরও পরিবর্তন ঘটে। ধর্ম প্রসঙ্গে এই মার্ক্সীয় বক্তব্যও বিরোধ-বিতর্কের উর্দ্ধে নয়। জার্মান দার্শনিক ম্যাক্স ওয়েবার (Max Weber) মার্ক্সের এই মতবাদের বিরোধিতা করেছেন। ওয়েবারের মতে, ধর্মীয় অনুশাসন এবং নীতিকথার সাথে সমাজবদ্ধ মানুষের বিশ্বাস ও ব্যবহারিক শিক্ষা সম্পর্কযুক্ত। স্বভাবতই, মানুষের বাস্তব জীবন ধর্মবোধের দ্বারা প্রভাবিত এবং নিয়ন্ত্রিত হয়। তাঁর মতে প্রোটেস্টান্ট ধর্মের শিক্ষা পুঁজিবাদের জন্ম দেয়। অন্যদিকে বৌদ্ধ ধর্মের শিক্ষায় বৈরাগ্যের কথা বলা হয়। খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের মধ্যে প্রোটেস্টান্ট সম্প্রদায়ের বিশেষত ক্যালভিনের অনুগামী জনগোষ্ঠীর বিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গী এবং আচার - আচরণের ব্যবহারিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য বর্তমান। পার্থিব বিষয়-সম্পত্তি এবং পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ওপর এর কার্যকরী প্রভাব-প্রতিক্রিয়া অস্বীকার করা যায় না। হিন্দুধর্মের প্রতিষ্ঠানিক সংগঠনের ক্ষেত্রে জাতিভেদ প্রথার তাৎপর্যের প্রতি ওয়েবার সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ভারতীয় সমাজজীবনে অর্থনৈতিক রূপান্তর সাধনের পথে হিন্দু ধর্মের বর্ণ ব্যবস্থা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে থাকে। আবার, পুঁজি পুঞ্জীভূত হওয়ার পথে ইসলাম ধর্ম বাধার সৃষ্টি করে। সমাজ এবং রাষ্ট্রব্যবস্থার ওপর ধর্ম কীভাবে প্রভাব ফেলে তা মধ্যযুগীয় ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই বোঝা যায়।

এমিল ডুর্কহেইম (Emile Durkheim)-এর মতে, মানবজীবনের অনেকখানি জায়গা জুড়ে ধর্মের অস্তিত্ব বর্তমান। সমাজবদ্ধ মানুষের ব্যবহারিক জীবন ধর্মবিশ্বাস এবং ধর্মীয় অনুশাসনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সমাজজীবনের

ধারাও এইভাবেই প্রভাবিত এবং পরিবর্তিত হয়। ওয়েবারের মত ডুর্কহেইমও ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন যে, খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠীর ধর্মবোধ তাদের অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রভাবিত করে। জৈন, পার্শী ইত্যাদি ধর্মীয় মতবাদ আধুনিককালের যুক্তিভিত্তিক ব্যবসা-বাণিজ্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। আবার হিন্দু ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠীর কাছে অর্থনৈতিক উন্নতির আবেদন কম। এর কারণ হল, হিন্দুধর্ম পার্থিব সম্পদ-সামগ্রীর পরিবর্তে ধর্মের সারতত্ত্বের উপলব্ধির ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে।

তবে সাম্প্রতিককালে ধর্মের প্রভাব মানুষের হৃদয়ের মধ্যেই বর্তমান। সমাজের বৃহত্তর পরিধি থেকে ধর্মের প্রভাব অনেক ক্ষেত্রেই দূর হয়ে যাচ্ছে। ধর্মবোধ বর্তমানে ব্যক্তির নিজস্ব বিষয় এবং বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে।

অষ্টমত, মার্ক্সীয় দর্শন অনুযায়ী ধনতন্ত্রের পরবর্তী পর্যায়ে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় ধর্মের অবসান অনিবার্য। অর্থাৎ, ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে মানবসমাজ থেকে ধর্ম অবলুপ্ত হবে। ধর্মের অবসান সম্পর্কিত মার্ক্সীয় বক্তব্যও সমালোচনার ঊর্দ্ধে নয়। মার্ক্সবাদীরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মাধ্যমে ধর্মীয় অনুশাসন এবং আচার-অনুষ্ঠানের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করতে পারেন। কিন্তু এইভাবে মানুষের মনের ধর্মবোধকে বিলুপ্ত করা যায় না। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গণ-প্রজাতন্ত্রী চীনদেশেও মানুষের ধর্মবিশ্বাসের অধিকারকে অবলুপ্ত করা যায় নি। গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের ১৯৮২ সালের সংবিধানে চীনের নাগরিকদের ধর্মের অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। সংবিধানের ৩৬ ধারা অনুসারে চীনের নাগরিকদের ধর্মে বিশ্বাস করার অধিকার আছে। ধর্মীয় চেতনা হ'ল মানুষের অন্তরের বিষয়। ধর্মবোধ মানুষের অন্তরেই নিহিত থাকে। স্বভাবতই ধর্মের অবসান বাস্তবে অসম্ভব।

সর্বোপরি, মার্ক্সবাদীদের মতে, ধর্ম এবং বিজ্ঞান হ'ল পরস্পর-বিরোধী। তাঁরা মনে করেন যে, বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যার প্রগতি ও প্রসারের সাথে সাথে ধর্মের প্রতি মানুষের সমর্থন হ্রাস পেতে থাকবে। ধীরে ধীরে সমাজ থেকে ধর্ম হারিয়ে যাবে। কিন্তু মার্ক্সবাদীদের এই বক্তব্যও গ্রহণযোগ্য নয়। মূলত, ধর্ম এবং বিজ্ঞানের মধ্যে মৌলিক কোনো বিরোধ নেই। বিশ্ববিখ্যাত বহু বিজ্ঞানীও এই অভিমত স্বীকার করেছেন।

৮৬.৫ মূল্যায়ন

ধর্ম সম্পর্কে মার্ক্সবাদী এবং মার্ক্সবাদ-বিরোধী মত পর্যালোচনা করে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, উভয় পক্ষের দৃষ্টিভঙ্গীগত পার্থক্যের কারণে এই ধারণাগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। শ্রেষ্ঠ মূল্যবোধের বিকাশ এবং পরমার্থ লাভ করাই ধর্মের বিষয়। প্রকৃত প্রস্তাবে, ধর্মের আবেদন হল আধ্যাত্মিক এবং অপার্থিব। কিন্তু ধর্মীয় চিন্তাভাবনার বিরুদ্ধে মার্ক্সের বক্তব্যগুলি ছিল চরম বাস্তবোচিত। মার্ক্স মানবিকতাবোধকে সর্বদাই ঊর্দ্ধে রেখেছেন, যা প্রচলিত ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীর নির্যাসস্বরূপ। তিনি ধর্মের মূল সুরটি কোনো কাল্পনিক চিন্তাভাবনার মধ্যে দিয়ে তুলে ধরেন নি। প্রচলিত পরিস্থিতিকে বিজ্ঞান এবং যথাযথ যুক্তির নিরিখে উপলব্ধি করা যাবে — এই চরম শক্তিকেই মার্ক্স বারংবার অর্জনের কথা বলেছেন। তাই মার্কসের ধর্মবিষয়ক তত্ত্বকে গভীরভাবে বুঝতে গেলে আমাদের চিন্তাভাবনাকেও সেই সমান্তরালে নিয়ে যেতে হবে।

৮৬.৬ সারাংশ

ধর্ম সম্পর্কীত মার্ক্সীয় ব্যাখ্যা সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাজগতে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। মার্ক্সের মতে, ধর্মের কোনো ব্যবহারিক মূল্য নেই। এটি সমাজের নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয়ও নয়। মূলত, ধর্ম হল একটি বিশেষ হাতিয়ার যার সাহায্যে সমাজের স্বার্থান্বেষী শোষক শ্রেণী সাধারণ মানুষকে অফিঙের নেশায় মোহাচ্ছন্ন করে অত্যাচার এবং শোষণ অব্যাহত রাখে। মার্ক্সের মতে, অত্যাচারিত শ্রেণীগুলির সামাজিক অবস্থা অধিকাংশ ধর্মীয় আন্দোলন গড়ে তোলার মূল চালিকা শক্তি। তাঁর মতে, মানুষের প্রকৃত সুখের জন্য ধর্মের অবসান একান্তভাবে আবশ্যক। মার্ক্সীয় দর্শনে ধর্ম উপরিকাঠামোর অংশবিশেষ যেটি সমাজের মূল অর্থনৈতিক কাঠামোর ওপরে অবস্থিত। অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তনের সাথে সাথে ধর্মেরও পরিবর্তন ঘটবে। বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যার যত সম্প্রসারণ ঘটবে, ধর্মের ওপর মানুষের বিশ্বাস ততই সংকুচিত হবে। মার্ক্স দ্বন্দ্ববাদের সাহায্যে মানবসমাজের বিচার-বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন। তিনি মনে করেন যে ধর্মীয় চেতনা বিশ্বজগত সম্পর্কে সঠিক ধারণার পরিবর্তে বিপরীত চেতনার জন্ম দেয়। ধর্ম মানুষকে নিজ নিজ স্থানে অবস্থান করতে সাহায্য করে, প্রচলিত প্রথা ভেঙে দেওয়ার সমর্থন করে না। মার্ক্সের মতে, পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় মুষ্টিমেয় শোষক শ্রেণী উৎপাদনের উপাদানসমূহের ওপর মালিকানা বজায় রাখে এবং সর্বহারা শ্রেণীর ওপর অত্যাচার চালায়। এই পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা ধর্মের অস্তিত্ব এবং তা বজায় রাখার ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার অবসানে শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠলে ধর্ম ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হবে বলে মার্কস আশা পোষণ করেন।

ধর্ম বিষয়ে মার্ক্সের বক্তব্য বিশেষভাবে সমালোচনার সম্মুখীন হয়। এমিল ডুর্কহেইম, ম্যাক্স ওয়েবার এবং অন্যান্য সমালোচকরা তাঁদের যুক্তির মধ্য দিয়ে এটিই উপস্থাপিত করার চেষ্টা করেছেন যে ধর্মের সমাজজীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বর্তমান। তাঁদের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে ধর্ম সম্পর্কে মার্ক্সীয় তত্ত্বের অসাড়তা প্রমাণিত হয়। কিন্তু যাই হোক, নানাবিধ সমালোচনা সত্ত্বেও ধর্ম বিষয়ে মার্ক্স এবং তাঁর অনুগামীদের বক্তব্যকে অগ্রাহ্য বা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই।

৮৬.৭ অনুশীলনী

১) নীচের বক্তব্যগুলি ঠিক না ভুল তা নির্দিষ্ট স্থানে '✓' চিহ্ন দিয়ে দেখান ঃ		ঠিক	ভুল
ক)	মার্ক্সের মতে, ধর্মের ব্যবহারিক মূল্য অপরিসীম।	☐	☐
খ)	এঙ্গেলস-এর মতে, খ্রীষ্টধর্মীয় ধ্যান-ধারণা বাস্তবে অত্যাচারিত মানুষের অন্দোলনেরই ফলশ্রুতি।	☐	☐
গ)	মার্ক্সীয় দর্শন অনুযায়ী, ধর্ম সমাজব্যবস্থার মূল কাঠামোর অংশবিশেষ।	☐	☐
ঘ)	মার্ক্সবাদ অনুসারে, জড়েরই একমাত্র সত্তা বর্তমান।	☐	☐
ঙ)	মার্ক্সের মতে, ধর্মীয় চেতনা হল বৈজ্ঞানিক চেতনার বিপরীত।	☐	☐

চ) মার্ক্সীয় দর্শন অনুসারে বলা যায় যে ধর্ম-সামাজিক পরিবর্তনের দিক নির্দেশ করে। ☐ ☐

ছ) মার্ক্সবাদীদের মতে সমাজের নেতৃত্বকারী শ্রেণী ধর্মের পৃষ্ঠপোষক। ☐ ☐

জ) মার্ক্সের মতে, পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় উৎপাদনের উপাদানসমূহের ওপর সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। ☐ ☐

ঝ) ওয়েবারের মতে, ধর্মের সাথে সমাজে বসবাসকারী মানুষের বিশ্বাস এবং ব্যবহারিক শিক্ষা বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত। ☐ ☐

ঞ) ডুর্কহেইম সমাজজীবনে ধর্মের ভূমিকাকে অস্বীকার করেন। ☐ ☐

২) নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ

ক) মার্ক্স কীভাবে ধর্মের সংজ্ঞা দিয়েছেন?

খ) ধর্ম কীভাবে শোষণ যন্ত্রণা প্রশমিত করে বলে মনে করা হয়?

গ) ধর্ম কীভাবে বিশ্বজগত সম্পর্কে বিপরীত চেতনার জন্ম দেয়?

ঘ) ধর্ম কীভাবে সমাজের নেতৃত্বকারী শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতা করে উদাহরণ সহযোগে বলুন।

ঙ) মার্ক্স কেন মনে করেন যে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় ধর্ম ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হবে?

৩) নীচের প্রশ্নগুলির বিশদ্ উত্তর দিন ঃ

ক) মার্ক্স কীভাবে ধর্মের বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন তা সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

খ) ধর্ম সম্পর্কে মার্ক্সের বক্তব্য কী বিরোধ-বিতর্কের উর্দ্ধে ছিল?

গ) ধর্ম সম্পর্কে মার্ক্সের বক্তব্য সমালোচনাসহ আলোচনা করুন। আপনি কী মনে করেন মার্ক্সের বক্তব্য বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ছে?

৮৬.৮ উত্তর সংকেত

১) ক) ভুল; খ) ঠিক; গ) ভুল; ঘ) ঠিক; ঙ) ঠিক;

চ) ভুল; ছ) ঠিক; জ) ভুল; ঝ) ঠিক; ঞ) ভুল।

৮৬.৯ গ্রন্থপঞ্জী

১) Abraham Francis and Morgan John Henry : Sociological Thought From Comte to Sovokin; MacMillan India Limited; Reprinted 1994.

২) দাশগুপ্ত সমীর ঃ সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস; পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৮০।

৩) ডঃ ঘোষ শান্তনু ঃ সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারা, প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড; চ্যাটার্জী পাবলিশার্স; কলকাতা; ২০০০।

৪) Haralambos Michael with Heald Robin : Sociology - Themes and Perspectives; Delhi; OUP; 1995.

৫) ডঃ মহাপাত্র অনাদিকুমার ঃ বিষয় সমাজতত্ত্ব; ইন্ডিয়ান বুক কনসার্ন; কলকাতা; ১৯৯৬

একক ৮৭ □ শিক্ষা এবং সামাজিকীকরণ ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া

গঠন

৮৭.১ উদ্দেশ্য
৮৭.২ প্রস্তাবনা
৮৭.৩ শিক্ষা বলতে কি বোঝায় ?
৮৭.৪ সামাজিকীকরণের অর্থ
৮৭.৫ শিক্ষা এবং সামাজিকীকরণ
৮৭.৬ সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অর্থ
৮৭.৭ শিক্ষা এবং সামাজিক নিয়ন্ত্রণ
৮৭.৮ সারাংশ
৮৭.৯ অনুশীলনী
৮৭.১০ উত্তর সংকেত
৮৭.১১ গ্রন্থপঞ্জী

৮৭.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলির বিচার-বিশ্লেষণে সক্ষম হবেন এবং এই বিষয়গুলি সম্বন্ধীয় সমাজতাত্ত্বিক গবেষণাকার্যে আপনার ধারণার ব্যবহারিক প্রয়োগ ঘটাতে সমর্থ হবেন : —

- শিক্ষার অর্থ,
- সামাজিকীকরণ বলতে কী বোঝানো হয়,
- শিক্ষা এবং সামাজিকীকরণের সম্পর্ক,
- সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলতে কী বোঝানো হয়,
- শিক্ষা এবং সামাজিক নিয়ন্ত্রণের সম্পর্ক।

৮৭.২ প্রস্তাবনা

আমাদের সামাজিক ও প্রাযুক্তিক দক্ষতার একটি সুবৃহৎ অংশই ইচ্ছাকৃত পাঠ-গ্রহণের মাধ্যমে অর্জিত হয়ে থাকে এবং এই পাঠদান ও পাঠগ্রহণকে সাধারণভাবে 'শিক্ষা' বলা হয়ে থাকে। পাঁচ থেকে পনেরো বছর বয়সের ছেলে মেয়েদের জাগরিত করার এটিই প্রধান ক্রিয়াকলাপ এবং শিক্ষা বর্তমানে একটি বৃহৎ অর্থনৈতিক কর্মক্ষেত্ররূপেও

পরিগণিত হয়েছে। বিভিন্ন উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশে রাষ্ট্রীয় বাজেটের সর্ববৃহৎ অংশ শিক্ষাখাতে ব্যয় করা হয়। যেকোনো বড় শিল্পে নিয়োজিত মোট কর্মী সংখ্যার চেয়েও বেশী কর্মী শিক্ষা ক্ষেত্রে নিয়োজিত হয়।

উন্নত শিল্পায়িত সমাজে রাষ্ট্রই শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করে এবং শিক্ষা গ্রহণ করা জনগণের মৌলিক অধিকাররূপে বিবেচিত হয়। স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মত আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সংগঠিত করা হয়।

শিকারী এবং খাদ্যসংগ্রহকারী দলের মত নিরক্ষর ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর কাছে আধুনিক শিক্ষা ছিল সম্পূর্ণ অজানা। সামাজিক গোষ্ঠীর দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণের মাধ্যমে অল্পবয়সীরা জীবনের শিক্ষা গ্রহণ করত। প্রাপ্তবয়স্কদের অনুকরণ করে জ্ঞান এবং দক্ষতা লাভ করাই ছিল রীতি। বয়স্করা অনেক সময় রুটিন-মাফিক কাজের মধ্য দিয়ে যা শেখাতেন তাই ছিল পাঠদান। এইভাবে ছেলেরা বাবার সঙ্গে শিকার-যাত্রার সঙ্গী হয়ে এবং মেয়েরা গার্হস্থ্য কর্মে মায়ের সঙ্গী হয়ে কর্মশিক্ষা গ্রহণ করতো। শিল্প-বিপ্লবের পূর্ববর্তী সময়ে বিশেষীকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ ধীরে ধীরে বিকশিত হচ্ছিল এবং শিক্ষকের ভূমিকাও ধীরে ধীরে বিশেষজ্ঞের ভূমিকায় রূপান্তরিত হচ্ছিল। ঐ সময় সমাজের একটি ক্ষুদ্র অংশই আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ পেতো। শিল্পায়ন মোটামুটি ভালভাবে বিকশিত হতে থাকলে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার দ্বার সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত হয়।

শিক্ষার সামাজিক ভূমিকা এবং বিশেষতঃ মানব সমাজ সংগঠন করতে শিক্ষার ক্রমবর্দ্ধমান ভূমিকা বিশ্লেষণের বিষয়টি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এ প্রসঙ্গে আমাদের স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে শিক্ষা-পদ্ধতির একটি মাত্র অংশ অধিকার করে রয়েছে শিক্ষা। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার কাঠামোর বাইরেও উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে শিক্ষাদান করার প্রথা চালু রয়েছে।

সমাজে বসবাসকারী মানুষের চিন্তা-চেতনা এবং আচরণে অভিন্নতা প্রতিষ্ঠিত হলে সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় হয়। সেই কারণে প্রত্যেক সমাজ ব্যবস্থায় নবজাত শিশুর সামাজিকীকরণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। আবার, সমাজবদ্ধ মানুষের অনিয়ন্ত্রিত আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সামাজিক নিয়ন্ত্রণবিধি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। সামাজিকীকরণ এবং সামাজিক নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ায় শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বর্তমান। বর্তমান এককে সে বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

৮৭.৩ শিক্ষা বলতে কি বোঝায় ?

শিক্ষা মানবসমাজের একটি মৌলিক কার্যপ্রক্রিয়া। শিক্ষার ইংরেজী প্রতিশব্দ হল 'education'। এই ইংরেজী শব্দটির সৃষ্টি হয়েছে ল্যাটিন শব্দ 'educare' থেকে যার অর্থ হ'ল বড় করা অথবা পালন করা (bring up)। গ্রীক চিন্তাবিদ্‌দের কাছে শিক্ষা হল বিকাশ সাধনের স্বার্থে বিশেষ এক সুসংবদ্ধ এবং সচেতন পদ্ধতি। শিক্ষা বলতে নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে শিক্ষার্থীকে শিক্ষা অথবা পাঠদানকেই শুধু বোঝায় না, শিক্ষা হ'ল শিক্ষার্থীকে বড় করে তোলা অথবা সাফল্যের সাথে ভবিষ্যতের সম্মুখীন হওয়ার জন্য তার মধ্যে প্রয়োজনীয় অভ্যাস এবং মানসিকতা গড়ে তোলা। অ্যারিস্টটলের মতে, প্রকৃত অর্থে শিক্ষিত করার অর্থ হ'ল মানুষের দক্ষতা বিশেষতঃ মন বিকশিত করা যাতে সে শাশ্বত সত্য, সুন্দর ইত্যাদির স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে।

ডঃ অনাদিকুমার মহাপাত্রের মতে, মূলত ব্যাপক এবং সংকীর্ণ দুই দিক থেকেই শিক্ষার কথা বলা যেতে পারে। সংকীর্ণ অর্থে, শিক্ষা বলতে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাকেই বোঝায়। প্রাচীনকালে আদিম সমাজ ছিল নিরক্ষর। এ

ধরণের সমাজে কোনোরকম আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল না। পরবর্তীকালে অপেক্ষাকৃত জটিল সমাজ ব্যবস্থায় আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সূত্রপাত ঘটেছে। বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের কেন্দ্র করে বিশেষীকৃত বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়েছে মধ্যযুগের ইউরোপে শিল্প-পূর্ববর্তী পর্যায়ে। তবে এ ধরনের আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা দেশবাসীর একটি মুষ্টিমেয় অংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তারপর শিল্পায়ন, নগরায়ণ, আধুনিকীকরণ ইত্যাদির প্রভাবের পরিপ্রেক্ষিতে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থার ব্যাপক প্রচলন পরিলক্ষিত হয়। ডঃ মহাপাত্রের অভিমত অনুযায়ী, বিভিন্ন দেশের সমাজব্যবস্থায় বর্তমানে যে বিধিবদ্ধ এবং আনুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন পরিলক্ষিত হয়, তা হল অপেক্ষাকৃত আধুনিককালের ঘটনা। বর্তমানে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। বিধিসম্মতভাবে এই সমস্ত শিক্ষাসংগঠনে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের নিয়ে নির্দিষ্ট পাঠক্রম অনুযায়ী আনুষ্ঠানিকভাবে পঠন-পাঠন পরিচালিত হয়।

অধ্যাপক ডঃ মহাপাত্র মনে করেন যে, শিক্ষা বলতে এক ধরণের বিশেষ সংস্কার সাধনকে বোঝানো হয়। সঠিক অর্থে শিক্ষা শুধুমাত্র একটি পদ্ধতি নয়। সর্বাত্মক শিক্ষা হ'ল এক ধরণের স্বয়ং -শিক্ষা। আনুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষক ছাড়াও 'শিক্ষণ' অথবা 'শিক্ষা' সম্ভব। সমাজবিদ্যার আলোচনায় এর গুরুত্ব এবং তাৎপর্য অনস্বীকার্য। 'শিক্ষা' শব্দটি ব্যাপক এবং সংকীর্ণ - এই দুই অর্থেই ব্যবহৃত হয়। ব্যাপক অর্থে শিক্ষা বলতে বিদ্যায়তনের আনুষ্ঠানিক শিক্ষাকে বোঝায় না। এই অর্থে শিক্ষা কোনো সংগঠন, পরিবার বা প্রতিষ্ঠানের বিষয় নয়। সামগ্রিক অর্থে, শিক্ষা সমাজের জীবনধারার সাথে সম্পর্কযুক্ত। পরিবেশের সামগ্রিক প্রভাবের সুষম সমন্বয়ের মাধ্যমে এ ধরণের শিক্ষা সম্পাদিত হয়। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের পরিপূর্ণ পদ্ধতি হ'ল শিক্ষা। অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জি (Mackenzie) এর মতে ব্যাপক অর্থে শিক্ষা বলতে মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন অথবা আত্মোপলব্ধিকেই বোঝায় ["It (education) means, in this sense, the general process by which personality is developed and by which persons are enabled to realize their relations to one another and the universe in which they live."]। হোয়াইটহেড (Whitehead)-এর অভিমত হল, শিক্ষার একমাত্র বিষয় হ'ল সর্বতোভাবে বিকশিত বা প্রকাশিত জীবন ("There is only one subject matter of education, and that is life in all its manifestations.")। সমাজবিজ্ঞানী সামনার (W. G. Sumner) বলেছেন যে, শিক্ষা মূলত একটি বিরামহীন প্রচেষ্টা যার মাধ্যমে একটি শিশুকে দেখা, অনুভব এবং ক্রিয়াসংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে অবহিত করার চেষ্টা করা হয় যেগুলি ঐ শিশু স্বতঃস্ফূর্তভবে অর্জন করতে পারে না |"It (education) is actually a continuous effort to impose on the child ways of seeing, feeling and acting which he could not have arrived at spontaneously."]। ডুর্কহেইম (Emile-Durkheim) শিক্ষার সংজ্ঞা দিয়েছেন এইভাবে- "যারা সমাজ-জীবন যাপনে এখনও প্রস্তুত নয় (শিক্ষা) তাদের ওপর পূর্ববর্তী প্রজন্ম দ্বারা চর্চিত ক্রিয়া। এর উদ্দেশ্য শিশুর সেই সব দৈহিক, বৌদ্ধিক এবং নৈতিক ক্ষমতাকে জাগিয়ে বিকশিত করে তোলা, যা সমাজের ও বিশেষ করে তার নিজস্ব পরিবেশের চাহিদা পূরণের জন্য প্রয়োজন" ("Durkheim defined education as the action exercised by the older generations upon those who are not yet ready for social life. Its object is to awaken and develop in the child those physical, intellectual and moral states which are required of him both by his society as a whole and by the milion for which he is specially destined.")

সামগ্রিক অর্থে, শিক্ষা হ'ল বিরামহীন প্রক্রিয়া, শিশুর জন্মের সাথে সাথে এই প্রক্রিয়ার সূত্রপাত ঘটে। এই প্রক্রিয়া আমৃত্যু অব্যাহত থাকে। মানুষ জীবনে চলার পথে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা অর্জন করে। এই সমস্ত অভিজ্ঞতার প্রতিটিই কোনো-না-কোনো শিক্ষালাভে সাহায্য করে। এইভাবে প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এই ধরণের শিক্ষা গ্রহণ নিরন্তর চলতে থাকে। এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোনো পন্থা-পদ্ধতির প্রয়োজন হয় না।

আসুন, এখন বৃহত্তর অর্থে শিক্ষার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা যাক।

অধ্যাপক ডঃ মহাপাত্র শিক্ষার বৈশিষ্ট্যগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে চিত্রায়িত করেছেন ঃ—

প্রথমত, সামগ্রিক অর্থে শিক্ষা বলতে আনুষ্ঠানিক নিয়মবর্জিত বিষয়কে বোঝানো হয়। নির্দিষ্ট কোনো ধারা এ ধরণের শিক্ষার ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হয় না।

দ্বিতীয়ত, ব্যাপক অর্থে শিক্ষা বলতে নির্দিষ্ট কোনো পাঠ্য তালিকার সাথে সম্পর্কহীন বিষয়কে বোঝানো হয়। জীবনে চলার পথে মানুষ যা দেখে এবং শোনে, সেইসব কিছুই তার কাছে শিক্ষার উপাদান হিসাবে বিবেচিত হয়।

তৃতীয়ত, এই ধরণের শিক্ষা-প্রক্রিয়া সাধারণত অসচেতনভাবেই চলতে থাকে।

চতুর্থত, এই রকম শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তির অভিজ্ঞতা সহজে হয় এবং ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথ বিশেষভাবে সুগম হয়।

ডঃ মহাপাত্রের মতে, শিক্ষা বলতে সাধারণ মানুষ শিক্ষায়তনে গ্রন্থলব্ধ জ্ঞানকেই বুঝে থাকেন। নির্দ্ধারিত পাঠ্যক্রমের পরিপ্রেক্ষিতে এই ধরণের পঠন-পাঠন পরিচালিত হয়। শিক্ষক-শিক্ষিকারা পাঠদান করেন এবং শিক্ষায়তনের শিক্ষার্থীরা তা গ্রহণ করে। সুনির্দিষ্ট পাঠ্যতালিকার পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যায়তনে সচেতনভাবে এই ধরণের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। সমস্ত সভ্য সমাজব্যবস্থায় এই ধরণের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্তরের বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠিত থাকতে দেখা যায়। বর্তমানে সুনির্দিষ্ট পন্থায় বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সযত্নে শিক্ষা লাভ করার ব্যবস্থা করা হয়। এক্ষেত্রে সরকার, বেসরকারী সংগঠন, পরিবার ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। এই ধরণের শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে কোনো বিশেষ আর্থসামাজিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তৈরী করে দেওয়া হয়। এ রকম শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট গন্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষার ধারণা বলতে এটিকেই বোঝানো হয়। সুতরাং সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষা হ'ল এক সচেতন এবং সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য হ'ল ব্যক্তির সুপ্ত বৃত্তি বা ক্ষমতাসমূহকে প্রকাশিত এবং পরিমার্জিত করা।

সমাজতত্ত্বে শিক্ষার ধারণাকে সংকীর্ণ অর্থে সাধারণত গ্রহণ করা হয়ে থাকে। কারণ, সংকীর্ণ অর্থেই শিক্ষার সামাজিক তাৎপর্য সহজেই অনুধাবন করা সম্ভব হয়। সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষার বৈশিষ্ট্যগুলিকে ডঃ মহাপাত্র নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করেছেন ঃ —

প্রথমত, সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষায় শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে এক ধরণের নির্দিষ্ট সম্পর্ক থাকে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষা দান করেন এবং বিদ্যার্থীরা তা গ্রহণ করে।

দ্বিতীয়ত, এই ধরণের শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্যে আছে সুনির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম, পঠন-পাঠন, পরীক্ষা ব্যবস্থা ইত্যাদি।

তৃতীয়ত, বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি বিদ্যায়তনে এই ধরণের শিক্ষা প্রদান করা হয়।

চতুর্থত, সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এর উদ্দেশ্য হ'ল কোনো বিশেষ বিষয়ে জ্ঞানার্জন করা।

পঞ্চমত, এই ধরণের শিক্ষা মানুষ সচেতনভাবে গ্রহণ করে থাকে।

মার্ক্সীয় দর্শন অনুসারে একটি সচেতন সামাজিক কর্ম হলো শিক্ষা, এ হ'ল বিকাশের একটি পদ্ধতি। এই পদ্ধতি উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত। এই পদ্ধতি স্বাভাবিক, চিন্তামূলক এবং পরিবেশের ওপর নির্ভরশীল। শিক্ষা সমষ্টিগত এবং নির্দিষ্ট মান অনুসারী প্রক্রিয়া। ব্যক্তির পূর্ণাঙ্গ বিকাশই হ'ল শিক্ষার উদ্দেশ্য।

শিক্ষা এবং সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে সামাজিকীকরণ বলতে কী বোঝায় - সে বিষয়ে একটু আলোকপাত করা প্রয়োজন।

৮৭.৪ সামাজিকীকরণের অর্থ

সামাজিকীকরণ হ'ল একটি প্রণালী যার মাধ্যমে ব্যক্তির সামাজিক প্রবৃত্তির বিকাশ ঘটে। মানুষের সামাজিক প্রকৃতির উন্মেষের উপায়ই হ'ল সামাজিকীকরণ। মানুষ সামাজিক জীব। কিন্তু সামাজিক হয়েই সে জন্মগ্রহণ করে না। আবার জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে সে সামাজিক হয়ে যায় না। বস্তুত শিশুর জন্ম হয় জৈব প্রক্রিয়ায়। জন্মগ্রহণের পর শিশুর মধ্যে শুধুমাত্র জৈবিক চাহিদাগুলি বর্তমান থাকে। তারপর ধীরে ধীরে সামাজিকীকরণের মাধ্যমে সে প্রথমে মানব প্রকৃতি এবং কালক্রমে সামাজিক প্রকৃতির অধিকারী হয়ে ওঠে।

অধ্যাপক মহাপাত্রের মতে, প্রকৃত অর্থে, ব্যক্তি সামাজিকীকরণের মাধ্যমে সমাজে প্রচলিত প্রথা, মূল্যবোধ, রীতিনীতি, আচার-আচরণ অর্থাৎ সমগ্র সমাজের সাথে সঙ্গতি সাধনের ব্যবস্থা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করে। সামাজিকীকরণের মাধ্যমেই সমাজের সঙ্গে শিশুর আত্তীকরণ হয় এবং এইভাবেই সে সামাজিক জীব হিসাবে পরিচিত ও পরিগণিত হয়।

সামাজিকীকরণের ধারণা সামাজিক এবং ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ব্যাখ্যা করা যায়। ডঃ মহাপাত্র মনে করেন যে, সামাজিক দিক থেকে সামাজিকীকরণ বলতে সামাজিক ভূমিকাগুলি সঠিকভাবে পালনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাকে বোঝায়। অর্থাৎ সমাজবদ্ধ মানুষ কীভাবে তার কর্তব্যগুলিকে সন্তোষজনকভাবে সম্পাদন করবে তার শিক্ষাকেই বলা হয় সামাজিকীকরণ। সুতরাং সামাজিক দিক থেকে বিচার করলে সমাজজীবনের অভিজ্ঞতাসমূহকে সামাজিকীকরণ বোঝায়। জনসন (H. M. Johnson) মন্তব্য করেছেন যে, সামাজিকীকরণ হ'ল একটি শিক্ষা পদ্ধতি যা শিক্ষার্থীকে সামাজিক ভূমিকাসমূহ পালনের ব্যাপারে শিক্ষাদান করে ("Socialization is a learning that enables the learner to perform social roles.")।

ডঃ মহাপাত্রের অভিমত অনুসারে, ব্যক্তিগত দিক থেকে সামাজিকীকরণ একটি বিশেষ প্রণালী যার দ্বারা ব্যক্তি তার গোষ্ঠীর প্রচলিত ধারা অনুসারে আচার-আচরণের ব্যাপারে স্বাভাবিক প্রবণতা অর্জন করে থাকে। পরিণত হওয়ার পূর্বে এই প্রণালীকেই শিশু গোষ্ঠীগত নিয়ম-নীতি, আচার-আচরণ, মূল্যবোধ প্রভৃতি আয়ত্ব করে।

আরনল্ড গ্রীণ (Arnold Green) এর মতে, সামাজিকীকরণের মাধ্যমে শিশু সংস্কৃতির সাথে সাথে আমিত্ব এবং ব্যক্তিত্ব অর্জন করে ("Socialization is the process by which the child acquires a cultural contest, along with selfhood and personality.")।

প্রকৃত অর্থে, সামাজিকীকরণ প্রণালীর ওপর সমাজ এবং ব্যক্তি-উভয়ই বিশেষভাবে নির্ভরশীল। সমাজ তথা সংস্কৃতির ধারার স্থায়িত্বের স্বার্থে সামাজিকীকরণ অপরিহার্য। সামাজিকীকরণ ব্যতীত সমাজের কোনো মানুষের পক্ষে ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশসাধন সম্ভব নয়। সকল সমাজেই সামাজিক ভূমিকাগুলি সামাজিক মর্যাদার অনুসারী হয়ে থাকে। সামাজিক ভূমিকাগুলির ব্যবহারবিধি সমাজের প্রচলিত সাংস্কৃতিক ধারা অনুযায়ী স্থির হয়। এইভাবে বংশানুক্রমে সমাজজীবনের সাংস্কৃতিক ধারা অব্যাহত থাকে। এর ফলে সমাজব্যবস্থায় বিচ্যুতি বা অসংগতির আশংকা অনেক কমে আসে। সমাজব্যবস্থা স্বচ্ছন্দ গতিসম্পন্ন হয়।

৮৭.৫ শিক্ষা এবং সামাজিকীকরণ

সমাজতাত্ত্বিকরা মনে করেন যে, সমাজব্যবস্থা এবং সামাজিক জীবনধারার বৈশিষ্ট্যসমূহ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে শিক্ষাব্যবস্থা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। সমাজে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে সমাজের আদর্শ, কৃষ্টি এবং জীবনধারার নিরবচ্ছিন্নতা অব্যাহত থাকে। শিক্ষাদানের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজের কৃষ্টি, আদর্শ ইত্যাদি স্থায়ী রূপ লাভ করে অথবা বংশানুক্রমে ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। শিক্ষা এক যুগের বা এক পুরুষের আদর্শ এবং ঐতিহ্যসূচক বৈশিষ্ট্যগুলিকে উত্তর পুরুষের মধ্যে পরিবাহিত করে। সমাজতত্ত্বের আলোচনায় একে বলা হয় সামাজিকীকরণ। সামাজিকীকরণের বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে শিক্ষাব্যবস্থা হ'ল বিশেষভাবে অর্থবহ এবং কার্যকরী।

অধ্যাপক মহাপাত্রের মতে, কোনো শিশুকে সম্পূর্ণভাবে কোনো সামাজিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে সামাজিকীকরণের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। সকল সমাজব্যবস্থাই শিশুর সামাজিকীকরণকে বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করে। শিক্ষার্থী শিক্ষার মাধ্যমে নিজ সংস্কৃতির উত্তরাধিকার লাভ করে। ব্যাপক সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিকীকরণ সম্পাদিত হয় শিক্ষণের মাধ্যমে। সমাজের শিক্ষা পদ্ধতির সাহায্যে যে কোনো সামাজিক গোষ্ঠীর কৃষ্টি এবং আদর্শের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। জন্মলাভের পর থেকেই শিশুর সামাজিকীকরণ শুরু হয়। এই শিক্ষার সূত্রপাত ঘটে সমাজ এবং ব্যক্তির পারস্পরিক মিথোস্ক্রিয়ার মাধ্যমে। প্রাথমিক পর্বে শিক্ষাদানের কোনো সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা থাকে না। পরবর্তী পর্যায়ে বিভিন্ন শিক্ষায়তনের মাধ্যমে সুপরিকল্পিতভাবে শিক্ষাদান শুরু হয়। এই শিক্ষাদানের মাধ্যমে ব্যক্তির আচার-আচরণের পরিবর্তনের চেষ্টা করা হয়। এর মূল উদ্দেশ্য হ'ল ব্যক্তিকে নিজ সমাজের উপযুক্ত করে গড়ে তোলা। সমাজব্যবস্থার অন্তর্গত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ শিক্ষার মাধ্যমে সমাজের সমষ্টিগত ঐতিহ্য এবং জীবনধারাগত বৈশিষ্ট্যসমূহকে নবীন প্রজন্মের মধ্যে সঞ্চারিত করেন। শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষার্থী বিভিন্ন রীতি-নীতি, আচার-বিচার, মূল্যবোধ প্রভৃতির সাথে পরিচিত হয়। এইভাবে শিক্ষার্থীর আচার-আচরণ এবং জীবনধারা সমাজের সমষ্টিগত ঐতিহ্য এবং আদর্শের অনুগামী হয়ে থাকে।

গোষ্ঠীজীবনে প্রচলিত সভ্যতা-সংস্কৃতির সাথে ব্যক্তিকে পরিচিত করার ক্ষেত্রে শিক্ষাই সর্বাধিক কার্যকরী মাধ্যম হিসাবে কাজ করে। ডঃ মহাপাত্রের অভিমত অনুসারে, প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে যদি ত্রুটি-বিচ্যুতি

থাকে এবং সঠিকভাবে সামাজিকীকরণ সম্পাদিত না হয়ে থাকে, তা হলে অপরিণত বয়স্কদের মধ্যে দুষ্ক্রিয়তার প্রবণতা প্রকাশ পেতে পারে। সুপরিচালিত শিক্ষাব্যবস্থা সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়াকে সফল করে তোলে। সমাজের সকল সদস্যের সামাজিকীকরণ যদি সঠিকভাবে সম্পাদিত হয়, তাহলে সমাজজীবন শান্তিপূর্ণ এবং প্রগতিশীল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সমাজজীবনে এই গুরত্বপূর্ণ দায়িত্ব সম্পাদিত হয় শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমেই। তাই সকল সমাজেই সুচিন্তিতভাবে সুপরিকল্পিত এবং যথাযথ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।

অধ্যাপক পরিমল ভূষণ করের মতে, প্রাক-শিল্পযুগীয় সমাজে সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে শিক্ষার তুলনায় অন্যান্য মাধ্যম প্রাধান্য পেত। পূর্বে শিক্ষা মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। যেমন-প্রাচীন ভারতবর্ষে সাধারণত যাঁরা যজন-যাজনের বৃত্তি গ্রহণ করতেন, তাঁরাই টোল, চতুষ্পাঠী অথবা গুরুগৃহে শিক্ষালাভ করতেন। সমাজের অন্যান্য সকলে আনুষ্ঠানিক নিয়মবর্জিত (informal) উপায়ে জীবন-ধারাগত বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে পরিচিত হতো। পাশ্চাত্ত্য দেশগুলিতেও একই রকম ব্যবস্থা ছিল। ১৮৭০ সালে শিক্ষা আইন পাশ হওয়ার পূর্বে অধিকাংশ ইংরেজ নাগরিক অতি সাধারণ শিক্ষার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত ছিল। তাদের আনুষ্ঠানিক ধারা-বর্জিত উপায়ে জীবনধারাগত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পরিচয় করানো হতো। শিক্ষার স্থান ছিল অতি নগণ্য। কিন্তু শিল্পায়নের ফলে সামাজিকীকরণের মাধ্যমে শিক্ষার কেবল সম্প্রসারণ ঘটেনি, শিক্ষায় নানারকম পৃথকীকরণ (differentiation) ঘটেছে। সমাজতত্ত্বে পৃথকীকরণ বলতে বোঝানো হয় তাকেই যখন কোনো প্রক্রিয়া, ভূমিকা, আচার-ব্যবস্থা বা সংগঠন অন্যান্য প্রক্রিয়া, ভূমিকা প্রভৃতি থেকে পৃথক হয়ে পড়ে। পৃথকীকরণ শিল্প -প্রধান সমাজের বৈশিষ্ট্য। বিভিন্ন কাজে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করার প্রয়োজন উদ্ভব হওয়ায় শিক্ষাক্ষেত্রেও পৃথকীকরণ অনিবার্য হয়ে ওঠে। শিল্প-প্রধান সমাজে জীবনধারাগত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পরিচয় করানো শিক্ষার একমাত্র বা প্রধান লক্ষ্য নয়। শিল্প সম্প্রসারণের ফলে বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত বা দক্ষ লোকের প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষাব্যবস্থায়ও বৈচিত্র্য ঘটে। ক্রমশঃ ধীরে ধীরে মানুষ যাতে বিশেষজ্ঞ ভূমিকা পালন করতে বেশী করে উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারে, শিক্ষা মানুষকে সেভাবেই উপযুক্ত করে তোলে। ব্যক্তি যত বেশী করে শিক্ষা গ্রহণ করে, তত বেশী করে সেই শিক্ষা বিশেষীকৃত হয়ে ওঠে।

অধ্যাপক মৃণালকান্তি ঘোষ দস্তিদার মনে করেন যে, সামাজিকীকরণের আনুষ্ঠানিক দিকের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পার্থক্য বর্তমান। সামাজিক দক্ষতা এবং মূল্যমান সামাজিকীকরণের অনানুষ্ঠানিক দিকের মাধ্যমে মানুষ আয়ত্ব করে। সমাজ জীবনের বিভিন্ন মিথোষ্ক্রিয়া এই ধরণের সামাজিকীকরণ সম্ভব করে ব্যক্তিকে বিভিন্ন ব্যক্তি এবং পরিস্থিতি উপলব্ধি করার সামর্থ্য যোগায়। অনানুষ্ঠানিক সামাজিকীকরণ যে সমস্ত সামাজিক দক্ষতা এবং মূল্যমান শিক্ষা দেয়, তা খুব বেশী বিশেষজ্ঞ জ্ঞানমূলক নয় বলেই ব্যক্তির পক্ষে অন্যান্য ব্যক্তি এবং পরিস্থিতি উপলব্ধি করা সহজতর হয়। তাই সামাজিকীকরণের অন্যান্য দিকগুলি আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পরিপূরক হয়ে ওঠে।

আনুষ্ঠানিক শিক্ষা শিল্পায়িত সমাজের চাহিদামত ব্যক্তিদের বিশেষজ্ঞ ভূমিকা পালনে সাহায্য করে। অধ্যাপক ঘোষ দস্তিদারের মতে, প্রাক্ শিল্পায়িত সমাজে এ ধরণের বিশেষজ্ঞ ভূমিকার সৃষ্টি হতো না, তাই বিশেষজ্ঞ শিক্ষা লাভের জন্য আনুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থার তাগিদ অনুভূত হতো না। শিল্পায়িত সমাজে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা তথা সামাজিকীকরণ মানুষকে মিথোষ্ক্রিয়া ও মানুষে মানুষে সংযোগ রক্ষার উপযুক্ত করে তোলায় আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সঙ্গে পরিপূরক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। যিনি যেমনই বিশেষজ্ঞ হোন না কেন, অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা তথা সামাজিকীকরণের

অনানুষ্ঠানিক দিক তাদেরও মিথোষ্ক্রিয়ায় অংশগ্রহণ এবং বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও মূল্যমান অর্জনে সাহায্য করে।

এ প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখা দরকার যে সামাজিক দক্ষতা এবং মূল্যমান অর্জনে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। উদাহরণ হিসাবে অধ্যাপক ঘোষ দস্তিদার দেখিয়েছেন যে, অনেক সময় বিদ্যালয়ে উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবেই জাতীয় পতাকার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করার সময় মূল্যমান ছাত্রদের মধ্যে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। শিক্ষকরা তাঁদের আচরণের মাধ্যমে অথবা বিদ্যালয়ে খেলাধূলা এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানে ছাত্রদের অংশগ্রহণ করানোর মধ্য দিয়ে ছাত্রদের সামাজিক মূল্যমান এবং সামাজিক হওয়ার দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করেন। পৌর আদর্শ, সততার নৈতিক ধারণা, সমষ্টিবদ্ধতা, সামাজিক আদর্শমান ইত্যাদি যা ব্যক্তিগত যোগ্যতা বা গোষ্ঠীর প্রতি আনুগত্য গঠনে সহায়ক -- তা সবই বিদ্যালয়ের মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। তাই, যদিও সামাজিকীকরণের অন্যান্য দিকগুলি থেকে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাকে পৃথকীকৃত করে রাখা হয়, তবুও এই দুইয়ের প্রভাব একে অপরকে ছাড়িয়ে যায়, সামাজিকীকরণের ওপর উভয়ের প্রভাবই মিলে মিশে কাজ করে।

অধ্যাপক ঘোষ দস্তিদারের মতে, শিশুরা বিদ্যালয়, পরিবার এবং প্রতিবেশী বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে মেলামেশার মাধ্যমে সামাজিক মূল্যমান এবং সামাজিক দক্ষতা অর্জন করে। তাই এটি অস্বীকার করা যায় না যে বিদ্যালয়, পরিবার এবং প্রতিবেশী শিশুর ওপর প্রভাব বিস্তার করতে সম্ভাবনাপূর্ণভাবে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। ফলে এদের পৃথক পৃথক মূল্যমান অনেক সময়ই শিশুকে বিভ্রান্ত করে, কারণ শিশু বুঝতে পারে না কোন্ মূল্যমানটি সে গ্রহণ করবে। বিদ্যালয়ে শিশু যে মূল্যমান শিক্ষালাভ করছে, পরিবারের মূল্যমান তার সাথে নাও মিলতে পারে। আবার অনেক পিতামাতা জীবিকা অর্জনের সামর্থ্য লাভের নিরিখে শিক্ষার মূল্য বিচার করেন, অথচ বিদ্যালয়ে শিক্ষার নিজস্ব মূল্য সম্বন্ধে শিশুকে শিক্ষাদান করা হচ্ছে। বিদ্যালয়ে শিশু শিখছে যে, শিক্ষার জন্যই শিক্ষা, অর্থাৎ শিক্ষার একটি নিজস্ব মূল্য বর্তমান। এখানে পিতামাতার মূল্যবোধ এবং বিদ্যালয়ের মূল্যবোধের মাঝখানে পড়ে শিশুর পক্ষে বিভ্রান্ত হওয়া স্বাভাবিক। এর পরিণামও সুদূরপ্রসারী হতে পারে। বস্তুতপক্ষে বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী প্রভাব এবং বিভিন্ন পরিপূরক প্রভাবের মধ্য দিয়েই আমরা সামাজিকীকৃত হই।

আমরা আগেই দেখেছি যে, শিক্ষা সামাজিকীকরণের অন্যান্য দিক থেকে পৃথক। আনুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থাকে যে বৈশিষ্ট্যর ওপর ভিত্তি করে পৃথক করা হয়, তা হলো শিক্ষার সাংগঠনিক দিক। শিক্ষাদান পরিচালিত হয় এক বৃহৎ এবং অতীব জটিল সংগঠনের মধ্য দিয়ে। এই সংগঠনকে আনুষ্ঠানিক বলে গণ্য করা যায়। কারণ, এই ধরণের সংগঠনের সুস্পষ্টরূপে প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্য, সংজ্ঞায়িত কাঠামো এবং প্রক্রিয়া রয়েছে। ঐসব কাঠামো এবং প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হয়। সুতরাং শিক্ষা শুধুমাত্র 'উদ্দেশ্যপ্রণোদিত পাঠ দান' (deliberate instruction) নয়, 'সংগঠিত পাঠ দান' (organized instruction) -ও বটে।

অধ্যাপক ঘোষ দস্তিদার মনে করেন যে, শিক্ষা সংগঠনের আনুষ্ঠানিক কাঠামো যেমন আছে, তেমনি অনানুষ্ঠানিক কাঠামোও আছে। বিদ্যালয়ে একটি প্রক্রিয়া থাকে যার মধ্য দিয়ে ছাত্ররা নিম্নতর শ্রেণী থেকে প্রতিবছর উচ্চতর শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়। এটি আনুষ্ঠানিক কাঠামোর অঙ্গ, আবার শিক্ষা সংগঠনের অনানুষ্ঠানিক দিকের মধ্যে ছাত্রদের নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক, শিক্ষক এবং ছাত্রদের মধ্যে প্রথাবহির্ভূত সম্পর্ক ইত্যাদির কথা বলা যেতে পারে।

সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়াটি শিক্ষার মাধ্যমে দুইভাবে ঘটে থাকে। একদিকে, শিক্ষাক্ষেত্রের সাথে সদস্যদের শিক্ষা মানানসই করে তোলে। অন্যদিকে, শিক্ষাক্ষেত্রের বাইরে অস্তিত্বশীল জগতের সাথে সদস্যদের শিক্ষা খাপ খাইয়ে নিতে সাহায্য করে।

অধ্যাপক করের মতে প্রাক-শিল্পযুগের সমাজব্যবস্থা ছিল সহজ, সরল প্রকৃতির। সমাজে বসবাসকারী মানুষদের মধ্যে জীবনযাত্রার ধরণ, আচার-আচরণ, মনোভাব ইত্যাদি ক্ষেত্রে মোটামুটি অভিন্নতা থাকায় সমাজের বিভিন্ন মানুষের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষার জন্যে যে জ্ঞানের প্রয়োজন ছিল তা পরিবার, পাড়া-প্রতিবেশী ইত্যাদি থেকেই পাওয়া সম্ভব ছিল। আনুষ্ঠানিক শিক্ষার অভাবে সামাজিক বন্ধন শিথিল হওয়ার কোনো আশঙ্কা ছিল না। অন্য দিকে, শিল্প-প্রধান আধুনিক সমাজে জটিলতা অনেক বেশী। কারণ, আধুনিক সমাজে ভিন্ন ভাষাভাষী, ভিন্ন ধর্মাবলম্বী এবং ভিন্ন আচারবিশিষ্ট লোকের বাস। যেখানে সমাজে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে পার্থক্য এত বেশী, সেখানে সহজভাবে অন্যের সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখে চলতে গেলে যে জ্ঞানের প্রয়োজন তা পরিবার, পাড়া-প্রতিবেশীর থেকে পাওয়ার সম্ভাবনা কম। সুতরাং জটিল সমাজে বসবাসকারী মানুষদের মধ্যে সহজ সম্বন্ধ বজায় রাখার ক্ষেত্রে শিক্ষা একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। শিক্ষার মাধ্যমে মূল্যবোধ শিক্ষার্থীদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়, যা সামাজিক সম্পর্ককে সুদৃঢ় করতে বিশেষভাবে সাহায্য করে। এই কারণে আধুনিক সমাজে শিক্ষাকে একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় সংযোগকারী শক্তি (integrative force) হিসাবে গণ্য করা যায়।

আদর্শগত দিক থেকে শিক্ষা ব্যবস্থা সমাজের কোনো বিশেষ গোষ্ঠী অথবা শ্রেণীর স্বার্থ এবং মূল্যবোধের সঙ্গে একান্তভাবে জড়িত থাকে না বলে সমাজে সংযোগকারী শক্তি হিসাবে এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বর্তমান। আদর্শগত দিক থেকে এটি সমর্থনযোগ্য হলেও বাস্তবে এর ব্যতিক্রম বর্তমান। সমস্ত সমাজেই শিক্ষা ব্যবস্থায় শ্রেণীবিন্যাসের প্রতিফলন দেখা যায়। বটোমোর মনে করেন যে, পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানোর উপযুক্ত মানসিকতা গড়ে তোলার অর্থ হ'ল শ্রেণীগত আদর্শ অথবা মূল্যবোধের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ শিক্ষার প্রবর্তন করা। এই কারণে সব সমাজেই শিক্ষাব্যবস্থার সাথে সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা রয়েছে। অপেক্ষাকৃত উন্নত বিদ্যালয়গুলিতে উচ্চবিত্ত শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা অধ্যয়ন করে। এইসব বিদ্যালয়গুলিতে নিম্নমধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের প্রবেশাধিকার নানাকারণে খুব সীমিত। ইংল্যান্ডের শিক্ষাব্যবস্থায় সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ইংল্যান্ডে প্রত্যেকটি সামাজিক শ্রেণী নিজেদের জীবনধারা স্বতন্ত্র রাখতে এবং অন্যান্য সামাজিক শ্রেণীর সাথে সামাজিক সম্পর্ক যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করে। খুব অল্প বয়সে ছেলেমেয়েদের পৃথক পৃথক বিদ্যালয়ে ভাগ করার ব্যবস্থা শ্রেণীবিন্যাসের অনুকরণে ইংল্যান্ডে গড়ে উঠেছে বলে মনে করা হয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিদ্যালয়েও পঠন-পাঠনের মান এবং অন্যান্য সুযোগসুবিধার দিক থেকে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। তবে ইংল্যান্ডের মত এত স্পষ্ট না হলেও এখানে শিক্ষাব্যবস্থায় শ্রেণীবিন্যাসের প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়।

শ্রেণীবিভক্ত সমাজের উঁচু শ্রেণীতে উন্নীত হওয়ার জন্য শিক্ষার সাহায্য বিশেষভাবে প্রয়োজন। সামাজিক মর্যাদা এবং আয়ের নিরিখে আকর্ষণীয় কোনো পদ প্রাপ্তির বিষয় শিক্ষাব্যবস্থার দ্বারা বহুলাংশে নির্দ্ধারিত এবং নিয়ন্ত্রিত হয়। এই সমস্ত পদ লাভের জন্য যথোপযুক্ত শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়। সমাজে ক্রমোচ্চ স্তরবিন্যাসের পরিপ্রেক্ষিতে কিছু মানুষকে অধিকতর উচ্চস্তরে অধিষ্ঠিত থাকতে দেখা যায়। এঁরাই সাধারণত জ্ঞান-বুদ্ধি এবং

অন্যান্য গুণগত যোগ্যতার নিরিখে অপেক্ষাকৃত উন্নত বলে বিবেচিত হন। তাঁদের সন্তান-সন্ততিরাও সাধারণত বেশী মাত্রায় উচ্চশিক্ষার সুযোগ লাভ করে। এই কারণে অনেকের মতে শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস বজায় রাখার ব্যবস্থা করা হয়। বটোমোর মন্তব্য করেছেন যে বিভিন্ন ধরণের আধুনিক সমাজ থেকে যে তথ্য পাওয়া যায় তার ওপর ভিত্তি করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, শিক্ষাব্যবস্থাগত বৈষম্য সামাজিক স্তরবিন্যাসের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত।

শিক্ষা এবং সামাজিক নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা শুরু করার আগে আসুন সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলতে কী বোঝায়- সে বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাক।

৮৭.৬ সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অর্থ

মানুষ মাত্রেই স্বকীয়তা এবং স্বাতন্ত্র্যযুক্ত। এই স্বাতন্ত্র্য এবং স্বার্থচেতনা ব্যক্তির প্রবণতার মধ্যে বর্তমান থাকে। সুতরাং ব্যক্তির আচার-আচরণ যদি অনিয়ন্ত্রিত হয় তাহলে সামাজিক সংহতি এবং শৃঙ্খলা বজায় থাকে না। ফলস্বরূপ সমাজ এবং সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের সামগ্রিক স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ আশংকা থেকে মুক্তিলাভের জন্য সামাজিক শৃঙ্খলা সংরক্ষণের স্বার্থে কিছু পদ্ধতি অনুসরণ করা প্রয়োজন। এই সমস্ত পদ্ধতির সমষ্টিকেই সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলে।

ডঃ মহাপাত্র মনে করেন যে, সমাজব্যবস্থাকে অস্তিত্বশীল করার প্রয়োজন সমাজবদ্ধ মানুষের মধ্যে সমন্বয়, সংহতি এবং শৃঙ্খলা অপরিহার্য বলে বিবেচিত হয়। সমাজব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত সকলে সুষ্ঠুভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করার ব্যাপারে বিশেষভাবে আগ্রহী। কিন্তু সুস্থ সমাজজীবনকে সম্ভব করে তোলার জন্য সুশৃঙ্খল নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা একান্তভাবে অপরিহার্য। অর্থাৎ, সমাজে বসবাসকারী ব্যক্তিদের আচার আচরণ কাঙ্ক্ষিত পথে পরিচালিত করার জন্য সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বিশেষভাবে প্রয়োজন। প্রতিষ্ঠিত সামাজিক বিধিসমূহের মাধ্যমে সমাজবদ্ধ মানুষের আচার-ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হয়। এই সমস্ত নিয়ম-নীতির মাধ্যমে সামাজিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সমাজজীবনের আচার-ব্যবহারের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় থাকে।

সাধারণত সমাজে প্রচলিত রীতি-নীতি, মূল্যবোধ ইত্যাদির সমষ্টিকে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলা হয়। মানব-সমাজের অস্তিত্ব এবং অগ্রগতিকে নিরাপদ এবং নিশ্চিত করার জন্য সমাজবদ্ধ মানুষের ওপর কতকগুলি নিয়ন্ত্রণ বলবৎ হওয়া বাঞ্ছনীয়। সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণ এই সমস্ত নিয়ন্ত্রণকেই সামাজিক নিয়ন্ত্রণ (social control) বলে অভিহিত করেছেন। অধ্যাপক বটোমোরের অভিমত অনুসারে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ হ'ল বিশেষ কিছু সামাজিক রীতি-নীতি, মূল্যবোধ, আইন এবং আদর্শের সমষ্টি যার মাধ্যমে সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের শ্রেণীগত এবং দলগত বিরোধের মীমাংসা হয় এবং সুষ্ঠু ও সুন্দর জীবনের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ সামাজিক নিয়ন্ত্রণ হ'ল কতকগুলি নিয়ম-নীতি এবং মূল্যবোধের সমষ্টি যার মাধ্যমে ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীর মধ্যের বিরোধ এবং উত্তেজনার নিষ্পত্তি ঘটে এবং তার ফলে সামাজিক সংহতি ও শৃঙ্খলা বজায় থাকে।

৮৭.৭ শিক্ষা এবং সামাজিক নিয়ন্ত্রণ

শিক্ষা সামাজিক নিয়ন্ত্রণের একটি অন্যতম নিয়ামক। সমাজবদ্ধ মানুষের আচার-আচরণ সুনির্দিষ্ট একটি রূপ লাভ করে এবং নিয়ন্ত্রিত হয় সমাজে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে। মূলত, ব্যক্তির মনোজগত শিক্ষার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয় এবং এইভাবে মনোজগত নিয়ন্ত্রণ সূত্রে শিক্ষা সামগ্রিকভাবে সমাজব্যবস্থাকেই নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। সুতরাং, সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে শিক্ষার বিশেষ ভূমিকার কথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। অধ্যাপক মহাপাত্রের মতে, বর্তমানে অধিকাংশ দেশেই সমাজে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার উপর অল্পবিস্তর সরকারী নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়। শিক্ষা-ব্যবস্থার উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ অন্যতম সামাজিক দায়িত্ব হিসাবে বিবেচিত হয়। সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শে বিশ্বাসী দেশগুলিতে শিক্ষাব্যবস্থার উপর সরকারের সার্বিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হতে দেখা যায়।

শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামাজিক উত্তরাধিকারের সৃষ্টি হয় শিক্ষার মাধ্যমে। এই সামাজিক উত্তরাধিকার মানুষের মনকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। ফলস্বরূপ, মানুষ রীতি-নীতি এবং বিধি-নিষেধগুলি স্বাভাবিক অভ্যাস বশেই মেনে চলে। প্রচলিত সামাজিক বিধিনিষেধ এবং রীতি-নীতিগুলি মেনে চলার ক্ষেত্রে ব্যক্তির মনোজগত কোনোরকম প্রতিকূলতার সৃষ্টি করে না। জীবনধারার যাবতীয় বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ সমাজে প্রচলিত প্রথা-প্রতিষ্ঠান, আচার-বিচার, ন্যায়-নীতি, স্বীকৃত মূল্যবোধ ইত্যাদির সাথে শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর পরিচয় ঘটে থাকে। ফলশ্রুতি হিসাবে সমাজবদ্ধ মানুষের কার্যকলাপ, আচার-ব্যবহার, চিন্তা-চেতনা প্রভৃতি সমাজজীবন এবং তার সৃষ্টিধারার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। সামাজিক বিধিভঙ্গের আশঙ্কা অনেকটাই দূর হয়ে যাওয়ার ফলে সমাজব্যবস্থায় শান্তি-শৃঙ্খলা সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রশাসনিক বা সামাজিক সমস্যা খুব একটা দেখা দেয় না।

ডঃ মহাপাত্র মনে করেন যে, সামাজিক ঐক্য এবং সংহতি সুদৃঢ় করার ব্যাপারে শিক্ষার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা বর্তমান। শিক্ষা সমাজবদ্ধ মানুষের মধ্যে সুস্থ পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং মানবিকতাবোধ সৃষ্টি করে। তার ফলে সমাজজীবনে সদ্ভাব সম্প্রীতি এবং সৌভ্রাতৃত্ববোধের সৃষ্টি হয়। এইভাবে সমাজজীবন স্বচ্ছন্দ এবং শান্তিপূর্ণ হয়। আবার, সমাজের বৃহত্তর স্বার্থ এবং নাগরিকদের অধিকার অক্ষুন্ন থাকে শিক্ষা-ব্যবস্থার কল্যাণেই। কারণ, শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ যুক্তিবাদী এবং বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন হয়। ফলে শিক্ষিত মানুষ সহজেই স্বভাবজাত প্রবৃত্তি এবং আবেগ-উত্তেজনাকে বশীভূত করে বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগের মাধ্যমে সকল বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে।

সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষা সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলবৎ করে থাকে। সুতরাং সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে শিক্ষার ভূমিকা প্রত্যক্ষ নয়, পরোক্ষ। শিক্ষার প্রভাবে মানুষ সমাজসচেতন, দায়িত্বশীল এবং কর্তব্যপরায়ণ হয়। ফলে মানুষ সংকীর্ণ ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্দ্ধে উঠে সমষ্টিগত কল্যাণ সাধনে অথবা সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করতে পারে। অধ্যাপক মহাপাত্র বলেন যে, ব্যক্তির পক্ষে সামাজিক দায়-দায়িত্ব সামাজিক দায়িত্ববোধ এবং বিবেকবুদ্ধি ছাড়া সঠিকভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হয় না। শিক্ষা কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতীদের মধ্যে সামাজিক আদর্শ এবং মূল্যবোধের সৃষ্টি করে। ফলস্বরূপ, তাদের পক্ষে নির্দিষ্ট সামাজিক ভূমিকা পালন করা সম্ভব হয়। শিক্ষা বিভিন্ন ধরণের ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণা এবং সামাজিক কুসংস্কারসমূহ দূর করতে সাহায্য করে এবং মানুষের

মনে ন্যায়পরায়ণতা, সততা এবং আইন মান্য করার এক স্বাভাবিক প্রবণতার সৃষ্টি করে। যথার্থ শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষিত মানুষ নিজেই নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়। এইভাবে শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে যে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়, তা বিশেষভাবে কার্যকরী প্রতিপন্ন হয়।

ডঃ মহাপাত্রের অভিমত অনুসারে বলা যায় যে, আধুনিক শিল্পভিত্তিক সমাজব্যবস্থায় সামাজিক নিয়ামক হিসাবে শিক্ষার ভূমিকার গুরুত্ব এবং তাৎপর্য উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। প্রাক-শিল্পযুগের সমাজব্যবস্থায় সামাজিক জীবনধারাগত বৈশিষ্ট্যের সাথে শিক্ষাব্যবস্থার সামঞ্জস্য ছিল। তখন সামাজিক নিয়ামক হিসাবে শিক্ষার ভূমিকা ছিল অর্থবহ এবং কার্যকরী। বর্তমানে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যাপক প্রয়োগ, শিল্পায়ন ও নগরায়ণের ব্যাপক বিস্তারের ফলে সমাজব্যবস্থার সকল ক্ষেত্রে আধুনিকীকরণ ঘটেছে। ফলস্বরূপ, সামাজিক জীবনধারাগত বৈশিষ্ট্যের সাথে শিক্ষাব্যবস্থার অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞানভিত্তিক পাঠ্যক্রমের পরিপ্রেক্ষিতে যে শিক্ষা লাভ করে তার সাথে সামাজিক উত্তরাধিকারসূত্রে অভিজ্ঞতার অসামঞ্জস্য স্পষ্ট রূপে প্রতীয়মান হয়। শিল্প সভ্যতার বিস্তারের পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক উত্তরাধিকারের পরিবর্তে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যার প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই ধরণের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সমাজস্বীকৃত মূল্যবোধ, সামাজিক আদর্শ, ন্যায়-নীতির ধারণা ইত্যাদি গুরুত্বহীন বলে মনে হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যক্রমে আধুনিকতার অনুপ্রবেশ ঘটে। এই পাঠ্যক্রম শিক্ষার্থীকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে এবং মানুষের চেতনাকে স্বতন্ত্র রূপ দান করে। তা সত্ত্বেও সমাজবদ্ধ মানুষ সামাজিক জীবনধারা এবং অভিজ্ঞতার প্রভাব থেকে একেবারে মুক্ত হতে পারে না। ফলে মানুষের মনোজগত এবং সমাজ প্রকৃতির মধ্যে সংঘাত দেখা যায়। এইরকম পরিস্থিতিতে শিক্ষা সামাজিক নিয়ামক হিসাবে অনেকাংশে তার আগের গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে।

সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে শিক্ষার নিয়ামক ক্ষমতা হ্রাসের ব্যাপারে গণমাধ্যমগুলির প্রতিকূল প্রভাবের কথাও অনস্বীকার্য। এ প্রসঙ্গে ডঃ মহাপাত্রের বক্তব্য হ'ল যে, বর্তমান বাণিজ্যিক সমাজ-সভ্যতার যুগে সাধারণ মানুষের ভাবনা-চিন্তার উপর সংবাদপত্র, বেতার, দূরদর্শন ইত্যাদি প্রচার মাধ্যমগুলির কার্যকরী প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এই সমস্ত প্রচারমাধ্যমগুলি মানুষের চিন্তা-চেতনার উপর এক ধরণের স্থায়ী প্রভাব ফেলে। এই ধরণের পরিস্থিতিতে প্রচারমাধ্যমগুলির সাথে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার নীতি এবং আদর্শগত অসামঞ্জস্য দেখা দেয়। এই অসঙ্গতির ফলে শিক্ষার্থীদের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে। বিভ্রান্তির ফলে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অন্যতম নিয়ামক হিসাবে শিক্ষার কার্যকারিতা হ্রাস পায়। এইভাবে গণমাধ্যমগুলি সামাজিক নিয়ামক হিসাবে শিক্ষা ব্যবস্থার উপর প্রতিকূল প্রভাব ফেলে। ভারতীয় সমাজব্যবস্থার ক্ষেত্রে এটি অতিমাত্রায় প্রাসঙ্গিক।

৮৭.৮ সারাংশ

মানবসমাজে শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষার্থীকে বড় করে তোলে এবং সাফল্যের সাথে ভবিষ্যতের সম্মুখীন হওয়ার জন্য তার মধ্যে মানসিকতা এবং প্রয়োজনী অভ্যাস গড়ে তোলে। এটি প্রকৃতপক্ষে বিকাশ সাধনের ক্ষেত্রে বিশেষ সুসংবদ্ধ এবং সচেতন পদ্ধতি। সংকীর্ণ এবং ব্যাপক- এই দুই অর্থেই শিক্ষা ব্যবহৃত

হয়। সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষা বলতে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাকেই বোঝায়। ব্যাপকার্থে শিক্ষা সামাজিক জীবনধারার সাথে সম্পর্কযুক্ত। বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে শিক্ষার বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। সমাজতত্ত্বে শিক্ষার ধারণাকে সংকীর্ণ অর্থেই গ্রহণ করা হয়।

সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়াটিকে ব্যক্তিগত এবং সামাজিক এই দুই ধরণের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আলোচনা করা হয়। ব্যক্তিগত দিক থেকে সামাজিকীকরণ হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে মানুষ তার গোষ্ঠীর প্রচলিত ধারা অনুসারে আচার-আচরণের ব্যাপারে স্বাভাবিক প্রবণতা অর্জন করে। অন্যদিকে, সামাজিক ক্ষেত্রে সামাজিকীকরণ হলো সামাজিক ভূমিকা সঠিকভাবে পালনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা।

শিক্ষা সামাজিকীকরণের একটি উল্লেখযোগ্য মাধ্যম হিসাবে কাজ করে। শিক্ষার্থী শিক্ষার মাধ্যমে নিজ সংস্কৃতির উত্তরাধিকার লাভ করে। গোষ্ঠীজীবনে প্রচলিত সভ্যতা-সংস্কৃতির সঙ্গে ব্যক্তির পরিচিতি ঘটে শিক্ষার মাধ্যমে। প্রাক্-শিল্পযুগীয় সমাজে শিক্ষার তুলনায় অন্যান্য মাধ্যম সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে প্রাধান্য পেত। কিন্তু শিল্পায়নের ফলে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষার সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে পৃথকীকরণ ঘটেছে। শিক্ষা মানুষকে বিশেষজ্ঞের ভূমিকায় উপযুক্ত করে তোলে। সামাজিকীকরণের অনানুষ্ঠানিক দিকগুলি খুব বেশী বিশেষজ্ঞ জ্ঞানমূলক নয় এমন সামাজিক দক্ষতা এবং মূল্যমান শিক্ষা দেয়। সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা-ব্যবস্থা এবং অনানুষ্ঠানিক দিকগুলির প্রভাব মিলে মিশে কাজ করে থাকে। মূলত শিক্ষার সাংগঠনিক দিকের উপর ভিত্তি করে একে সামাজিকীকরণের অন্যান্য মাধ্যম থেকে পৃথক করা হয়। শিক্ষা সংগঠনের আনুষ্ঠানিক কাঠামোর সঙ্গে অনানুষ্ঠানিক কাঠামোও বর্তমান। শিক্ষাক্ষেত্রের সাথে এবং এই ক্ষেত্রের বাইরের জগতের সঙ্গে মানুষের মানিয়ে নেওয়ার মধ্যে দিয়ে শিক্ষা সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়াটি সম্পাদন করে। শিক্ষাব্যবস্থা শ্রেণীবিন্যাসের প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। শ্রেণীবিভক্ত সমাজের উঁচু শ্রেণীতে উন্নীত হওয়ার জন্য অথবা সামাজিক মর্যাদা এবং আয়ের নিরিখে আকর্ষণীয় কোনো পদ প্রাপ্তির বিষয় শিক্ষার দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়।

সমাজে বসবাসকারী ব্যক্তিদের আচার-আচরণ কাঙ্ক্ষিত পথে পরিচালনার জন্য সামাজিক নিয়ন্ত্রণ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। শিক্ষা সামাজিক নিয়ন্ত্রণের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। ব্যক্তির মন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে শিক্ষা সমাজব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে। সামাজিক ঐক্য এবং সংহতি সুদৃঢ়করণের ব্যাপারে শিক্ষার ভূমিকা অনস্বীকার্য। শিক্ষা সামাজিক নিয়ন্ত্রণ কার্যকরী করে সামাজিকীকরণের মাধ্যমে। আধুনিক সমাজের গণমাধ্যমগুলির জনমানসের ওপর স্থায়ী প্রভাব সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যম হিসাবে শিক্ষার ভূমিকা অনেকাংশে হ্রাস করেছে।

৮৭.৯ অনুশীলনী

১) নীচের বক্তব্যগুলি ঠিক না ভুল তা নির্দিষ্ট স্থানে (√) চিহ্ন দিয়ে দেখান ঃ -

	ঠিক	ভুল
(ক) ব্যাপক অর্থে শিক্ষা বলতে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে বোঝানো হয়।	☐	☐
(খ) সামনারের অভিমত অনুসারে শিক্ষা হলো একটি বিরামহীন প্রক্রিয়া।	☐	☐

(গ) মার্ক্সীয় দর্শন অনুযায়ী শিক্ষা হ'ল বিকাশের একটি পদ্ধতি যা উৎপাদন প্রক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল। ☐ ☐

(ঘ) সামাজিক পটভূমিতে সমাজজীবনের অভিজ্ঞতাসমূহকে সামাজিকীকরণ বলা হয়। ☐ ☐

(ঙ) সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার শিক্ষার কোনো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেই। ☐ ☐

(চ) শিল্প বিপ্লবের পূর্ববর্তী সময়ে সামাজিকীকরণের মাধ্যম হিসাবে শিক্ষার ভূমিকা ছিল গৌণ। ☐ ☐

(ছ) সামাজিক দক্ষতা এবং মূল্যমান সামাজিকীকরণের অনানুষ্ঠানিক দিকের মাধ্যমে মানুষ অর্জন করে থাকে। ☐ ☐

(জ) শিক্ষা সংগঠনে অনানুষ্ঠানিক কাঠামোর কোনো অস্তিত্ব নেই। ☐ ☐

(ঝ) সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধের নিষ্পত্তি ঘটিয়ে সামাজিক সংহতি বজায় রাখে। ☐ ☐

(ঞ) আধুনিক সমাজব্যবস্থায় গণমাধ্যমগুলি সামাজিক নিয়ামক হিসাবে শিক্ষা ব্যবস্থার উপর অনুকূল প্রভাব ফেলে। ☐ ☐

২) নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ -

ক) শিক্ষা বলতে কী বোঝায় ?

খ) শিক্ষার বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করুন।

গ) ব্যক্তিগত এবং সামাজিক পটভূমিতে সামাজিকীকরণকে আপনি কীভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করবেন ?

ঘ) সমাজে শিক্ষাব্যবস্থার উপর শ্রেণীবিন্যাসের প্রভাব সম্বন্ধে সংক্ষেপে উল্লেখ করুন।

ঙ) সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলতে আপনি কী বোঝেন ?

৩) নীচের প্রশ্নগুলির বিশদ্ উত্তর দিন ঃ -

ক) সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার অর্থ কী ? সামাজিকীকরণের মাধ্যম হিসাবে শিক্ষার ভূমিকা বিচার-বিশ্লেষণ করুন।

খ) সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলবৎ করার ব্যাপারে শিক্ষার ভূমিকা কী? আপনি কী মনে করেন যে আধুনিক গণমাধ্যমের যুগে সামাজিক নিয়ামক হিসাবে শিক্ষার ভূমিকা হ্রাস পাচ্ছে— উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দিন।

৮৭.১০ উত্তর সংকেত

১) ক) ভুল; খ) ঠিক; গ) ঠিক; ঘ) ঠিক; ঙ) ভুল; চ) ঠিক; ছ) ঠিক; জ) ভুল; ঝ) ঠিক; ঞ) ভুল।

৮৭.১১ গ্রন্থপঞ্জী

১) বটোমোর টম ঃ সমাজবিদ্যা - তত্ত্ব ও সমস্যার রূপরেখা (অনুবাদ- হিমাচল চক্রবর্ত্তী); কে. পি. বাগচী অ্যাণ্ড কোম্পানী; কলকাতা; ১৯৯৫।

২) কর পরিমল ভূষণ ঃ সমাজতত্ত্ব; পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ; কলকাতা; ১৯৮২।

৩) ঘোষ দস্তিদার মৃণালকান্তি ঃ সমাজবিজ্ঞান বিচিত্রা; নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি (প্রাঃ) লিমিটেড; কলকাতা; ২০০০।

৪) ডঃ মহাপাত্র অনাদিকুমার ঃ বিষয় সমাজতত্ত্ব; ইণ্ডিয়ান বুক কনসার্ন; কলকাতা; ১৯৯৬।

মানুষের জ্ঞান ও ভাবকে বইয়ের মধ্যে সঞ্চিত করিবার যে একটা প্রচুর সুবিধা আছে, সে কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু সেই সুবিধার দ্বারা মনের স্বাভাবিক শক্তিকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলে বুদ্ধিকে বাবু করিয়া তোলা হয়।

—*রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর*

ভারতের একটা mission আছে, একটা গৌরবময় ভবিষ্যৎ আছে, সেই ভবিষ্যৎ ভারতের উত্তরাধিকারী আমরাই। নূতন ভারতের মুক্তির ইতিহাস আমরাই রচনা করছি এবং করব। এই বিশ্বাস আছে বলেই আমরা সব দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে পারি, অন্ধকারময় বর্তমানকে অগ্রাহ্য করতে পারি, বাস্তবের নিষ্ঠুর সত্যগুলি আদর্শের কঠিন আঘাতে ধূলিসাৎ করতে পারি।

—*সুভাষচন্দ্র বসু*

Any system of education which ignores Indian conditions, requirements, history and sociology is too unscientific to commend itself to any rational support.

—*Subhas Chandra Bose*

Price : Rs. 150.00

(*NSOU* -র ছাত্রছাত্রীদের কাছে বিক্রয়ের জন্য নয়)

Published by : Netaji Subhas Open University, DD-26, Sector-1, Salt Lake City, Kolkata-700 064 and
Printed at : Royal Hlaftone Co., 4, Sarkar Bye Lane, Kolkata-700 007